অগ্নি জ্যোতি

১১ তম সংখ্যা

বাংলাদেশ অগ্নিবীরের ত্রৈমাসিক অনলাইন পত্রিকা

এপ্রিল-জুন ২০২৫

২০৮২ বিক্রমাব্দ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ (বৈশাখ -আষাঢ়)

আর্ষজ্যোতি

১১তম সংখ্যা

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সূচিপত্র

ক্রমিক – বিষয় – পৃষ্ঠা সংখ্যা

১. ঈশ্বর-জীবাত্মা -প্রকৃতি : মিল-অমিল - ১

২. যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণের কী প্রয়োজন ? - ৩

৩. সবাই ভুল আর আমিই একমাত্র ঠিক কীভাবে ? এটা কি অহংকার না ? - ৫

৪. তেলুগু রামায়ণ - রচনা বৈশিষ্ট্য ও বাল্মীকির সাথে পার্থক্য- ৭

৫. বাল্মীকি রামায়ণের সময়কাল নির্ণয় - আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে - ১২

৬. স্বিষ্টকৃৎ আহুতি - মন্ত্রের অর্থ ও মাহাত্ম্য - ১৪

৭. বেদে নীহারিকা তত্ত্ব ~ বৈদিক বিজ্ঞান - ১৬

৮. ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মের ইতিহাস - ১৭

৯. জল সিঞ্চনের ৪টি মন্ত্রের অর্থ কী ? - ২১

১০. সনাতন ধর্মে কি মাংস খাওয়ার অনুমতি আছে ? - ২২

১১. গোমূত্র ও গোবর তত্ত্ব : বৈদিক ও অবৈদিক গ্রন্থের আলোকে - ২৭

১২. ব্রাহ্মণ গ্রন্থ শব্দে 'ব্রাহ্মণ' পদের পর্যালোচনা - ৩৭

১৩. “মনুস্মৃতিতে প্রক্ষিপ্ততা” - ৩৯

১৪. আপনার প্রকৃত বন্ধু কে ? - ৪৯

১৫. আর্য সনাতন ধর্ম একদিন বিশ্বধর্ম হয়ে উঠবে - রাজর্ষি শাহু মহারাজের ঐতিহাসিক ভাষণ - ৫০

১৬. রাত্রিসূক্তম্ [ঋগ্বেদ ১০.১২৭.১-৮] - ৫৩

১৭.ঈশ্বরের উপাসনা কেন ? কখন ? কীভাবে ? না করলে কী হবে ? - ৫৭

১৮. রামনবমী কি বহিরাগত সংস্কৃতি ? বাংলার লোকঐতিহ্যে শ্রীরামচন্দ্র - ৫৯

১৯. শঙ্করাচার্য কি স্ত্রী - শূদ্রের বেদাধিকার মানতেন ? - ৬০

২০. ঘোর ঘন জঙ্গলে... - ৬২

২১. যজুর্বেদের ১ম মন্ত্র - গবাদি পশুর সুরক্ষা ও কর্তব্যের আজ্ঞা - ৬৪

২২. মূর্খ কে? কি বলছে মহাভারত? - ৭১

২৩. যে দুইটি নিয়ম মেনে চললে যেকোন ব্যক্তির সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারবেন - ৭১

২৪. ঋগ্বেদ ৬.১৭.১১-তে কি ৩০০ মহিষ রান্নার কথা আছে ? - ৭২

২৫. ধর্মান্তর রোধে সচেতনতা: সনাতন ধর্মের সৌন্দর্য ও বিশ্ব কল্যাণময়তা - ৭৪

২৬. পিতা - মাতা - আচার্য ভুল করলে আমাদেরও কি করা উচিত ? - ৭৯

২৭. সারাজীবন কি শিশু হয়ে থাকবেন ? - ৭৯

২৮. পৌরাণিক বিধি অনুযায়ী সতী নারীর বৈশিষ্ট্য কী কী ? - ৮০
২৯. কল্পসূত্রের বেদবিরুদ্ধ অরূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগ ও বৈদিক সিদ্ধান্ত - ৮২
৩০. রজঃস্বলা মীমাংসা - ৮৬
৩১. কত বড় আমাদের এই মহাবিশ্ব ? - ৯২
৩২. একো হি রুদ্রো - সৃষ্টিকর্তা একজনই - ৯৩
৩৩.ধর্ষণে অপরাধ কার ? নির্যাতিতার নাকি ধর্ষকের ? - ৯৩
৩৪. মহাভারতে জোয়ার-ভাটা বিজ্ঞান - ৯৪
৩৫.বিয়েতে জয়া হোমের ১৩টি আহুতি কেন দেওয়া হয় ? - ৯৪
৩৬. যজ্ঞপ্রার্থনা (পূজনীয় প্রভু হামারে এর বাংলা সংস্করণ) - ৯৬
৩৭. শিশু, যুবক নাকি বৃদ্ধ- সুখী হবেন কীভাবে ? - ৯৮
৩৮. চরৈবেতি চরৈবেতি - ৯৮
৩৯. ১৩ কি অশুভ সংখ্যা বা Unlucky number ? - ১০২
৪০. পুণ্য ও পাপের সংজ্ঞা - ১০৩
৪১. ডান বা বাম হাতে কাজ করা নিয়ে সনাতন ধর্ম কী বলে ? - ১০৪

ঈশ্বর-জীবাত্মা -প্রকৃতি : মিল-অমিল

একদৃষ্টিতে ঈশ্বর-জীবাত্মা-প্রকৃতি

ঈশ্বর–

(১) ঈশ্বর এক এবং এর মুখ্য নাম 'ওঽম্'। নিজের বিভিন্ন গুণ-কর্ম-স্বভাবের কারণে তিনি অনেক নামে পরিচিত।

(২) ঈশ্বর নিরাকার অর্থাৎ তার কোনো মূর্তি নেই আর না কখনো তৈরি হবে। তার কোনো লিঙ্গ বা চিহ্ন নেই।

(৩) ঈশ্বর অনাদি, অজন্মা ও অমর। তিনি জন্ম নেন না, মৃত্যুবরণও করেন না ।

(৪) ঈশ্বর 'সচ্চিদানন্দস্বরূপ' অর্থাৎ তিনি সর্বদা আনন্দমুখর থাকেন । স্বীয় স্বার্থে কখনোই রাগ করেন না ।

(৫) জীবকে তাদের কর্মানুসারে যথাযোগ্য ন্যায় প্রদান করেন বলে তাকে 'অর্যমা= ন্যায়কারী' বলা হয়ে থাকে। যদি ঈশ্বর জীবকে তাদের কুকর্মের দণ্ড না দেন, তাহলে তিনি অন্যায়কারী সিদ্ধ হবেন।

(৬) ঈশ্বর 'ন্যায়কারী' হওয়ার পাশাপাশি দয়ালুও বটে, অর্থাৎ তিনি জীবকে এজন্যে দণ্ড দেন যাতে অপরাধে জড়িত হয়ে তারা দুঃখভোগ না করে । দণ্ড , সদ্বুদ্ধি প্রদান , কৃপা এসবই ঈশ্বরের দয়া ।

(৭)কণায়-কণায় ব্যাপ্ত থাকায় তিনি 'সর্বব্যাপক', অর্থাৎ তিনি সব জায়গায় উপস্থিত।

(৮) ঈশ্বর কাউকে ভয় পান না, তাই তিনি 'অভয়'।

(৯) ঈশ্বর 'প্রজাপতি' এবং 'সর্বরক্ষক'।

(১০) ঈশ্বর সর্বদা 'পবিত্র' অর্থাৎ তার স্বভাব 'নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত'।

(১১) ঈশ্বরকে তার নিজের কর্ম করার জন্য অন্য কারো সহায়তার দরকার পড়ে না। ঈশ্বর 'সর্বশক্তিমান' অর্থাৎ তিনি তার সামর্থ্য দ্বারা সৃষ্টির উৎপত্তি, পালন এবং প্রলয় করে থাকেন। তিনি তার কোনো কার্যই অপূর্ণ রাখেন না।

(১২) ঈশ্বর 'সর্বজ্ঞ' অর্থাৎ তার জন্য সব কালই এক । তিনি জীবের কর্মফল প্রদান সাপেক্ষে ত্রিকালজ্ঞ । ভূত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এসব কাল মনুষ্যদের জন্য । ঈশ্বর তো 'নিত্য', তিনি সর্বকালেই উপস্থিত।

জীবাত্মা–

(১) জীবাত্মা, ঈশ্বর থেকে আলাদা এক চেতন সত্তা।

(২) জীবাত্মা অনাদি, অজন্মা ও অমর। সে নতুন করে উৎপত্তিরূপ জন্ম নেয় না, মৃত্যুবরণও করে না । কেবল নব শরীর ধারণ করে ।

(৩) জীবাত্মা অনেক এবং অপ্রসন্ন থাকে । তার শক্তি ও জ্ঞানে স্বল্পতা আছে ।

(৪) জীবাত্মা দেহে আকার দ্বারা সীমাবদ্ধ, তার কোনো লিঙ্গ নেই । স্বরূপতঃ নিরাকার ও অণু পরিমাণ ।

(৫) শরীরের মৃত অবস্থা অর্থ জীবাত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীরে চলে যায়।

(৬) জীবাত্মা কর্ম করায় স্বতন্ত্র । কর্মসমূহের ফল ঈশ্বরের ন্যায় ব্যবস্থায় হয়ে থাকে।

(৭) যদি জীবাত্মা স্বল্পজ্ঞতা থেকে মুক্ত হয়ে সদা আনন্দ কামনা করে তো তাকে শারীরিক ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হতে হবে, যাকে মোক্ষ বলে ।

প্রকৃতি–

(১) প্রকৃতি জড় পদার্থ । এটা সর্বদাই বিদ্যমান ছিলো এবং সর্বদা বিদ্যমান থাকবে।

(২) প্রকৃতি সর্বব্যাপী না, কারণ এই সৃষ্টির বাইরে এমনও স্থান আছে যেখানে না প্রকৃতি আছে, না জীব আছে, আছে শুধু ঈশ্বর আর ঈশ্বর।

(৩) ঈশ্বর প্রকৃতির আধার । ঈশ্বরই প্রকৃতির স্বামী।

(৪) প্রকৃতি জ্ঞানরহিত। প্রকৃতি ঈশ্বরের সহায়তা ছাড়া সঞ্চালিত হতে পারে না।

(৫) সংসারে এমন কোনো ঘটনাই নাই যাকে জাদু বলা যেতে পারে। সব ঘটনা ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী ঘটে। প্রকৃতিরও বিভিন্ন ঘটনা যেমন সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী প্রভৃতির চলন ঐশ্বরিক অটল নিয়মানুযায়ী হয়ে থাকে। এই ঋত = চিরন্তন নিয়ম বদলায় না, সর্বদা একই থাকে।

ঈশ্বর ও জীবাত্মার মধ্যে মিল:

ঈশ্বর ও জীবাত্মা উভয়েই চেতন, অনাদি, অজর (জীবাত্মা তত্ত্বগত), অমর (জীবাত্মার দেহ সংযোগ-বিয়োগই জন্ম-মৃত্যু), নিরাকার (কিন্তু জীবাত্মা অণুপরিমাণ), ভারহীন, সক্রিয়, অলিঙ্গ

ঈশ্বর ও জীবাত্মার মধ্যে অমিল:

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, কর্মফলদাতা, আনন্দময় সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, সর্বরক্ষক,সর্বব্যাপক, অন্তর্যামী, সুখস্বরূপ, রোগ-বিয়োগ রহিত, শুদ্ধ-সম্পূর্ণ, নির্লিপ্ত, নিষ্কাম, নির্লোভ, নিরাকার, নির্দ্বন্দ, অনুপম, অপরাজিত, অদ্বিতীয়, পাপনাশক, পরমপূজ্য, অবিদ্যারহিত, বেদদাতা, সর্বগুরু ; জীবাত্মা অণুপরিমাণ, সর্বেশ্বর নয়, অল্পজ্ঞ, কর্মফল ভোক্তা, মুক্ত অবস্থাতেও জগৎ সৃজনাদি কাজের সক্ষমতা থাকে না, স্বরূপগতভাবে আনন্দময় নয়, রোগ-শোক ভোগ করে, অবিদ্যাগ্রস্ত হয় তাই প্রকৃত আনন্দলাভে ঈশ্বরকে পেতে চায়; ঈশ্বর এক কিন্তু জীবাত্মা বহু।

পরমাত্মা জীবাত্মার মধ্যে সম্পর্ক

পরমাত্মা সকল জীবাত্মার মাতা ও পিতা আর সকল জীবাত্মা পরমাত্মার সন্তান স্বরূপ। পরমাত্মা সর্বস্বামী, রাজা, উপাস্য, সাধ্য, ন্যায়াধীশ, জন্মপ্রদাতা আর জীবাত্মা সেবক, প্রজা, উপাসক, সাধক, ন্যায়প্রার্থী, জন্মগ্রহীতা। পরমাত্মা সূক্ষ্মতম বলে জীবাত্মার ভেতরে ও বাইরে সর্বত্র ব্যাপক, কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে ব্যাপক। পরমাত্মা বরণীয়, যজনীয়, শরণ, লক্ষ্য, স্তুত্য, দেব, ভগবান, সুখশান্তিদাতা, দণ্ডদাতা, পুরস্কারদাতা, নিয়ন্ত্রক, মুক্তিদাতা, প্রেরক, ভোগপ্রদাতা, প্রার্থিত, রক্ষক, উপকারী, অনুগ্রহকারী, পুরোহিত, ধ্যেয়, জ্ঞেয়, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য, কমনীয়, জনক, তারক। জীবাত্মা যথাক্রমে বরণকর্তা, যাজক, শরণাগত, পথিক, স্তোতা, পূজারী, ভক্ত, আনন্দভোক্তা, দণ্ডিত, পুরস্কৃত, মুক্তিগৃহীতা, প্রেরিত, ভোগ-ভোক্তা, প্রার্থয়িতা, রক্ষিত, উপকৃত, অনুগৃহীত, যজমান, ধ্যাতা, জ্ঞাতা, মন্ত্রা, নিদিধ্যাসিতা, কামনাকারী, জন্য ও তর্তা।

ঈশ্বর ও প্রকৃতি মধ্যে অমিল

ঈশ্বর চেতন হলেও প্রকৃতি জড়। প্রকৃতি রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শযুক্ত, ঈশ্বর তা নন। প্রকৃতির নিজের কিছু করার স্বরূপতঃ ক্ষমতা নেই, ঈশ্বর নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়। প্রকৃতির কর্মফল দানের কোনো ক্ষমতা নেই। ঈশ্বর লাভে পাওয়া সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ সর্বোত্তম, নিত্য, শান্তিদায়ক, অনন্ত, সর্বদা উপলব্ধ, বাহ্যিক উপাদান নির্ভশীল নয়, বুদ্ধিবর্ধক, শুদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতি থেকে পাওয়া সুখ ক্ষণস্থায়ী, আসক্তি তৈরি করতে পারে, অনিত্য,

অশান্তি তৈরি করতে পারে, অল্প, সর্বত্র অপ্রাপ্য, সাধন বা উপাদান নির্ভর, পরিণাম-তাপ-সংস্কার-গুণবৃত্তি বিরোধ দুঃখ তৈরি করে।

ঈশ্বর - জীবাত্মা - প্রকৃতির মধ্যে মিল

৩টিই অনাদি

ঈশ্বর - জীবাত্মা - প্রকৃতির মধ্যে অমিল

ঈশ্বর জীবাত্মাকে তার কর্মফল দিয়ে দেহযুক্ত করেন, দেহটি প্রকৃতির উপাদানে নির্মিত। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক জড় বস্তু, তার চেতনা নেই বলে প্রকৃতি থেকে একাকী কোনো কাজ হয় না। তাই সাম্যাবস্থা তথা প্রকৃতি থেকে জগৎ ঈশ্বর ব্যতীত তৈরি হয় না। প্রকৃতি সর্বব্যাপক নয় বরং ঈশ্বর এর থেকেও অধিক ব্যাপ্ত, জীবাত্মা দেহে একদেশী। এজন্যই ঈশ্বর জগৎ-স্রষ্টা এবং যদিও জীবাত্মা ও প্রকৃতি অনাদি কিন্তু তাদের ঈশ্বরের ন্যায় সামর্থ্য নেই বলে তারা ঈশ্বরেরই অধীন। ঈশ্বর সকলের প্রভু ও বিধাতা। ঈশ্বর তার নিজের অসীম শক্তিবলে এই জড় জগৎ সংসার নির্মাণ করেন এবং তাতে জীবাত্মাকে তার কর্ম অনুযায়ী জন্ম ও অন্যাদি ফল প্রদান করেন। প্রকৃতি থেকে যে সুখ জীবাত্মা পায় তা অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত ব্রহ্মানন্দ নিত্য ও প্রকৃত সুখ। জগৎ স্থূল, প্রকৃতি সূক্ষ্ম, জীবাত্মা সূক্ষ্মতর, পরমাত্মা সূক্ষ্মতম- এজন্য পরমাত্মা সর্বপ্রবিষ্ট এবং জীবাত্মা ও প্রকৃতি থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও সর্বব্যাপক।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যজ্ঞে মন্ত্র উচ্চারণের কী প্রয়োজন ?

বেদমাতা আমাদের আহ্বান জানায়— যজ্ঞে বসে অগ্নিতে আহুতি নিবেদন করতে হবে, সেইসঙ্গে হৃদয়ভরা মন্ত্রোচ্চারণও আবশ্যক।

উপপ্রয়ন্তো অধ্বরং মন্ত্রং বোচেমাগ্নয়ে [ঋগ্বেদ ১।৭৪।১]

অর্থাৎ, অহিংস অগ্নিহোত্রের সময় মন্ত্রোচ্চারণ করো।

ওহে ভক্তবৃন্দ ! যজ্ঞের অগ্নিসভায় বসে শুধু দেহে নয়, বাক্যে মন্ত্রধ্বনি জাগিয়ে এবং মনে তার অর্থধ্যান করে অর্ঘ্য দান করো। মন যেন প্রবাহিত হয় সেই অগ্নির দিকে, যেখানে জীবনের সকল তমসা দীপ্তিতে রূপান্তরিত হয়।

মন যেন সম্পূর্ণভাবে সেই মহৎ কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়। কারণ, শুধু বাহ্যিক আহুতি নয়, মন ও বাক্যের পবিত্র সমন্বয়ে যজ্ঞ পরিপূর্ণ হয়। এজন্য বেদ বলছে,

অগ্নিমিন্ধানী মনসা ধিয়ং সচেত মর্ত্যঃ [ঋগ্বেদ ৮।১০২।২২]

অর্থাৎ, শ্রদ্ধার সাথে যজ্ঞাগ্নিকে প্রদীপ্ত করতে করতে যজমান মানব যজ্ঞবিধিকেও সম্পন্ন করেন।

শুধু অগ্নিতে সামগ্রী অর্পণ করলেই বায়ুশুদ্ধি ও রোগনিবারণ হতে পারে। কিন্তু অগ্নিহোত্রের উদ্দেশ্য এতটুকুতে সীমাবদ্ধ নয়।

মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে, তার গভীর অর্থ-চিন্তনের মাধ্যমে এবং বিধির অন্তর্নিহিত অনুভবকে হৃদয়ে ধারণ করে, যজ্ঞ আমাদের এক অনুপম আত্মিক আহার প্রদান করে। এ আহার দেহের নয়, আত্মার — যেখানে চেতনা জেগে ওঠে, হৃদয় প্রফুল্ল হয়, মন উদ্দীপ্ত হয় পূর্ণতার অভিমুখে।

যজ্ঞে বসে শুধু অগ্নিতে দায়মাত্রে আহুতি দান করলেই হয় না; প্রয়োজন হৃদয়ের স্ফুরণ, প্রয়োজন শব্দস্রোতে মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্র ধ্বনি, প্রয়োজন মননভরা আরাধনা। মন, বাক্য ও কর্মের সম্মিলনেই সম্পূর্ণ হয় যজ্ঞের সাধনা।

কেবল ধূপগন্ধে বায়ুশুদ্ধি হতে পারে,
কেবল যজ্ঞাগ্নির ওষধীর প্রভাবে
দূর হতে পারে রোগের ছায়া;
কিন্তু অগ্নিহোত্রের গভীর উদ্দেশ্য
তার চেয়েও অনন্তগভীর।
এ এক আত্মিক অর্ঘ্য—
যেখানে মন্ত্রের প্রতিটি উচ্চারণে
জেগে ওঠে অন্তঃচেতনার দীপ্তি,
আহুতির প্রতিটি অঙ্গুলিতে
প্রস্ফুটিত হয় অন্তরের পুষ্পাঞ্জলি।

এ তো আত্মার এক মহোৎসব, যেখানে মন্ত্রোচ্চারণের ধ্বনিতে, অন্তর্চিন্তনের দীপ্তিতে এবং বিধিবদ্ধ আচরণের শুদ্ধতায়, আমরা পান করি এক অনির্বচনীয় আধ্যাত্মিক আহার।

এই আহার হৃদয়ের, এই আহার চেতনার — যেখানে ক্ষুদ্রতা লুপ্ত হয়ে, আমরা অনুভব করি অনন্তের স্পর্শ।

মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে এবং মন্ত্রগুলির অর্থ নিয়ে চেতনায় ভাবতে ভাবতে ও বিধিবদ্ধ নিয়মগুলির উদ্দেশ্য হৃদয়ে অনুভব করতে করতে আমরা যে আত্মিক আহার লাভ করি, সেটাও অগ্নিহোত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দান। ভক্তরা দেখবেন, এই বিধি ও মন্ত্রগুলিতে কত গভীর বিস্ময় নিহিত আছে। যেখানে ভক্ত আবিষ্কার করবেন— কত রহস্য, কত গভীর শক্তি নিহিত রয়েছে প্রতিটি ধ্বনিতে, প্রতিটি অনুশাসনে। যখন আমরা মন্ত্রের অনুরণনে হৃদয় ভরিয়ে আহুতি প্রদান করি, তখন অল্প সময়ের মধ্যেই অনুভব করি— এক অনির্বচনীয় অর্জন, এক নবচেতনার আলোকস্নান।

প্রতিটি বিধি, প্রতিটি মন্ত্র যেন এক রহস্যময় প্রদীপ,
যা আলোকিত করে জীবনের দিকপথ।
মন্ত্রোচ্চারণের আবেশে এবং হৃদয়ের নিঃশব্দ আরতিতে
হোমের কয়েকটি মুহূর্তই রূপ নেয় এক বিশাল আত্মার উল্লাসে।
মন প্রসন্ন হয়, চেতনা উদ্দীপ্ত হয়,
পথ খোলে পূর্ণতার অমল সূর্যের দিকে।

আমরা যখন মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে এবং সেই মন্ত্রসমূহের অন্তর্নিহিত ভাবনায় আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করে হোম করবো, তখন অনুভব করবো যে মাত্র অর্ধঘণ্টার অগ্নিহোত্রের মধ্যেই আমরা কত বড় এক অর্জন করেছি, আমাদের মন কতটা প্রফুল্ল, উদ্যমী এবং পূর্ণতার দিকে এগিয়ে গেছে।

আর যারা প্রশ্ন করেন— "শুধু হোমেই যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে মন্ত্রপাঠ কেন?"

মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী 'ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা'-তে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেন—

মন্ত্রপাঠ বেদসমূহের রক্ষা করে, ইন্ধনের প্রতি স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনা প্রকাশ করে। হোমের ফলশ্রুতিও স্মরণ করায়। মন্ত্রের পুনরাবৃত্তিতে তারা কণ্ঠস্থ হয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, এবং প্রতিটি কর্ম ঈশ্বরকে স্মরণ করেই আরম্ভ হয়। যজ্ঞের প্রতিটি পরতে পরতে তখন ঈশ্বরপ্রেমের সুর ধ্বনিত হতে থাকে।

মন্ত্রে রয়েছে সেই ব্যাখ্যা, যা হোমের অন্তর্নিহিত ফলাফল প্রকাশ করে। তাদের পাঠের মধ্য দিয়ে বেদপাঠ ও সংরক্ষণও সাধিত হয়।

[সূত্র: ঋগ্বেদাদিভাষ্যভূমিকা, বেদবিষয়বিচার, কর্মকাণ্ড প্রকরণ]

মন্ত্রপাঠ বেদের রক্ষক, বেদের ধারক;

ইন্ধনের বন্দনা, ঈশ্বরের প্রার্থনা ও উপাসনার বহিঃপ্রকাশ। মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি কণ্ঠস্থ করে আমাদের স্মৃতি,

সতত স্মরণ করায় ঈশ্বরের সর্বব্যাপী উপস্থিতি।

প্রত্যেক যজ্ঞ, প্রত্যেক কর্মের সূচনা হয়—

ঈশ্বরের প্রতি প্রণত হৃদয় নিয়ে।

মন্ত্রই ব্যাখ্যা করে হোমের অন্তর্নিহিত মহিমা,

পাঠ করে আমরা সংরক্ষণ করি বেদের চিরন্তন ধারা।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সবাই ভুল আর আমিই একমাত্র ঠিক কীভাবে ? এটা কি অহংকার না ?

প্রশ্ন: সবাই ভুল আর আমিই একমাত্র ঠিক কীভাবে ? এটা কি অহংকার না ?

উত্তর: নমস্তে!

সুপ্রিয় প্রশ্নকর্তা, আপনি ও আমি সবাই জানি কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল তার একটি মানদণ্ড থাকতে হবে। পৃথিবীতে সব ব্যক্তিই আলাদা এবং প্রত্যেকের নিজ নিজ চিন্তাধারা আছে। সবাই মনে করে তার পক্ষই ঠিক এবং অন্যের পক্ষ ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু আমরা যদি ভেবে দেখি, একই সাথে সব ঠিক হতেও পারে না, আবার একই সাথে সব ভুলও হতে পারেনা। কেন ? কারণ পরস্পরবিরোধী দুইটি সিদ্ধান্ত ঠিক হওয়া অসম্ভব। আবার যদি আমি কাউকে ভুল বলি তাহলে আমাকে এটাও বলতে হবে কেন ও কোন যুক্তিতে আমি সেটিকে ভুল বলছি। অর্থাৎ যদি আমি না জানি সঠিক কোনটি তাহলে দ্ব্যর্থহীনভাবে বাকি সব বিষয়কে ভুল বা সবই সঠিক বলা খুবই কঠিন।

কেউ কেউ বলেন, 'এত মানুষ যা মানে তা ভুল কীভাবে হয় ?'। আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে,

“ যা ধর্ম তা সত্য। সত্য বা ধর্ম কোনো গণতান্ত্রিক বিষয় নয়। যা সত্য তা ১জন মানুষও যদি মানে বা কেউ যদি না মানে তারপরেও সত্যই থাকবে। যা মিথ্যা তা যদি সবাই মানে তাও সেটা মিথ্যাই থাকবে।”

প্রিয় পাঠক! আসুন, একটি উদাহরণ দিয়ে আপনাকে বিষয়টি বোঝাই। দেখুন, বর্তমান পৃথিবীতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদের উপর ভিত্তি করে জনসংখ্যা বিবেচনায় অধঃক্রমানুসারে রয়েছে-

১। খ্রিস্টমত

২। ইসলাম মত

৩। অজ্ঞেয়বাদ

৪। সনাতন ধর্ম

৫। বৌদ্ধ মত

সূত্র: Religious Composition by Country, 2010-2050". Pew Research Center. 2 April 2015. Archived from the original on 28 January 2023. Retrieved 28 January 2023

লক্ষ্যণীয়, যদি আমরা 'এত মানুষ মানে তাহলে অবশ্যই সত্য' এই দৃষ্টিতে দেখি, তাহলে খ্রিস্ট মত সর্বাধিক সত্য, তারপর আসে ইসলাম, তারপর অজ্ঞেয়বাদ বা ধর্মীয় পরিচয়হীন এবং তারপর আসে চতুর্থ স্থানে সনাতন ধর্ম। এখন যদি আপনি অজ্ঞেয়বাদ বা ধর্মহীনতাকে এখানে গণনা নাও করতে চান তারপরেও কিন্তু আপনার চেয়ে ইসলাম ও খ্রিস্ট মতের অনুসারীরা জনসংখ্যায় এগিয়ে। তাহলে এখন যদি কেউ বলে যেহেতু সব থেকে বেশি মানুষ খ্রিস্টমত মানে তাহলে কি আপনি মেনে নেবেন ? ইসলাম মত অনুযায়ী তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ব্যতীত বাকি সব অগ্রহণযোগ্য। তাহলে তারাও জনসংখ্যা তত্ত্ব স্বীকার করছে না। অর্থাৎ আপনি জনসংখ্যা বা 'বেশি মানুষ মানে' এই যুক্তিতে কখনোই ইসলাম ও খ্রিস্ট মতকে অধিকতর সত্য বলে মেনে নেবেন না, বরং যুক্তিতর্ক ও প্রমাণ দিয়ে দেখাতে চাইবেন কেন আপনারটাই একমাত্র কিংবা অধিকতর সঠিক। সুতরাং আপনাকেও কিন্তু যুক্তি-প্রমাণ-সত্যে আসতে হচ্ছেই। তাহলে নিঃসন্দেহে 'আমার মতই সত্য' এটা বলার ও প্রমাণ করার অধিকার ও যৌক্তিকতাও আমার আছে। কারণ, সত্য কখনোই পরিমাণগত নয়।

যারা এই জাতীয় সত্যান্বেষণ করতে চান না তাদের দুইটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (১) ইনারা 'উদার' এমন একটা পরিচয় তৈরি করতে চান (২) ইনারা অলস। দুইটি দলই একটি দোষে দুষ্ট। তা হলো, তারা মিথ্যা বা অবিদ্যার প্রচারের সুযোগ দিচ্ছেন। আপনি যদি সত্য জানেন তবে মিথ্যাকে দূর করাও আপনার কর্তব্য। 'মনুষ্য' শব্দটি এসেছে মননশীলতা থেকে। আপনি যদি নিজেকে সর্বোচ্চ বুদ্ধিমান প্রজাতির একজন সদস্য বলে আখ্যায়িত করে সমাজে মিথ্যার বিস্তার হতে সাহায্য করেন বা নীরব থাকেন তবে আপনিও সেই একই দোষে অপরাধী। অবিদ্যার বিস্তারে নীরব থাকে উদারতা বলে না। অন্যায় যে করে তার সমান অপরাধী অন্যায়কে যারা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। আপনি বলতেই পারেন 'অমুক তার মত প্রচার করছে তো না এতে সমাজের ক্ষতি হচ্ছে না সে জোর করছে অন্যদের' - এই কথাটি যুক্তিহীন। একজন ব্যক্তি সমাজে, ধরা যাক, প্রচার করছে যে, 'ঘোড়ার ডিম হয়' এবং যারা এটা বিশ্বাস করে না তারা চূড়ান্ত পাপী ও পরকালে দুঃখভাগী হবে। এখন সেই ব্যক্তি যদি কাউকে জোর নাও করে তাও সে অবিদ্যার প্রচারে দুষ্ট এবং অন্যদের প্রতি অযাচিত বিদ্বেষ প্রসারে দায়ী। তাহলে অবশ্যই তার নিবারণ আবশ্যক ও সত্যের প্রচার জরুরী। এজন্য তথাকথিত 'উদার' হওয়ার

আড়ালে হয় একটি স্বার্থান্বেষী চরিত্র লুকায়িত আছে কিংবা নিজের বিদ্যার অপব্যবহার বা অব্যবহার রয়েছে। প্রকৃত শিক্ষিত ও বিচক্ষণ ব্যক্তি এবং যারা দেশ ও সমাজের উপকার করতে ইচ্ছুক তারা কখনোই অবিদ্যার বিস্তার মেনে নেয় না।

পৃথিবীতে দরিদ্রের সংখ্যা ধনী থেকে বেশি, তাই বলে দারিদ্র্য ভালো নয়। আমরা সমাজে বুদ্ধিমান মানুষ কম, বোকা মানুষদের বেশি দেখি, তাতে বুদ্ধির মূল্য ও গুরুত্ব কমে যায় না। আদিকাল থেকেই বিজ্ঞানী, গবেষক, সাহিত্যিক প্রভৃতি প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা সংখ্যায় কমই হন, তাই বলে কি তারা মূল্যহীন? সমাজের অধিকাংশ মানুষই স্বার্থপরায়ণ, তাই বলে মানবতা কি জগতের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হবে না ?

গুণগতভাবে যা উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ তা সর্বকালীন ও সর্বজনীন। এটি অহংকার নয়। মিথ্যা সর্বদা সত্যের ভয়ে ভীত থাকে। যদি সূর্যের আলোকে আমার চোখ সহ্য করতে না পারে তবে তা আমার চোখের সীমাবদ্ধতা। যদি ১০ লিটারের পাত্রে ১০০ লিটার জল না আঁটে তবে তা পাত্রের সীমাবদ্ধতা। এতে না সূর্যের দোষ, না জলের পরিমাণের দোষ। আমাদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা দিয়ে আমরা যদি ভুল ও ঠিক ধর্ম-ধর্মমত বিচার করতে যাই তবে তা হবে অজ্ঞতা। একইভাবে আমাদের জীবনে ধর্মাচারণের ঐশ্বরিকবিধিবিধান আছে, শ্রুত্যাদি গ্রন্থ বিদ্যমান। আমাদের সমগ্র শাস্ত্র মুহুর্মুহু বেদকে অগ্রাধিকারদানপূর্বক বেদানুকূল শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যার প্রয়োগের মাধ্যমে সত্য নির্ণয় করতে উৎসাহিত করছে। এটি অহংকার নয়, সত্য বলা কখনো ভ্রান্তি নয়, সত্যের প্রচার করা কখনো দুষ্কর্ম নয় বরং মহাপুণ্যকাজ। সত্যের ডঙ্কানিনাদই পারে অজ্ঞানকে দূর করতে। সত্যের আলোকই পারে অবিদ্যার অন্ধকারকে দূর করে নতুন প্রভাত আনতে। কারণ,

সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম

[তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ব্রহ্মানন্দবল্লী প্রথমোঽনুবাক]

ব্রহ্ম সত্য, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

তেলুগু রামায়ণ - রচনা বৈশিষ্ট্য ও বাল্মীকির সাথে পার্থক্য

অন্ধ্রপ্রদেশে তেলুগু ভাষায় রামকথার বহুল প্রচার হয়েছে। তবে প্রথম সাহিত্যকৃতি শুরু হয় একাদশ শতকের মধ্যভাগে নন্নয় ও নারায়ণ ভট্টের রচিত 'মহাভারত' দিয়ে। নন্নয়ের অসমাপ্ত কাজ শেষ করেন তিক্কন ও এররাপ্রগড-যাঁরা তেলুগু সাহিত্যে 'কবিত্রয়' নামে খ্যাত।

তেলুগুভাষীদের রামভক্তির পরিচায়ক হলো অন্ধ্রের বহু রামমন্দির, বিখ্যাত গীতিকার ত্যাগরাজের (১৭৬৭-১৮৪৭ খ্রিঃ) রামভজন, জনপ্রিয় রামভজনম নৃত্য, রামের জন্মদিন রামনবমী ব্রত অনুষ্ঠান এবং স্থান ও মানুষের নামকরণ। মায়েরা শিশুদের স্নান করানোর সময় বলেন, 'শ্রীরাম রকষা, নুরেল্লু, আয়ুস্স' অর্থাৎ শ্রীরাম তোমায় রক্ষা করুন, শতায়ু হও। চিঠিপত্রের শিরোনামা হিসাবে লেখা হয় 'শ্রীরাম জয়ম্। বিবাহের সময়ে মঙ্গলসূত্র পরাতে 'আনন্দময় আনন্দময়' বলে যে গান গাওয়া হয়, তা শ্রীরাম ও সীতার বিবাহের স্মারক। অনেক লোকগাথায় রামকথা-যেমন ঊর্মিলার নিদ্রা, লক্ষ্মণের হাস্য, লবকুশের জয় প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

রামায়ণ কাহিনিকে অবলম্বন করে সৃষ্টি হয়েছে অনেক প্রবাদ। যেমন,

১. সীতা পুট্টে, লঙ্কা চেডে অর্থাৎ সীতার জন্ম হল, লঙ্কার ধ্বংস হল।

২. কাট্টে, কোট্টে, টেচচে, অর্থাৎ তৈরি হল (সেতুবন্ধ), নিহত হল (রাবণাদি) এবং আনীত হল (সীতা)। সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণ।

৩. ইনটিগুটু লঙ্কাকু চেটু অর্থাৎ গোপন কথা প্রকাশের জন্য লঙ্কার ধ্বংস-বিভীষণের সমালোচনা।

তেলুগুতে শতাধিক রামায়ণ ও রামকথাশ্রিত গ্রন্থ আছে। সাহিত্যের বিভিন্ন শৈলীতে পূর্ণাঙ্গ কিংবা আংশিক, রামকথা পাওয়া যায়। কাব্য, দ্বিপদ, যক্ষগান (নৃত্যনাট্য), শতক দণ্ডক, গেয় (গান), সংকীর্তন, চাটু (বিক্ষিপ্ত স্তবক), নাটক, গদ্য প্রভৃতিতে রামকথা লিখিত হয়েছে। লোকগীতেও রামকথা আছে। সংস্কৃত ললিত ও ধার্মিক রামকথাও তেলুগুতে অনূদিত হয়েছে।

তিক্কনের (নির্বচনোত্তর রামায়ণের কবি) পর শ্রেষ্ঠ রামায়ণকার হলেন গোন বুদ্ধ রেড্ডি (Gona Budda Reddy)-যাঁর গ্রন্থ 'রঙ্গনাথ রামায়ণ' নামে পরিচিত। গ্রন্থটির রচনাকাল কেউ বলেন ১২৪০ খ্রিঃ, আবার কেউ বলেছেন ১২৮০-১৩০০ খ্রিঃ-র মধ্যে। দ্বিপদ ছন্দে লেখা কাব্যটিতে আছে ৩৪,৫৮০ পঙক্তি। এ রামায়ণ গান করা চলে। এর তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো: প্রথমত, এ রামায়ণ তোলুবোমমলতের (puppetry) সঙ্গে গীত হয় বলে জনপ্রিয়। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের বোধ্য এবং তৃতীয়ত, এতে কিছু ঘটনা ও বর্ণনার অনুপুঙ্খ আছে, যা মূল রামায়ণে নেই।

লক্ষণীয় হলো, রঙ্গনাথ রামায়ণে যে সব পরিবর্তন আনা হয়েছে তার মূল লক্ষ্য ছিল কিষ্কিন্ধ্যা ও লঙ্কার চরিত্রগুলির নৈতিক মানোন্নয়ন। বাল্মীকি রামায়ণে অর্ধশ্লোকে ইন্দ্রজিৎ-পত্নীর উল্লেখমাত্র আছে, নাম নেই। রঙ্গনাথ রামায়ণে তাঁর নাম সুলোচনা। সতী সাধ্বীরূপে তাঁর যে চিত্র রঙ্গনাথ এঁকেছেন তা সীতার সমতুল্য। আদিশেষের কন্যা সুলোচনা যেভাবে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ইন্দ্রজিতের মৃতদেহ নিয়ে আসেন, তাতে রাবণও বিস্মিত হন। পরে সুলোচনা সতী হন। এই বীরাঙ্গনা ও সাধ্বী চরিত্রের অনুকরণে মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রমীলা চরিত্র এঁকে থাকতে পারেন।

মন্দোদরী চরিত্রও উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত। প্রথমে তিনি রাবণকে সীতা প্রত্যার্পণের কথা বলেন। পরে যখন রাবণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন, তখন কিন্তু তিনি স্বামীকে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যই উৎসাহিত করেন। তাঁর আত্মমর্যাদা কত তীক্ষ্ণ ছিল-তাই দেখানো হয়েছে।

রাবণ এখানে মহাবীর। তাঁর পার্শ্বচরিণীর কণ্ঠহার রাম যখন তাকে আহত না করেই ছেদন করেন, তখন রাবণ তীরন্দাজ হিসাবে রামের প্রভূত প্রশংসা করেন-যা তাঁর বীরধর্মের সাক্ষ্য বহন করে। কুম্ভকর্ণকেও তিনি রামের হাতে মৃত্যুবরণের ইচ্ছার কথা বলেন। কুম্ভকর্ণও এখানে অমানুষিক যন্ত্ররাক্ষসের মতো চিত্রিত নয়। শ্রেষ্ঠ চরিত্র অবশ্যই সীতা ও রাম।

রঙ্গনাথ কিষ্কিন্ধ্যার রাণী তারার চরিত্রেরও উদ্দেশ্যমূলক সংস্কার করেছেন। কম্বনের মতো পাতিব্রত্য ও শুদ্ধ বৈধব্য জীবন যাপনের কথা না বলে তিনি তাঁকে সমুদ্রোত্থিতা অপ্সরারূপে দেখিয়েছেন। সমুদ্র-মন্থনের সময়ে বালী ও সুগ্রীব দেবতাদের সাহায্য করেন। লক্ষ্মী ও চন্দ্রমার উদয়ের পরে আবির্ভূত হন দেবকন্যারা। তাঁদের মধ্যে থেকে তারাকে দেওয়া হয় বালী ও সুগ্রীবকে। বাল্মীকি রামায়ণে তারা বালী ও সুগ্রীব দুজনকেই গ্রহণ করেন। তাঁর এই

দ্বিচারিতাকে সহজ ও লঘু করে দেওয়ার জন্যই এই অপ্সরাজন্মের অভিনব পরিকল্পনা। কিষ্কিন্ধ্যা নারীর প্রতিভূ কিষ্কিন্ধ্যারাণী তারার পক্ষে যা কলঙ্কজনক, অপ্সরা তারার প্রতি সেই মানবিক নীতির মানদণ্ড প্রযোজ্য নয়।

রঙ্গনাথ রামায়ণে রাম পূর্বে মন্থরার পা ভেঙে দেন এবং লক্ষ্মণ শূর্পণখার পুত্র জম্বুকুমারকে হত্যা করেন। তাই রাম-বনবাস ও রাম-রাবণের যুদ্ধ যারা ঘটিয়েছিল, তাদের নিপীড়িত রূপে দেখানো হয়েছে এবং তাদের বৈরকে সকারণ করে তোলা হয়েছে।

রঙ্গনাথ রামায়ণে আরও কয়েকটি ঘটনা আছে, যা বাল্মীকি রামায়ণে বা কম্ব রামায়ণে পাওয়া যায় না। যেমন:

১. লক্ষ্মণ কুটির ছেড়ে যাওয়ার আগে কুটিরের চারদিকে সাতটি রেখা আঁকেন এবং সীতাকে তার বাইরে যেতে নিষেধ করেন।

২. রাম ও লক্ষ্মণ যখন নাগপাশে বদ্ধ হন, তখন সীতাকে যুদ্ধক্ষেত্রে আনা হয়।

৩. হনুমানের সঞ্জীবনী লতা আনার সময়ে কালনেমী নানাভাবে বাধা দানের চেষ্টা করেন।

৪. লক্ষ্মণের মূর্ছাভঙ্গের সংবাদ পেয়ে রাবণ শুক্রাচার্যের কাছে যান রামনিধনের উপায় জানতে। শুক্রের নির্দেশে তিনি ভূগর্ভস্থ গুহায় হোম করেন।

৫. রাবণের কাটা মাথা ও হাতের নব সংযোজন হতে দেখে রাম বিস্মিত হন। রাবণের নাভিকুণ্ডে অমৃত থাকার গোপন রহস্য বিভীষণ রামকে জানিয়ে দেন-রাম শরাঘাতে সে অমৃত শুষ্ক করলে রাবণের মৃত্যু হয়।

৬. ব্রাহ্মণ রাবণকে নিহত করার জন্য রাম রামেশ্বরমে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন।

রঙ্গনাথ রামায়ণের উত্তরকাণ্ড লেখেন কবির দুই পুত্র গোন কাচ এবং বিটঠল্লাজু।

উল্লেখযোগ্য পরবর্তী রচনা হলো 'ভাস্কর রামায়ণ'। রঙ্গনাথেরই সমসাময়িক বলে অনেকে মনে করেন। ছয় কাণ্ডের মাঝে মাঝে গদ্য আছে। ভাস্করের নামে প্রচলিত থাকলেও ভাস্কর শুধু অরণ্য কাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ডের কিছু অংশ লেখেন। অন্য কাণ্ডগুলি রচনা করেন তাঁর পুত্র মল্লিকার্জুন ভট্টু, তাঁর শিষ্য কুমার রুদ্র দেব এবং তাঁর বন্ধু আয়য়ালার। অনেকের মতে, কবি কাকতীয় রাজ দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রের (১২৯৬-১৩২৩ খ্রিঃ) সভাকবি ছিলেন।

রঙ্গনাথ রামায়ণের খ্যাতির প্রতিসূধী ভাস্কর রামায়ণ চম্পু পদ্ধতিতে লেখা; সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষায় লেখা সাহিত্যিক সৌকর্যের জন্য এই গ্রন্থ পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। রঙ্গনাথ রামায়ণের মতো অবাল্মীকীয় প্রসঙ্গও আছে। যেমন,

১. ভরতের ননিহাল যাওয়ার কথা নেই, যা বাল্মীকি ও রঙ্গনাথ রামায়ণে পাওয়া যায়।

২. রাম মন্থরাকে পূর্বে পদপ্রহার করেন।

৩. লক্ষ্মণ শূর্পণখার পুত্র জম্বুকুমারকে বধ করেন-যে কথা রঙ্গনাথ রামায়ণে আছে।

৪. যুদ্ধপূর্বে বিভীষণের লঙ্কারাজ্যে অভিষেকের সময়ে সুগ্রীব রামকে প্রশ্ন করেন যে, রাম শরণাগতের রক্ষক, রাবণ তাঁর শরণ নিলে তিনি কী করবেন। রাম বলেন, সেই পরিস্থিতিতে তিনি বিভীষণকে অযোধ্যা রাজ্য দিয়ে দেবেন।

৫. অঙ্গদ রামের দূতরূপে রাবণের সভায় যান এবং রাবণকে ক্ষমা প্রার্থনা করে সীতাকে প্রত্যার্পণ করতে বলেন। রাবণকে তিনি বিভীষণকে রাজ্যদানের কথাও বলেন।

৬. কালনেমীর কথা এবং ভরতের দুঃস্বপ্নের কথা আছে।

৭. অগস্ত্য রামকে আদিত্য-হৃদয় মন্ত্র দিতে গিয়ে তাঁকে বিষ্ণুরূপে স্তুতি করেন।

৮. সীতাকে রামের হাতে তুলে দিতে গিয়ে অগ্নি বলেন যে, সংসারের পবিত্রকারক আমি সীতার স্পর্শে পবিত্র হয়েছি।

ভাস্কর রামায়ণে অনেক কথাই রঙ্গনাথ রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে, যা বাল্মীকি রামায়ণে নেই।

চতুর্দশ শতকে আর একটি রামায়ণ লেখেন এক্সপ্রেগড। কবিত্রয়ের মধ্যে এরন্ন বলেই যাঁর খ্যাতি। লেখাটি পাওয়া যায়নি। তবে কবি-বৈয়াকরণ কুচিমাঞ্চি টিম্মা কবি (১৭৫৬) তাঁর 'সর্বলক্ষণসার সংগ্রহমু' গ্রন্থে 'এরন্ন রামায়ণ' থেকে নয় ছত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। অন্ধ্র কবিতা-পিতামহ বলে খ্যাত পিনা ভিমানও (চতুর্দশ শতক) এক রামায়ণ লেখেন যা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। আরও কয়েকটি রামায়ণ অজানা কারণে লুপ্ত হয়ে গেছে; যেমন, ভিওডিকুচি রামায়ণম, সকলবর্ণন পূর্ণম রামায়ণম।

বিখ্যাত গীতিকার অন্নমাচার্য (১৪২৪-১৫০৩ খ্রিঃ) তাঁর একটি গানে সংক্ষেপে রামায়ণ কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর দ্বিপদ ছন্দে লেখা রামায়ণ পাওয়া যায়নি।

দ্বিপদ ছন্দে রামায়ণ লেখেন অন্য দু'জন কবি-কট্ট ভরদরাজু (১৬৫০ খ্রিঃ) এবং ভোসলা একোজি (১৭৩৫ খ্রিঃ)। কট্ট ভরদরাজুর রামায়ণে ৪৬৩৪০ পঙক্তি আছে। দ্বিপদ ছন্দে লেখা সর্ববৃহৎ রামায়ণ। মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণে লেখা। এখানে রামসীতার বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। রাম বিবাহের সময়ে সীতার কণ্ঠে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেন-এ কথা অন্য রামায়ণে নেই। পঞ্চবটীতে যাওয়ার সময়ে জটায়ু রামের সঙ্গে ছিলেন।

অয়লরাজু রামভদ্রদু'র (১৫১০-১৫৮০ খ্রিঃ) 'রামভ্যুদয়ম'-এ রামায়ণের সংক্ষিপ্ত কাহিনি আছে। কবি বিখ্যাত অষ্টদিগঞ্জের (আটজন কবি) অন্যতম। তিনি রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধ শৈলীতে রামকথা সংক্ষেপণের প্রয়াস প্রশংসার্হ। এখানে রাণী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রার সঙ্গে রাজা দশরথের বসন্তকালীন উদ্যানবিহারের কথা আছে। সেতুবন্ধের পরে রামের নির্দেশে হনুমান দেব ও গন্ধর্ব স্ত্রীদের রাবণের কারাগার থেকে মুক্ত করে। এখানে রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

কুমোর জাতিভুক্ত মহিলা কবি মোল্ল (১৪শ শতক) ছয় কাণ্ডে সরস, সরল ও সংক্ষিপ্ত এক রামায়ণ লেখেন, যা জনপ্রিয় হয়। এখানে মন্থরার পরামর্শে নয়, কৈকেয়ী নিজেই ভরতের সিংহাসনপ্রাপ্তি ও রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাসের বর চেয়ে নেন।

কুচিমাঞ্চি তিম্ম কবি (১৬৮৪-১৭৫৭ খ্রিঃ) আটচা তেলুগু (খাঁটি তেলেগু) ভাষায় এক রামায়ণ লেখেন। তাঞ্জোরের রঘুনাথ নায়ক, অনন্তরাজু জন্নয়, মিক্কিলি মল্লিকার্জুনুদু প্রভৃতির রামায়ণও পাওয়া যায়।

কবিত্রয়ের অন্যতম তিক্কন (১২৬০ খ্রিঃ) প্রথম রামায়ণের উত্তরকাণ্ড লেখেন। তাঁর গ্রন্থ 'নির্বচনোত্তর রামায়ণ' ১২৬০ শ্লোক ১০টি কাণ্ডে বিভক্ত। একমতে, এঁরই পিতামহ ছিলেন রামায়ণকার কবি ভাস্কর। তিক্কনের উত্তরকাণ্ডের বিশেষত্ব হলো-প্রথমেই তিনি ক্ষুদ্রাকারে কাহিনিটি বিবৃত করেছেন, তবে রামের মৃত্যুর কথা লেখেননি। তিক্কনের রাম আদর্শ মানব এবং প্রাজ্ঞ শাসক। রাবণ ও রম্ভার কথোপকথন, রাম ও সীতার উদ্যানবিহার এমনই সৌন্দর্যের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে যে, খণ্ডকাব্য রূপে অভিহিত হওয়ার দাবি রাখে। সমালোচকেরা দুঃখ করেন যে, এই মহৎ কবি সমগ্র রামায়ণ রচনা করেননি। জয়ন্তী রামভট্ট পরবর্তীকালে তিক্কনের অলিখিত একটি পর্ব রচনা করেন।

কণকন্তি পাপরাজু আর একজন কবি, যিনি উত্তরকাণ্ড লেখেন। সম্ভবত তিনি সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। মূলের অনুসরণে তাঁর অনুবাদে তিক্কন পরিত্যক্ত সব কাহিনি গৃহীত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থে ৩০০০ কাব্যপঙক্তি এবং কিছু গদ্য পরিচ্ছেদ আছে।

অন্যান্য রামায়ণের মধ্যে শ্যামরায় কবির (১৯ শতক) রামায়ণ বচনের তিনটি কাণ্ড পাওয়া গেছে। গোপীনাথম বেনকট কবি (১৮৩২-১৮৯০ খ্রিঃ) প্রথম বাল্মীকি রামায়ণ শুদ্ধ তেলুগু ভাষায় রচনা করেন। অন্য অনুবাদ হলো সুব্বা রাও-এর (১৮৬৩-১৯৩৯ খ্রিঃ) 'শ্রীমন্ত অন্ধ্র বাল্মীকি রামায়ণসু'। তিনি এর একটি মূল্যবান ভাষ্য (মন্ধরস) লিখেছেন। তাঁকে 'অন্ধ্র বাল্মীকি' বলা হয়।

রামকথা নিয়ে অনেক খণ্ডকাব্যও তেলুগুতে লেখা হয়েছে। ধরণী দেবল রামাস্সার 'দশাবতার চরিত্রমু'তে শ্রীরাম অবতারের বিশদ বর্ণনা আছে। রাম-মাহাত্ম্য নিয়ে লেখা শতকের মধ্যে ভক্ত রামদাসের [Kancharla Gopanna] (ভদ্রাচলম) 'দাশরথী শতকম্' এবং যক্ষগানের মধ্যে কন্দুকুরি রুদ্রকবির [Kandukur Rudra Kavi] (১৬ শতক) লেখা 'সুগ্রীব বিজয়ম্' উল্লেখযোগ্য রচনা।

তেলুগু লোকগীতেও রাম কথা আছে। একটি গানে সীতাকে 'পদ্মজা' বলা হয়েছে। পদ্মটি নিজের কানন-সরোবর থেকে রাবণ সংগ্রহ করলে একটি অদৃশ্য কণ্ঠ বলে ওঠে-আমি তোমায় হত্যা করবো। মন্দোদরী তার মধ্যে শিশুকন্যা সীতাকে পান এবং বিভীষণকে বলেন যে, এ হলেন অতি লক্ষ্মী-শ্রীরামের স্ত্রী হবেন। কন্যাটিকে মঞ্জুষা করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে জনক তাকে কৃষিক্ষেত্রে কুড়িয়ে পান।

তেলুগু ভাষায় শতস্কন্ধ রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, বিচিত্র রামায়ণ পাওয়া যায়। রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে দ্ব্যর্থী কাব্য 'রাঘব পাণ্ডবীয়ম্' লিখেছেন পিঙ্গলি শূরণ। এ ধরনের অন্যান্য কাব্য হলো-'শিবরামভ্যুদয়ম্', 'শ্রীরামকৃষ্ণোপাখ্যায়াম্', 'অচলাত্মজা', 'পরিণয়ম্' ইত্যাদি। এরকম ত্রয়র্থী 'রাঘব-যাদব-পাণ্ডবীয়', এবং চতুর্থীও লেখা হয়েছে। তেলুগুতে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ', 'যোগবশিষ্ঠ রামায়ণ', 'আনন্দরামায়ণ', 'রঘুবংশ' প্রভৃতির অনুবাদ হয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে রামভক্তি বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। শুধু কাব্য-প্রবাদ, নৃত্যগীতে নয়, রামকথা পাথরে বাঙ্ময় হয়ে আছে শিলাস্তম্ভ, গুহা ও মন্দিরের রামায়ণী দৃশ্যে। নাগার্জুনকোণ্ডা, মুঘলরাজপুরম ও আনুডাবল্লীর গুহায়, আলমপুরের স্তম্ভে, নবব্রহ্মা, রামাপ্পা ও ত্রিকূটালার মন্দিরে রামায়ণের কত দৃশ্য রূপ ধরেছে। চিত্তোরের রামস্বামী মন্দির, পুষ্পগিরির মহেশ্বর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রামসীতা ও অযোধ্যা ভ্রাতাদের পূজা হয়। এখানে ভদ্রাচলমে যে রামমন্দির আছে, তা নির্মাণ করেন গোলকুণ্ডার নবাবের রামদাস নামে এক কর্মচারী।

- মূল: রামায়ণ চর্চা বহির্ভারতে (কোরক)

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বাল্মীকি রামায়ণের সময়কাল নির্ণয় – আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোকে

চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিকে শ্রীরামের জন্মতিথি হিসাবে পালন করা হয়। রামায়ণ থেকে পাওয়া যায় এই দিনের এই সময়ের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান।

ততো যজ্ঞে সমাপ্তে তু ঋতূনাং ষট্ সমত্যযুঃ।

ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥

নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে স্বোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।

গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ ॥

কৌসল্যাজনয়দ্রামং সর্বলক্ষণসংযুতম্ ॥

বাল্মীকি রামায়ণ ১।১৮।৮-১০

অর্থাৎ, চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হলে, রাজমহিষী কৌশল্যা শ্রীরামকে প্রসব করলেন।

উপর্যুক্ত অংশ থেকে গ্রহ নক্ষত্রের যা অবস্থান পাওয়া যায়:

(ক) পুনর্বসু নক্ষত্র, (খ) চৈত্র মাস, (গ) শুক্লপক্ষের নবমী তিথি, (ঘ) রবি মেষ রাশিতে, (ঙ) মঙ্গল মকর রাশিতে, (চ) শনি তুলা রাশিতে, (ছ) শুক্র কর্কট রাশিতে, (জ) বুধ মীন রাশিতে, (ঝ) কর্কট লগ্ন, (ঞ) বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত লগ্নে অবস্থিত।

এই অনুযায়ী সফটওয়ারে খুঁজলে রামনবমীর দিন পাওয়া যাচ্ছে ১০ই জানুয়ারী, ৫১১৪ খ্রীঃ পূঃ, ১২.৩০ দুপুর। এবার চৈত্র মাস জানুয়ারীতে কেন পড়ছে তার ব্যাখ্যার জন্য আধুনিক জ্যোর্তিবিদ্যার মহাবিষুবের বিপরীত গতি জানতে হবে। প্রতি ১° অতিক্রম করতে সময় লাগে ৭২ বছর। একে বিষুবীয় অগ্রগতি বলে। বরাহমিহির তার 'বৃহৎসংহিতা'-য় প্রতি ৫০০ বছরে এই সময়ের সংশোধন আবশ্যক বলেছেন।

কাজেই যদি আনুমানিক ১০০ দিনের অন্তর ধরা হয় (সাধারণত মার্চ/এপ্রিল মাসে চৈত্র মাস পড়ে), সংশোধিত সময়ের জন্য মোট বছর লাগছে ১০০ × ৭২ বছর = ৭২০০ বছর।

এখন বর্তমান সময়কাল ২০২৫ খ্রীঃ ধরলে রামায়ণে রামের জন্ম সাল ২০২৫+ ৫১১৪ বছর = ৭১৩৯ বছর যা ৭২০০ বছর থেকে মাত্র ৬১ বছরের অন্তর।

রামের রাজ্যাভিষেক সম্বন্ধে 'অযোধ্যাকাণ্ড '-এর চতুর্থ(৪) সর্গে দশরথ বলেছেন,

অপি চাদ্যাশুভান্ রাম স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব।

সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ॥ ১৭॥

অবষ্টব্ধং চ মে রাম নক্ষত্রং দারুণগ্রহৈঃ।

আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্যাঙ্গারকরাহুভিঃ॥ ১৮॥

তদ্ যাবদেব মে চেতো ন বিমুহ্যতি রাঘব।

তাবদেবাভিষিঞ্চস্ব চলা হি প্রাণিনাং মতিঃ॥২০॥

অদ্য চন্দ্রোঽভ্যুপগমৎ পুষ্যাৎ পূর্বং পুনর্বসুম্।

শ্বঃ পুষ্যযোগং নিয়তং বক্ষ্যন্তে দৈবচিন্তকাঃ॥ ২১॥

অর্থাৎ, আমি নিদ্রাযোগে অশুভ স্বপ্ন সমুদয় দেখছি, যেন দিবসে বজ্রাঘাত ও ঘোররবে উল্কাপাত হচছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্য মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্মনক্ষত্র আক্রমণ করেছে....তুমি রাজ্যভার গ্রহণ করো। এখন পুনর্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হয়েছে। জ্যোর্তিবেত্তারা বলেছেন, চন্দ্রের পুষ্যাভোগ আগামী দিবস অবশ্যই ঘটবে।

উপরিউক্ত গ্রহ ও নক্ষত্রের অবস্থান থেকে পাওয়া যায় যে রামের রাজ্যাভিষেক ৪ই জানুয়ারী ৫০৮৯ খ্রীঃ পূঃ হয়। অর্থাৎ ২৫ বছর বয়সে শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক হবার কথা এবং বনবাসে যাচ্ছেন ২৫ বছর বয়সে।

দণ্ডকারণ্য অরণ্যে বনবাসের সময় গোদাবরী তীরে নাসিকে শূপর্ণখা লক্ষ্মণকে বিবাহ প্রস্তাব দিলে লক্ষ্মণ তার নাক কেটে দেয়। এরপর শূপর্ণখা প্রচণ্ড প্রতিশোধ স্পৃহায় তার ভ্রাতৃদ্বয় খর ও দূষণের কাছে সাহায্যের জন্য ছুটে যায়। এই সময় খর রামকে যুদ্ধে বধ করবে বলে ধাবমান হল। 'অরণ্যকাণ্ড' এর ত্রয়োবিংশ(২৩) সর্গে এই সময়ের বর্ণনা আছে।

শ্যামং রুধিরপর্যন্তং বভূব পরিবেষণম্।

অলাতচক্রপ্রতিমং প্রতিগৃহ্য দিবাকরম্॥৩॥

প্রভিন্নগজসঙ্কাশাস্তোয়শোণিতধারিণঃ।

আকাশং তদনাকাশং চক্রুর্ভীমাম্বুবাহকাঃ॥৭॥

বভূব তিমিরং ঘোরমুদ্ধতং রোমহর্ষণম্।

দিশো বা প্রদিশো বাপি সুব্যক্তং ন চকাশিরে॥৮॥

জগ্রাহ সূর্যং স্বর্ভানুরপর্বণি মহাগ্রহঃ।

প্রবাতি মারুতঃ শীঘ্রং নিষ্প্রভোঽভূদ্ দিবাকরঃ॥১২॥

অর্থাৎ, সূর্যের অত্যন্ত নিকটে শ্যামবর্ণ, আরক্তোপান্ত অঙ্গার চক্রাকার একটি মণ্ডল দৃষ্ট হলো।....মদবর্ষী মাতঙ্গ সদৃশ ভীষণ মেঘে নভোমন্ডল আচ্ছন্ন হয়ে গেল। রোমহর্ষণ ঘোর অন্ধকার বনবিভাগ আবৃত করলো। দিকবিদিক আর কিছুই দৃষ্ট হলো না। অকালে রক্তাদ্রবসন সদৃশ সন্ধ্যা আবির্ভূত হলো.....পরিঘাকার ধূমকেতু সূর্যের সন্নিধানে দৃষ্ট হলো। সূর্য নিষ্প্রভ, পর্বকাল ব্যতীতও রাহু গিয়ে তাকে গ্রাস করলো।

উপর্যুক্ত এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট সূর্যগ্রহণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান মিলিয়ে দেখলে সফটওয়ারে দিনকাল বের হচ্ছে ৭ই অক্টোবর, ৫০৭৭খ্রীঃ পূর্ব অর্থাৎ বারো বছর বনবাস কাটানোর পর এই ঘটনা ঘটে।

বালি বধের সময় যা বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় সেই দিনও সূর্যগ্রহণ ছিল। সফটওয়ারে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান প্রয়োগ করলে দেখা যায় দক্ষিণ ভারতের কিষ্কিন্ধ্যায় ৩রা এপ্রিল ৫০৭৬ খ্রীঃ পূঃ অমাবস্যার দিন সূর্যগ্রহণ ছিল। এবার ঘটনাক্রম দেখলে বোঝা যায় যে শূপর্ণখার সঙ্গে লক্ষ্মণের বিরোধের পরে রাবণ সীতা হরণ করে। এবং সীতাকে উদ্ধারের জন্য রাম দক্ষিণে যাত্রা শুরু করলে বানর রাজ সুগ্রীবের সাথে দেখা হয় যা ছয় সাত মাসের ব্যবধানে হয়েছিল বলে অনায়াসে অনুমান করা যায়।

একইরকমভাবে বিভিন্ন রূপক বর্ণনার থেকে পাওয়া গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান থেকে প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী হনুমানের লঙ্কায় যাবার দিন যদি ১২ই সেপ্টেম্বর ৫০৭৬ খ্রীঃ পূঃ হয়, তবে লঙ্কা থেকে ফিরবার দিন ১৪ই সেপ্টেম্বর ৫০৭৬ খ্রীঃ পূঃ। সীতার সঙ্গে লঙ্কায় অশোকভবনে যখন হনুমানের দেখা হয় তখন চন্দ্রগ্রহণ ছিল। বানরসেনা লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে 'বিজয় মুহূর্ত' সেদিন ছিল ২০শে সেপ্টেম্বর, ৫০৭৬ খ্রীঃ পূঃ। রাবণের লঙ্কায় বানরসেনা পৌঁছায় ১২ই অক্টোবর, ৫০৭৬ খ্রীঃ পূঃ।

যে ঘটনাক্রম আমরা রামায়ণে পেয়েছি, উপরোক্ত দিনকাল যথাযথ মিলে যাচ্ছে। ঠিক এই ক্রম অনুযায়ী দিনকাল প্রত্নজ্যোতির্বিদ্যার গণনার মারফতেও পাওয়া যাচ্ছে। কোথাও কোনরকম অসঙ্গতি, ত্রুটি বা বিচ্যুতি পাওয়া যাচ্ছে না। একটা ঘটনার সঙ্গে আরেকটা ঘটনার সময় অনুসারে ক্রম ও সঙ্গতি এখানে সবথেকে চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ। সময়সারণি ঘটনাক্রম অনুযায়ী হুবহু মিলে যাওয়া নিঃসন্দেহে অভাবনীয়।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

স্বিষ্টকৃৎ আহুতি - মন্ত্রের অর্থ ও মাহাত্ম্য

ওঁ৩ম্ যদস্য কর্মণোঽত্যরীরিচং যদ্বা ন্যূনমিহাকরম্। অগ্নিষ্টৎ স্বিষ্টকৃদ্ বিদ্যাদ্ সর্বং স্বিষ্টং সুহুতং করোতু মে। অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে সুহুতহুতে সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং কামানাং সমর্দ্ধয়িত্রে সর্বান্নঃ কামান্ৎসমর্দ্ধয় স্বাহা। ইদং অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে - ইদং ন মম।

■ শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪।৯।৪।২৪, আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ১।১০।২২, আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র ১।২।৭

অনুবাদ: হে (ওঁ৩ম্) সর্বরক্ষক পরমেশ্বর! (যৎ অস্য কর্মণঃ) এই যজ্ঞকর্মে (অত্যরীরিচম্) কোনো কর্ম মানবীয় ত্রুটির কারণে বেশী করেছি বা করছি, (যদ্ বা ইহ) অথবা এই যজ্ঞকর্মে আমি (ন্যূনং) কোনো কর্ম (অকরম্) কম করেছি বা করছি (তৎ) তা (স্বিষ্টকৃৎ) সুসম্পাদক, সর্ব প্রার্থনাপূর্ণকারী (অগ্নিঃ) সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর তুমি (বিদ্যাৎ) জানো । তুমি (মে) আমার (সর্বং) সর্ব যজ্ঞকর্ম (স্বিষ্টং) সুসম্পাদিত, ভক্তিপূর্ণ এবং (সুহুতং) উত্তমভাবে আহুতি পূর্ণ (করোতু) করো। (স্বিষ্টকৃতে) ভক্তিপূর্ণ এই যজ্ঞের অধ্যক্ষ , (সুহুতহুতে) উত্তমভাবে যজ্ঞাহুতি দিয়ে আমাকে সফলকারী ও সুফলদাতা, (সর্বপ্রায়শ্চিত্তাহুতীনাং)সর্ব প্রায়শ্চিত্ত আহুতির ও (কামানাং) কামনাসমূহের (সমর্দ্ধয়িত্রে) পূর্ণকারী, (অগ্নয়ে) সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের প্রতি (নঃ সর্বান্ কামান্ সমর্দ্ধয়) "তুমি আমাদের সর্ব কামনা পূর্ণ করো" - এই চিন্তা করে আমি(স্বাহা) মন-বচন-শরীরে সত্য ধারণ করে এই আহুতি প্রদান করি। (ইদং) এই আহুতি (স্বিষ্টকৃতে) শুভ মনস্কামনা-পূর্ণকারী (অগ্নয়ে) সর্বজ্ঞ, দোষনিবারক, অজ্ঞাননাশক, জ্ঞানপ্রকাশস্বরূপ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে, (ইদং) এটি (মম ন) আমার নয়।

🔶যজ্ঞ ও তার শুদ্ধতা: এক দর্শন

যজ্ঞের সময় যজ্ঞকারী বা যজমানদের দ্বারা কিছু না কিছু ভুল হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, মানুষ স্বভাবতই সীমিত জ্ঞানসম্পন্ন। উচ্চারণের পার্থক্য প্রত্যেকেরই থাকে, কারণ আদর্শ উচ্চারণ সর্বদাই দুরূহ। মন্ত্রোচ্চারণ, আহুতি প্রদান, কিংবা যজ্ঞের বিভিন্ন বিধিবিধানের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হতেই পারে। অনেক সময় ভুলবশত অধিক

বা স্বল্প আচার পালিত হয়। তবে যজমানদের অন্তরের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—যজ্ঞ যেন সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ ও নির্ভুল হয়।

যজুর্বেদ [২।১৯] যজমানকে এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে—

যজ্ঞস্য শিবে সন্তিষ্ঠস্ব স্বিষ্টে মে সন্তিষ্ঠস্ব

অর্থাৎ, তুমি যজ্ঞকে শুদ্ধ ও কল্যাণময় রাখার জন্য নিরবিচারে চেষ্টা করো।

শতপথ ব্রাহ্মণ[১১।৩।২।৯]এর ব্যাখ্যায় বলেন যে,

যদ্বৈ যজ্ঞস্যান্যূনাতিরিক্তং তৎস্বিষ্টং তেনো তদুভয়ং শময়ত্যেবমু হাস্যৈতেন যজ্ঞেনান্যূনাতিরিক্তেনৈবেষ্টং।

অর্থাৎ, যজ্ঞকে শুদ্ধ ও শুভ রাখতে হলে তা কখনো কম বা বেশি করা যাবে না, বরং যথাযথ বিধি অনুসারে সম্পাদন করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, অগ্নিহোত্র যজ্ঞে "অয়ন্ত ইধ্ম আত্মা" মন্ত্রটি পাঁচবার উচ্চারণ করে প্রতিবারে ঘৃতাহুতি দেওয়ার নিয়ম। যদি ভুলবশত চারবার বা ছয়বার আহুতি দেওয়া হয়, তবে তা যজ্ঞের ত্রুটি বা ন্যূনাধিকতা সৃষ্টি করবে। সুতরাং, যথাযথভাবে নির্ধারিত পাঁচবার আহুতি দেওয়াই যজ্ঞের বিশুদ্ধ রূপ।

মন্ত্র বিশ্লেষণ ও তার তাৎপর্য

মন্ত্রে ব্যবহৃত "অত্যরীরিচম্" এবং "অকরম্" শব্দদ্বয় যথাক্রমে ‘রিচ্’ ও ‘কৃ’ ধাতুর লুঙ্ (অতীতকাল) লকাররূপ। তবে ঐতিহ্যিক বৈদিক সাহিত্য অনুসারে, লুঙ্, লঙ্ ও লিট্ লকার শুধু অতীতকাল নয়, বরং সাধারণ বর্তমান কিংবা ভবিষ্যৎ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ফলে এখানে সাধারণ অর্থে মন্ত্রের তাৎপর্য দাঁড়ায়—

"আমি যা কিছু অধিক বা স্বল্প করেছি কিংবা করবো, অথবা যা আমার দ্বারা হয়ে গেছে—সবই ঈশ্বরের দিব্যজ্ঞানে প্রকাশ্য।"

মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু সেই ভুল থেকে রক্ষা করার জন্য আছেন অগ্রনায়ক, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর। তাঁকে স্মরণ রাখলে যজমান সবসময় সচেতন থাকবেন, ফলে যজ্ঞের ত্রুটি ঘটবে না। একইভাবে, বিদ্বান পুরোহিতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি যজমানকে ভুল থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করেন। তাই এখানে "অগ্নি" শব্দটি উভয়ের প্রতীক হিসেবে ধরা যেতে পারে—একদিকে যজ্ঞের দেবতা, অন্যদিকে জ্ঞান ও শুদ্ধতার রক্ষক।

🔶প্রায়শ্চিত্ত আহুতি ও তার বিধান

যে যজ্ঞে ভুল সংশোধনের বিধান রয়েছে, সেখানে প্রায়শ্চিত্ত আহুতি এই একই মন্ত্র দ্বারা প্রদান করা হয়। তবে সেখানে "দুরিষ্ট" বা "দুর্হত" শব্দের পরিবর্তে ভবিষ্যতে শুদ্ধ যজ্ঞ সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা হিসেবে "স্বিষ্ট" বা "সুহুত" ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের প্রায়শ্চিত্তের জন্য নির্দিষ্ট ব্রত ও অনুষ্ঠান পালন করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে যজ্ঞ নির্ভুল ও পবিত্র হয়।

এইভাবে, যজ্ঞ কেবলই একটি আচার নয়, এটি মানুষের একাগ্রতা, শুদ্ধ চিন্তা ও পরম সত্যের প্রতি অনুগত থাকার সাধনা। সঠিক নিয়মে এবং যথাযথ চেতনায় যজ্ঞ সম্পন্ন করাই তার প্রকৃত সৌন্দর্য।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

বেদে নীহারিকা তত্ত্ব ~ বৈদিক বিজ্ঞান

নীহারিকা (Nebula) হল একটি আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস, ধূলিকণা ও প্লাজমার বিস্তীর্ণ মেঘ, যা সাধারণত মহাবিশ্বে নতুন নক্ষত্র গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটি মূলত হাইড্রোজেন (H), হিলিয়াম (He) এবং উচ্চতর পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট ভারী মৌল (যেমন: কার্বন, অক্সিজেন, সিলিকন) দ্বারা গঠিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, নীহারিকা দুই প্রকারের হয়: আলোকীয় (Luminous Nebulae) ও অলোকীয় (Dark Nebulae)। বেদে সূক্ষ্মভাবে নীহারিকা সম্পর্কে সংকেত প্রদান করা হয়েছে -

শকময়ং ধূমমারাদপশ্যং বিষূবতা পর এনাবরেণ ।

উক্ষাণং পৃশ্নিমপচন্ত বীরাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্ ॥

ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৩

১. আমি বৈজ্ঞানিক- (আরাৎ) অতিদূরে অবস্থিত (শকময়ং) শক্তিশালী (ধূমম্) ধূমের মতো নীহারিকাকে [Nebula] (অপশ্যম্) পর্যবেক্ষণ করছি;

২. (এনা) এই (অবরেণ) তুলনামূলক নিকটবর্তী (বিষুবতা) চতুর্দিকে বিস্তৃত কিংবা গ্রহ-উপগ্রহাদি জ্যোতিষ্ক উৎপাদক পদার্থযুক্ত ধূম তথা নীহারিকা থেকেও (পরঃ) উৎকৃষ্ট বা সূক্ষ্মতর তত্ত্ব [যারা হলো] (বীরাঃ) বিবিধদিকে গতিশীল পদার্থ, [তারা] (উক্ষাণং) সর্ব ভবিতব্য পিণ্ডসমূহের বাহক ও বল সিঞ্চক [এবং তারা] (পৃশ্নিম্) মহান সূর্যকে (অপচন্ত) পরিপক্ক, পরিপুষ্ট এবং অধিক প্রতাপী তৈরি করছে।

৩. (তানি) সেই নানা ধরনের (ধর্মাণি) জগৎ-ধারক বল বা নিয়ম বা তত্ত্ব (প্রথমানি) সৃষ্টির প্রথম থেকেই (আসন্) বিদ্যমান।

নীহারিকার ঘনত্ব অত্যন্ত নিম্ন (প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে কয়েক শত বা হাজার পরমাণু মাত্র), তবে বিশাল পরিসরে বিস্তৃত থাকার কারণে এদের সম্মিলিত ভর উল্লেখযোগ্য হয়। কিছু নীহারিকা নিজের আলো বিকিরণ করে (যেমন বিচ্ছুরণ নীহারিকা, যেখানে গ্যাস আয়নিত হয়ে শক্তিশালী বিকিরণ তৈরি করে), আবার কিছু নীহারিকা শুধুমাত্র অন্যান্য নক্ষত্রের আলো প্রতিফলিত করে (প্রতিফলন নীহারিকা)। নীহারিকার মধ্যবর্তী গ্যাস ও ধূলিকণা মহাকর্ষীয় সংকোচনের ফলে একত্রিত হয়ে ঘন কেন্দ্রীভূত অঞ্চল তৈরি করে, যা ধীরে ধীরে প্রোটোস্টার গঠনের দিকে ধাবিত হয়। পর্যাপ্ত ভর সংগ্রহ করার পর নিউক্লিয়ার ফিউশন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং এটি মূল-ধারা (Main Sequence) নক্ষত্রে পরিণত হয়।

নীহারিকাগুলো মহাবিশ্বের উপাদান চক্রের মূল অংশ, যেখানে পুরোনো নক্ষত্রগুলোর অবশেষ থেকে নতুন নক্ষত্রের জন্ম হয়। এটি মহাবিশ্বের রাসায়নিক বিবর্তনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে তারকার নিউক্লিওসিন্থেসিস। পাশাপাশি মূল মন্ত্রে জগৎ পরিচালনে মহাজাগতিক সূত্র রয়েছে তার বিদ্যমানতা সৃষ্টির শুরু থেকেই রয়েছে বলে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।

বেদ আমাদের বৈজ্ঞানিক বিষয়ে সূত্র প্রদান করে। বেদ কখনোই আমাদের নিকট নিজস্ব পরিশ্রম ও মেধার একক কৃতজ্ঞতা দাবি করে না। কেননা তা বেদেরই অবমাননাস্বরূপ। বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র আমাদের অন্বেষণ, গবেষণা ও বিদ্যা-বিজ্ঞানের উন্নতির প্রেরণা দান করে এবং মানবীয় প্রজ্ঞা ও শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে উৎসাহ

প্রদান করে। বেদে বৈদিক বিজ্ঞানের সূত্র তথা 'বেদ সর্ববিদ্যার গ্রন্থ' এই উদ্‌ঘোষের ব্যাখ্যায় তাই মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছিলেন,

সর্ব বিদ্যার অধিকরণ হলো বেদ অর্থাৎ সর্ববিদ্যার মূল তত্ত্বের দিগ্‌দর্শন মাত্র বেদে রয়েছে।... এখন কেউ যদি বলে 'ঈশ্বর কেন সর্ববিদ্যার মূল তত্ত্বই প্রকাশ করলেন, আদ্যোপান্ত বিদ্যা ও কলার বিবরণ কেন প্রকাশিত করলেন না?', তবে আমি বলবো, যেভাবে ঈশ্বর মানুষের বুদ্ধিগম্য, তেমনি ঈশ্বর মানুষের বুদ্ধির উন্নতিরও সুযোগ রেখেছেন [উপদেশ মঞ্জরী, ৫ম প্রবচন]।

তাই বেদে পরমেশ্বরের প্রেরণা অনুযায়ীই আমরা বলি,

বাজেবাজেবত বাজিনো নো

যজুর্বেদ ২১.১১

হে বিজ্ঞানী! আপনি আমাদের জীবন সংগ্রামে সহায়তা করুন।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্মের ইতিহাস

সারসংক্ষেপ:

বিচিত্রবীর্যের সাথে অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহ হয়। বিয়ের ৭ বছর পর বিচিত্রবীর্য যক্ষ্মারোগে মারা যান। তখন ভীষ্ম সত্যবতীকে বললেন, মাতা, বিচিত্রবীর্যের পত্নীদের গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য আপনি কোনও গুণবান ব্রাহ্মণকে অর্থ দিয়ে নিয়োগ করুন। সত্যবতী হাস্য ক'রে লজ্জিতভাবে নিজের পূর্ব ইতিহাস জানালেন এবং পরিশেষে বললেন, "কন্যাবস্থায় আমার যে পুত্র হয়েছিল তাঁর নাম দ্বৈপায়ন, তিনি মহাযোগী মহর্ষি, চতুর্বেদ শিষ্যদের মধ্যে বিস্তারিত প্রচার ক'রে ব্যাস উপাধি পেয়েছেন; তিনি কৃষ্ণবর্ণ সেজন্য তাঁর অন্য নাম কৃষ্ণ। আমার এই পুত্র জন্মগ্রহণ ক'রেই পিতা পরাশরের সঙ্গে চ'লে যান এবং যাবার সময় আমাকে বলেছিলেন যে, প্রয়োজন হ'লে আমি ডাকলেই তিনি আসবেন। ভীষ্ম, তুমি আর আমি অনুরোধ করলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন।"

ভীষ্ম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলে সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করলেন। ক্ষণকালমধ্যে ব্যাস আবির্ভূত হলেন, সত্যবতী তাঁকে আলিঙ্গন এবং স্তনদুগ্ধে সিক্ত ক'রে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। মাতাকে অভিবাদন করে ব্যাস বললেন, জাপনার অভিলাষ পূরণ করতে এসেছি, কি করতে হবে আদেশ করুন। সত্যবতী তাঁর প্রার্থনা জানালে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে আমি আপনার অভীষ্ট কার্য করব। আমার নির্দেশ অনুসারে দুই রাজ্ঞী এক বৎসর ব্রতপালন ক'রে শুদ্ধ হ'ন, তবে তাঁরা আমার কাছে আসতে পারবেন। সত্যবতী বললেন, অরাজক রাজ্যে বৃষ্টি হয় না, দেবতা প্রসন্ন হন না, অতএব যাতে রানীরা সদ্য গর্ভবতী হন তার ব্যবস্থা কর, সন্তান হলে ভীষ্ম তাদের পালন করবেন। ব্যাস বললেন, যদি এখনই পউত্র উৎপাদন করতে হয় তবে রানীরা যেন আমার কুৎসিত রূপ গন্ধ আর বেশ সহ্য করেন।

সভ্যবতী অনেক প্রবোধ দিয়ে তাঁর পুত্রবধূ অম্বিকাকে কোনও প্রকারে সম্মত ক'রে শয়নগৃহে পাঠালেন। অম্বিকা উত্তম শয্যায় শুয়ে ভীষ্ম এবং অন্যান্য কুরুবংশীয় বীরগণকে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর সেই দীপালোকিত গৃহে ব্যাস প্রবেশ করলেন। তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, দীপ্ত নয়ন ও পিঙ্গল জটা-শ্মশ্রু দেখে অম্বিকা ভয়ে চক্ষু নিমীলিত ক'রে রইলেন। ব্যাস বাইরে এলে সত্যবতী প্রশ্ন করলেন, এর গর্ভে গুণবান রাজপুত্র হবে তো? ব্যাস উত্তর দিলেন, এই পুত্র শতহস্তিতুল্য বলবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং শতপুত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে অন্ধ হবে। সত্যবতী বললেন, অন্ধ ব্যক্তি কুরুকুলের রাজা হবার যোগ্য নয়, তুমি আর একটি পুত্র দাও। সত্যবতীর অনুরোধে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রবধূ অম্বালিকা শয়নগৃহে এলেন কিন্তু ব্যাসের মূর্তি দেখে তিনি ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেলেন। সত্যবতীকে ব্যাস বললেন, এই পুত্র বিক্রমশালী খ্যাতিমান এবং পঞ্চপুত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে গাণ্ডুবর্ণ হবে।

যথাকালে অম্বিকা একটি অন্ধ পুত্র এবং অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণ পুত্র প্রসব করলেন, তাঁদের নাম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। অম্বিকা পুনর্বার ঋতুমতী হ'লে সত্যবতী তাঁকে আর একবার ব্যাসের কাছে যেতে বললেন, কিন্তু মহর্ষির রূপ আর গন্ধ মনে ক'রে অম্বিকা নিজে গেলেন না, অপ্সরার ন্যায় রূপবতী এক দাসীকে পাঠালেন। দাসীর অভ্যর্থনা ও পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যাণী, তুমি আর দাসী হ'য়ে থাকবে না, তোমার গর্ভস্থ পুত্র ধর্মাত্মা ও পরম বুদ্ধিমান হবে। এই দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন।

সন্তান জন্মদানের জন্য বেদব্যাসকে সত্যবতীর আহ্বান

সত্যবতী দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন। ভগবান্ ব্যাস, জননী স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া তৎক্ষণাৎ অবিদিতরূপে [স্বয়ং উদ্বুদ্ধ হইয়া] আবির্ভূত হইলেন। সত্যবতী বহু দিবসের পর পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া যথাবিধি সম্মান ও বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গনপূর্ব্বক স্নেহনিঃসৃত স্তনদুগ্ধ দ্বারা তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন এবং অবিরল-বিগলিত আনন্দসলিলে তদীয় হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। মহর্ষি ব্যাসও দুঃখিত জননীকে নয়নজলে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাতপুরঃসর নিবেদন করিলেন, "ভগবতি! আপনার অভিপ্রেত কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত আমি আসিয়াছি; এক্ষণে অনুমতি করুন, কি প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তদনন্তর পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মহর্ষির যথাবিধি সপর্য্যা [সেবা-পরিচর্য্যা] সমাধান করিলেন। ব্যাসদেব পূজিত হইয়া প্রীতমনে আসনে উপবেশন করিলে সত্যবতী তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, " বৎস! পুত্র, পিতামাতা উভয়েরই সাধারণ ধন; পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র , বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। ভীষ্ম যেমন পিতৃসম্বন্ধে বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ মাতৃসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা। সত্যসন্ধ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিবেন না; অতএব হে অনঘ! ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতেছি; যদি তুমি ভ্রাতার প্রতি অনুকূল ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হইয়া আমাদিগের বংশরক্ষার্থ সেই নিয়োগবাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে অতীব প্রীত হই। রূপযৌবনবতী তোমার ভ্রাতৃ-জায়ারা সাতিশয় পুত্রার্থিনী হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগের গর্ভে অনুরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর।" ব্যাসদেব কহিলেন, "হে প্রাজ্ঞে! তুমি বিশেষরূপে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছ এবং ধর্ম্মের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত অনুরাগ আছে, এই নিমিত্ত তোমার অভিলষিত কার্য্য ধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিয়া আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত হইলাম। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ভ্রাতার ক্ষেত্রে মিত্রাবরুণ [সূর্য ও বরুণ]-সদৃশ পুত্র উৎপাদন করিব। সম্প্রতি

দেবীরা সংবৎসরকাল নিয়মাবর্ত্তী হইয়া আমার নির্দ্দিষ্ট ব্রতোপাসনা করুন। তাহা হইলে তাঁহারা পবিত্র হইতে পারিবেন। ব্রতবিবর্জ্জিতা অপবিত্রা রমণী কদাপি আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না ।"

সত্যবতী কহিলেন, " বৎস! যাহাতে দেবীরা অচিরকালমধ্যে গর্ভবতী হয়েন, এরূপ অনুষ্ঠান কর; কারণ জনপদ অরাজক হইলে প্রজামণ্ডলী অনাথ ও উৎসব হইবে, সুতরাং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্ম্য [ধর্ম্মসম্মত] ক্রিয়াকলাপ বিনষ্ট হইবে। তাহা হইলে যজ্ঞাংশভাগী দেবগণের পরিতৃপ্তি ও পৃথিবীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষণ কিরূপে সম্ভাবিত হইবে? ফলতঃ অরাজক রাজ্যের ভারগ্রহণ করা কাহারও সাধ্য নহে; অতএব হে পুত্র! তুমি অবিলম্বে ইহাদের গর্ভাধান কর । অনন্তর ভীষ্ম তাহার রক্ষণবেক্ষণ করিবেন।" ব্যাসদেব কহিলেন, যদি আপনার পুত্রবধূরা পরম ব্রতস্বরূপ আমার বিরূপতা সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি অকালিক [অল্পসময়ের মধ্যে] পুত্র প্রদান করিব । যদি কৌসল্যা [বিচিত্র্যবীর্য্যের পত্নী অম্বিকার নামান্তর] আমার বিকটমূর্ত্তি, ভয়ানক বেশ ও অসহ্য গন্ধ সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অদ্যই গর্ভবতী হইবেন।" ভগবান ব্যাস সত্যবতীকে এই প্রকার আদেশ দিয়া এবং কৌশল্যা শুচি বস্ত্র পরিধান ও রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্বক শয়নাগারে আমার প্রতিক্ষা করুন, "এই আজ্ঞা করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ।

সূত্র: মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত) ১. আদিপর্ব (কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত) ১০৫. কুরুবংশরক্ষার্থ ব্যাসের আহ্বান

ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর সত্যবতী ঋতুস্নাতা পুত্রবধূকে যথাকালে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "বৎস ! তোমার এক দেবর আছেন, অদ্য নিশীথসময়ে তিনি তোমার নিকট আগমন করিবেন; অতএব তুমি অপ্রমত্তা হইয়া দেবরের আগমনকাল প্রতিক্ষা কর।"

কৌসল্যে দেবরস্তেঽস্তি সোঽদ্য ত্বাঽনুপ্রবেক্ষ্যতি।

অপ্রমত্তা প্রতীক্ষৈনং নিশীথে হ্যাগমিষ্যতি॥

অম্বিকা শ্বশ্রূর নিদেশবর্ত্তিনী হইয়া পরমরমনীয় শয্যায় শয়ন করিয়া ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবদিগকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভগবান্ ব্যাস পূর্ব্বকৃত সত্যপ্রতিপালনার্থ প্রথমতঃ অম্বিকার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন।

ততঃ সুপ্তজনপ্রায়েঽর্ধরাত্রে ভগবানৃষিঃ।

দীপ্যমানেষু দীপেষু শরণং প্রবিবেশ হ॥

তদীয় বাসভবন প্রদীপ্ত দীপ শিখায় আলোকময় ছিল। অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর আকার নিরীক্ষণে ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিলেন। ব্যাসদেব মাতার সন্তোষার্থে তাঁহার সহবাস করিলেন। অম্বিকা ভয়ক্রমে দেবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না।

সম্ভূব তয়া সার্ধং মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।

ভয়াৎকাশিসুতা তং তু নাশক্নোদভিবীক্ষিতুম্॥

অনন্তর দ্বৈপায়নের বহির্গমনসময়ে তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ইনি গুণবান্ পুত্র প্রসব করিবেন? অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাস মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "ইনি অলৌকিক ধীরশক্তিসম্পন্ন, অযুতনাগেন্দ্র

সদৃশ বলবান্, সুবিদ্বান্, মহাবীর্য্য, মহাভাগ পুত্র প্রসব করিবেন এবং সেই মহাত্মার একশত পুত্র হইবে; কিন্তু তিনি স্বয়ং মাতৃদোষে জন্মান্ধ হইবেন।" সত্যবতী পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধন! অন্ধ নৃপতি কুরুবংশের অননুরূপ; অতএব আর একটি পুত্র প্রদান কর, যাঁহার দ্বারা বংশরক্ষা ও রাজ্যের মঙ্গল হইতে পারে।" ব্যাসদেব 'তথাস্তু' বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর অম্বিকা যথাকালে এক অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন।

পাণ্ডুর জন্ম

সত্যবতী পুত্রবধূর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া পূনর্ব্বার ব্যাসদেবকে আহ্বান করিলেন। তিনি পূর্বের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্বক আবির্ভূত হইয়া জননীর নিয়োগক্রমে অম্বালিকার নিকট আগমন করিলেন। রাজমহিষী দ্বৈপায়নের সেই অদৃষ্টপূর্ব ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইলেন।

বিবর্ণা পাণ্ডুসঙ্কাশা সমপদ্যত ভারত।

তাং ভীতাং পাণ্ডুসঙ্কাশাং বিষণ্ণাং প্রেক্ষ্য ভারত॥

সত্যবতী-পুত্র অম্বালিকাকে বিষণ্ণা ও বিবর্ণা দেখিয়া কহিলেন, "ভদ্রে! তুমি আমার বিরূপত্ব সন্দর্শনে পাণ্ডু বর্ণ হইয়াছ, অতএব তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহাত নাম পাণ্ডু হইবে।"

তস্মাদেষ সুতস্তে বৈ পাণ্ডুরেব ভবিষ্যতি।

নাম চাস্যৈতদেবেহ ভবিষ্যতি শুভাননে॥

মহর্ষি এই কথা বলিয়া বহির্গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে সত্যবতী পুত্রবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব কহিলেন, "পুত্রটি পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম পাণ্ডু হইবে।" ইহা শ্রবণ করিয়া সত্যবতী পুনর্ব্বার অপর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি 'তথাস্তু ' বলিয়া মাতাকে আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অম্বালিকা যথাকালে পরমসুন্দর পাণ্ডুবর্ণ এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ পুত্র জন্মে।

সূত্র: মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত) ১. আদিপর্ব (কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত) ১০৬. ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম। পাণ্ডুর জন্ম। বিদুরের জন্ম।

বিদুরের জন্ম

অনন্তর জ্যেষ্ঠা বধূর পুনর্ব্বার ঋতুকালে উপস্থিত হইলে দ্বৈপায়নের সহযোগ করিবার নিমিত্ত সত্যবতী তাঁহাকে আদেশ করিলেন; কিন্তু অম্বিকা ঋষির মূর্ত্তি ও উগ্র গন্ধ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্বশ্রূর আজ্ঞায় সম্মত হইলেন না। অনন্তর তিনি অপ্সরোপমা এক দাসীকে স্বীয় অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন।

নাকরোদ্বচনং দেব্যা ভয়াৎসুরসুতোপমা।

ততঃস্বৈর্ভূষণৈর্দাসীং ভূষয়িত্বাঽপ্সরোপমাম্॥

দাসী ঋষির নিকটগমন ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তদায় আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পরমভক্তি সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

কামোপভোগেন রহস্তস্যাং তুষ্টিমগাদৃষিঃ।

তয়া সহোষিতো রাজন্মহর্ষিঃ সংশিতব্রতঃ॥

মহর্ষি তাঁহার সহযোগে পরম-প্রীত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, "হে শুভে! তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভজাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও পরম-ধার্ম্মিক হইবে।" সেই দাসীগর্ভসম্ভূত দ্বৈপায়নাত্মজ বিদুর নামর বিখ্যাত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা পাণ্ডুর ভ্রাতা।

উত্তিষ্ঠন্নব্রবীদেনামভুজিষ্যা ভবিষ্যসি।

অয়ং চ তে শুভে গর্ভঃ শ্রেয়ানুদরমাগতঃ।

ধর্মাত্মা ভবিতা লোকে সর্ববুদ্ধিমতাং বরঃ॥

স জজ্ঞে বিদুরো নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়নাত্মজঃ।

ধৃতরাষ্ট্রস্য বৈ ভ্রাতা পাণ্ডোশ্চৈব মহাত্মনঃ॥

মহর্ষি দ্বৈপায়ন স্বীয় প্রলম্ভ [প্রবঞ্চনা ছলনাপূর্ব্বক অন্যের স্থানে নিয়োগ] ও শূদ্রার পুত্রজন্ম-বৃত্তান্ত সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অঋণী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

এতে বিচিত্রবীর্যস্য ক্ষেত্রে দ্বৈপায়নাদপি।

জজ্ঞিরে দেবগর্ভাভাঃ কুরুবংশবিবর্ধনাঃ॥

= এইরূপে দ্বৈপায়নের ঔরসে ও বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুরের জন্ম হয় ।

সূত্র: মহাভারত (কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত) ১. আদিপর্ব (কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত) ১০৬. ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম। পাণ্ডুর জন্ম। বিদুরের জন্ম।

জল সিঞ্চনের ৪টি মন্ত্রের অর্থ কী ?

- বিধি: ওঁ৩ম্ অদিতেঽনুমন্যস্ব ॥১॥ এই মন্ত্রে পূর্ব দিকে (দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে)

✅অর্থাৎ, ওঁ৩ম্ তথা আমি পরমেশ্বরের স্মরণ করে বলছি,

হে অখণ্ডনীয় - অজর - অমর পরমাত্মা! তুমি এই যজ্ঞকর্ম অনুমোদন করো।

- বিধি: ওঁ৩ম্ অনুমতেঽনুমন্যস্ব ॥২॥ এই মন্ত্রে পশ্চিম দিকে (দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে)

✅অর্থাৎ, হে ভক্তি অনুকূল মনন-চিন্তন ও বোধবুদ্ধি! তুমিও এই যজ্ঞ কর্মের অনুমোদন করো।

- বিধি: ওঁ৩ম্ সরস্বত্যনুমন্যস্ব ॥৩॥ এই মন্ত্রে উত্তর দিকে (পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে)

✅অর্থাৎ, হে বাণী! তুমিও এই যজ্ঞ কর্মের অনুমোদন করো।

- বিধি: ওঁ৩ম্ দেব সবিতঃ প্র সুব য়জ্ঞং প্র সুব য়জ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচং নঃ স্বদতু ॥৪॥ -এই মন্ত্রে যজ্ঞকুণ্ডের পূর্ব দিক থেকে শুরু করে (ঘড়ির কাটার দিকে) চতুর্দিকে জল সিঞ্চন করবে।

✅অর্থাৎ, হে সর্বপ্রকাশক! সর্বপ্রেরক পরমেশ্বর! যজ্ঞকে উৎসাহিত করো, আমাকে প্রেরণা দান করো - যাতে অত্যুত্তম ফললাভ হয়। দিব্য আত্মার ধারক ও চিন্তাকে পবিত্রকারী পরমাত্মা আমাদের চিন্তাধারাকে পবিত্র করুক। বাণীর অধিপতি পরমেশ্বর আমাদের বাণীকেও মধুর তথা যজ্ঞ কর্মের অনুকূলরূপী করুন।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সনাতন ধর্মে কি মাংস খাওয়ার অনুমতি আছে ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য: সনাতন ধর্ম পরিপূর্ণ জীবনবিধান। আমাদের আচার-ব্যবহার থেকে শুরু করে প্রতিটি বিষয়ই শাস্ত্রানুকূল হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যে শাস্ত্রবিধি না মেনে ইচ্ছা মতো কাজ করে তার ইহকাল ও পরকাল নেই, মুক্তি তো নেই-ই-এমনই ভগবদ্‌বাক্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় [১৬।২৩-২৪] রয়েছে। তাই যারা নামে মাত্র সনাতনী ও শাস্ত্রীয় বিধানের আদর করেন না, বেদ - বৈদিক শাস্ত্র তথা উপনিষদ্-স্মৃতি-গীতা মানে না তারা সযতনে নিবন্ধটি এড়িয়ে যাবেন।

পূর্বসূচনা: আমরা এই নিবন্ধে কোনো শাস্ত্রেই কোনো ধরনের প্রক্ষিপ্ততা আছে কিনা এই বিতর্কে যাইনি। বরং যা আছে সেই অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। সুধীজনের বিবেচনার জন্য উন্মুক্ত সুযোগ বিদ্যমান।

পূর্বপক্ষ: সনাতন ধর্মে মাংসাহার নিষিদ্ধ নয়। মনুস্মৃতিতে [৫।৩৯] বলা হয়েছে যজ্ঞের জন্যই পশুর সৃষ্টি 'যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ'। যজ্ঞ করে উক্ত প্রাণীর হুতাবশেষ আহার করা যায় [৫।৩১]। তাই যদি বলি প্রদান করে কেউ আহার করে তবে তা দোষের নয়।

উত্তরপক্ষ: মনুস্মৃতিতে মাংসাহারের যে বিধি দেওয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে নিম্নরূপ -

১। ৫.৭,২৭,৩১ অনুযায়ী যজ্ঞ করেই মাংসাহারের বিধান দেওয়া হয়েছে। ৩২ শ্লোকে সৌন=কেনা মাংস নিষিদ্ধ করেছেন মেধাতিথি। কেননা কেনা মাংস আহুতির অবশেষ নয়। তাই দোকান থেকে বর্তমান সনাতনীরা যে মাংস কেনেন তা নিষিদ্ধ ও পাপজনক প্রমাণিত। ৫.৩৩ অনুযায়ী বিধিবিহিত অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রাণসংশয় স্থান ছাড়া [৫.২২] মাংসাহার নিষিদ্ধ। অতএব দৈনন্দিন জীবনে সামগ্রিক সকল মাংসাহার পাপজনক প্রমাণিত।

২। ৫.২২,২৭-৩০ যে জীবগণকে অন্ন হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে তাদের মাংসও ২৩ শ্লোক অনুযায়ী যজ্ঞ করেই খেতে হবে 'পুরোডাশা ভক্ষ্যাণাং'। বর্তমানে পুরোডাশরূপহীন মাংসাহার নিষিদ্ধ প্রমাণিত।

৩। ৫.৩১ অনুযায়ী, যজ্ঞের হুতাবশিষ্ট মাংসাহারকে দৈব প্রবৃত্তি ও নিজের জন্য পশুবধ করে মাংসাহারকে 'রাক্ষসের আচার' বলা হয়েছে - রাক্ষসো বিধিরুচ্যতে। ৫.৫২ অনুযায়ী দেবার্চন ও পিতৃলোক অর্চন ব্যতীত নিজের দেহের বৃদ্ধির জন্য মাংসাহার নিষিদ্ধ। অতএব নৈমিত্তিক বিনাবিচারে মাংসাহার পাপজনক প্রমাণিত।

৪। ৫.৪১ অনুযায়ী মধুপর্কে পশুবধ করা যাবে। মধুপর্ক মূলত ঘি-মধু-দধি দিয়ে তৈরি করা হয়। এখানে পশুবধের প্রসঙ্গ আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র [১।২৪।২৬ ও সর্বটীকা] অনুযায়ী গোমাংসের কথা বুঝিয়েছে, যদিও আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের টীকাকারগণ কলিযুগে এই কর্ম নিষিদ্ধ বলেছেন, কিন্তু যদি এই শ্লোক স্বীকার করা হয় তবে প্রমাণিত হয় পূর্বপক্ষ গোমাংসাহার শাস্ত্রসিদ্ধ মানেন। যদি তা স্বীকার না করেন তবে মনুস্মৃতিতে মধুপর্কে মাংসাহারের শ্লোক অপ্রামাণিক স্বীকার করতে হবে। মেধাতিথিও বলেছেন, 'মধুপর্কো ব্যাখ্যাতঃ। তত্র গোবধো বিহিতঃ'। মনুসংহিতার ৩।১১৯ শ্লোকে যে কয়েক প্রকার ব্যক্তিকে মধুপর্ক প্রদান করার বিধি উল্লেখ করেছেন, সেখানেও মেধাতিথি গোবধ সিদ্ধ মেনে বলেছেন— "ইত্যাতিথ্যেষ্টিব্রাহ্মণম্ গোবধো মধুপর্কবিধাবুক্তো গোঘ্নোঽতিথিরিতি পুরুষরাজবিষয়ং দর্শয়তি।" অতঃপর গোমাংস বেদবিরুদ্ধ বলে মধুপর্কে গোমাংসাহার পাপজনক প্রমাণিত।

৫। ৫.৪১ 'এষ্বর্থেষু', ৫.৪৩ 'নাবেদবিহিতাং', ৫.৪৪ 'যা বেদবিহিতা হিংসা' ইত্যাদি স্থানে শাস্ত্রীয়ভাবে যেখানে পশুবধের অনুমিত আছে তা ব্যতীত সর্বত্র পশুবধ নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। তাই প্রাত্যহিক মাংসাহার পাপজনক প্রমাণিত হয়।

প্রসঙ্গত, উক্ত অধ্যায়ে খেতে অনুমতি আছে ও নিষেধ সব প্রাণী (পশু,পাখি) নাম রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এসবেরই গ্রহণযোগ্যতা যজ্ঞাবশিষ্ট হওয়ার পরেই বিহিত তাই আলোচনা করা হলো না।

পূর্বপক্ষ: মনুস্মৃতি [৫.৫৬] ও কুলার্ণব তন্ত্র [১.৬৯] অনুযায়ী অনিষিদ্ধ মাংসভোজনে কোনো দোষ নেই, মদ্যপানেও ক্ষত্রিয়ের কোনো দোষ নেই, বৈধ মৈথুনেও কোনো পাপ নেই এগুলো স্বাভাবিক। তবে নিবৃত্ত হওয়াই মহাফলা। ৫.৪০ মতে, পশুবধ হলে পশুরই উপকার কেননা তারা উচ্চযোনি লাভ করে।

উত্তরপক্ষ: পূর্বে [মনু০ ৫.৩৬,৪৩] আমরা দেখেছি, মাংসাহারের জন্য 'যজ্ঞ বাধ্যতামূলক' এবং যজ্ঞাবশেষ মাংস ব্যতীত সব মাংসাহার অত্যন্ত পাপজনক ও নরকের হেতু। পাশাপাশি দেবকার্য লিখিত হওয়ায় অতিথি ও ভূতযজ্ঞে এই বিধি নেই প্রমাণিত, না বিনিয়োগও দৃষ্ট হয়। এজন্যই মেধাতিথি [সংস্কারো জাতো যন্ন কিঞ্চিন্মাংসমশিতব্যম্ = যেসব মাংস যজ্ঞে অনুমোদিত] ও কুল্লুকভট্ট [যথাধিকারমবিহিতাপ্রতিষিদ্ধভক্ষণাদৌ ন কশ্চিদ্দোষঃ] ৫.৫৬ শ্লোকের টীকায় গণহারে সর্ববিধ মাংসাহারের কথা বলে অনিষিদ্ধ তথা যা যজ্ঞে বধ অনুমোদিত তার কথাই বলেছেন। পাশাপাশি নিবৃত্তিই মহাফলা বলা হয়েছে। অতঃ বর্তমানে যজ্ঞহীন(?) মাংসাহার ও অবিহিত মাংসাহার পাপজনকই প্রমাণিত।

পূর্বপক্ষ: মাংসাহার যজ্ঞের মাধ্যমে করা হলেও মৎস্যাহার বিষয়ে ভগবান মনু [৫।১৬] বলেছেন, পাঠীন = বোয়াল মাছ, রোহিত = রুই মাছ, রাজীব = ডোরাকাটা দাগযুক্ত মাছ, সিংহতুণ্ড = যে মাছের মুখের আকৃতি সিংহের মতো এবং আঁশযুক্ত সব মাছ 'দেব-পিতৃকার্যে' নিবেদনের পর খাওয়া যায়।

উত্তরপক্ষ: যদি সেটিই হয় তবে প্রমাণিত হলো -

১। নৈমিত্তিক মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ, কেননা নৈমিত্তিক কেউই শ্রৌতযজ্ঞ করে মাছ নিবেদন করে না বা শ্রাদ্ধ করেনা।

২। আঁশহীন সব মাছ এবং চিংড়ির ন্যায় যেসব প্রাণী রয়েছে সকলই নিষিদ্ধ।

৩। ঠিক এর আগের শ্লোকে তথা ৫.১৫ অনুযায়ী যে মাছ খায় সব সর্বমাংসভোগী অর্থাৎ তাকে গোমাংসভোজীও বলা যায়। মেধাতিথি বলেন, 'যস্তু মৎস্যাদঃ স সর্বমাংসাশী ভবতি। গোমাংসাদ ইত্যপি ব্যপদেষ্টুং যুক্তঃ'। কুল্লুকভট্ট 'সর্বমাংসভক্ষকত্বেন ব্যপদেষ্টুং যোগ্যঃ তস্মান্মৎস্যান্ন খাদেৎ'। অতঃ প্রাত্যহিক নির্বিচারে মাছ খাওয়াও শাস্ত্রানুযায়ী নিষিদ্ধ ও পাপজনক প্রমাণিত।

উল্লেখ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ [শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১১৫।১১১] অনুযায়ী কলিযুগে অশ্বমেধ, গোমেধ ও শ্রাদ্ধে মাংসাদানাদি নিষিদ্ধ।

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জয়েৎ॥

যদিও স্মৃতি পুরাণের তুলনায় বলবান কিন্তু বাদী অশ্বমেধ ও গোমেধের কলিযুগে অপালনীয় প্রমাণে এই প্রমাণ উদ্ধৃত করেন বিধান এটিও স্বীকৃত যে যেহেতু পিতৃকার্যে নিষিদ্ধ তাই মাছ খাওয়া সর্বৈব পরিত্যাজ্য। অগ্নিপুরাণ [অ০ ১৬৮] অনুযায়ী মুরগীও অনুমোদনহীন, যজ্ঞে আহুতির বিধান তো নেই-ই।

পূর্বপক্ষ: এখন যদি আমি পূর্বোক্ত বিধি অনুযায়ী, বৈদিক যজ্ঞ করে একটি পশু-পাখি বধ করে তার আহুতি দিয়ে আহার করি তবে সেটিই কি অনুমোদিত নয় ? স্মৃতি ও তন্ত্রে উভয়স্থলেই তো বলির উল্লেখ পাওয়া যায়।
উত্তরপক্ষ: না। স্মৃতিগ্রন্থ ও তন্ত্রে পশুবলির ভিন্নতা রয়েছে। স্মৃতিগ্রন্থ যে যজ্ঞের উল্লেখ করে তা শ্রৌতযজ্ঞ। শ্রৌতযজ্ঞে পশুকে শ্বাসরোধ করে বধ করা হয়। এরপর পশুর বপা=মেদ কেটে নিয়ে তা যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হয়। বিস্তারিত-
'শামিত্র' নামে স্থানে পৌঁছে সেখানে উল্মুকটি রেখে আগ্নীধ্র চলে আসেন। শমিতা এক আচ্ছাদিত স্থানে পশুকে শ্বাসরোধ করে বধ করেন। এই কর্মের নাম সংজ্ঞপন। সংজ্ঞপনের পরে 'সংজ্ঞপ্তহোম' ও কতকগুলি প্রায়শ্চিত্তহোম করে দুটি বপাশ্রপণী নিয়ে অধ্বর্যু পশুর কাছে গিয়ে নাভির পাশের যে মেদ বা আমাশয়ের কাছে চামড়ার মতো পাতলা যে বপা তা কেটে নিয়ে একটি বপাশ্রপণীর উপর ঐ বপা ছড়িয়ে রাখেন। অন্য একটি বপাশ্রপণী দিয়ে তা ঢেকে আহবনীয়ে। কাছে এনে ঐ বপাশ্রপণী দুটি প্রতিপ্রস্থাতার হাতে দেন। বপা পাক করে প্লক্ষশাখার উপরে তিনি তা রেখে দেন। আহুতি দেওয়া হয় আহবনীয়েই এবং জুহুরই সাহায্যে। বপাহোমের পরে ঐ অগ্নিতে বপাশ্রপণীদুটি ফেলে দেওয়া হয়। এর পর সকলে চাত্বালে গিয়ে হাত ধুয়ে নেন। তার পর হয় পশুপুরোডাশযাগ। যে দেবতার উদ্দেশে পশুর অঙ্গগুলি আহুতি দেওয়া হবে সেই দেবতারই উদ্দেশে এই পুরোডাশযাগ করতে হয়। পুরোডাশের জন্য যখন নির্বাপ করা হয় তখন পশুর অঙ্গ-গুলি ছুরি (স্বধিতি) দিয়ে কেটে নিয়ে একটি মাটির পাত্রে রেখে শামিত্র অগ্নিতে তা পাক করতে হয়। একদিকে শামিত্র অগ্নিতে পাক চলত থাকে, আর অপর দিকে আহবনীয়ে পুরোডাশের আহুতিও চলতে থাকে। হৃৎপিণ্ড অবশ্য সিদ্ধ করা হয় না, একটি শূলে রেখে সেঁকা হয়। পুরোডাশযাগের যে ইড়া তা প্রতিপ্রস্থাতা ছাড়া যজমানসমেত অপর সকলেই ভক্ষণ করবেন।
সূত্র: আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র [১ম কণ্ডিকা ৭ম প্রশ্ন] , আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র [৩।৪-৫, ১২।৯]
আপনি কি প্রত্যহ এভাবে শ্রৌতযাগ করেন বা করবেন ? না। প্রত্যক গৃহস্থ গৃহ্যসূত্র অনুযায়ী "পঞ্চমহাযজ্ঞ" করে যাতে পশুর আহুতির কোনো বিধানই নেই [যাগ ব্যতিক্রম ব্যতীত, আশ্ব০ গৃ০ ২।৩-৪ ইত্যাদি]। তাই আপনার আহারও অসম্ভব।
কিন্তু, তন্ত্রে বা শাক্তপূজায় বলির বিধান সম্পূর্ণ ভিন্ন। কালিকাপুরাণে অধ্যায় ৫৫, ৬৭-তে ~
১. বলির অস্ত্রকে অভিমন্ত্রিত করতে হবে, বলিদানে যেসব অস্ত্রবিহিত তার বাইরের অস্ত্র দিয়ে বলি দিলে দেবী তা গ্রহণ করেন না ও বলিদানকর্তার মৃত্যু হয়।
২. স্ত্রী পশু-পাখি, ত্রুটিযুক্ত পশু, শারীরিক বিকলাঙ্গ কিংবা বিকৃতাঙ্গ পশু বলিযোগ্য নয়।
৩. ৩ মাসের কম বয়সের পশু ও ৩ সপ্তাহের কম বয়সী পাখি বলি দেওয়া যাবে না।

৪. বলির পশু যুবা, রোগশূন্য, শিংযুক্ত, হৃষ্টপুষ্ট, অঙ্গদোষহীন হবে। যদি পশু শিশু অর্থাৎ কমবয়সী হয় তবে বলিদাতার পুত্র মারা যাবে, অধিকাঙ্গী হলে বংশ নাশ, হীনাঙ্গী হলে পরিবার নাশ হবে ইত্যাদি [ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রকৃতিখণ্ড ৬৪।৯৬-৯৯]।

৫. বিষ্ণুক্রান্তার নিবন্ধ তন্ত্রানুযায়ী এক কোপেই পশুবলি দিতে হবে [যদ্যপ্যেকেন ঘাতেন বলিচ্ছেদো ন জায়তে... এক খড়্গ প্রহারেণ পশুর্যত্র ন হন্যতে তদা বিঘ্নং...], নতুবা নানা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু শ্রৌতযাগে আমরা পাচ্ছি শ্বাসরোধ করে বপা সংগ্রহ। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভিত্তিই আলাদা।

পূর্বপক্ষ: মনুস্মৃতির ২য় অধ্যায়ের প্রারম্ভে টীকায় কুল্লুকভট্ট বলেছেন, শ্রুতি দুই ধরনের - তান্ত্রিক ও বৈদিক 'বৈদিকী তান্ত্রিকীশ্চৈব দ্বিবিধা শ্রুতিকীর্তিতাঃ'। আমি তন্ত্র অনুযায়ী করবো।

উত্তরপক্ষ: মাংস-সাধনায় কোন কোন জন্তুর মাংস প্রশস্ত -

১। যোগিনীতন্ত্র অনুযায়ী, যেসব প্রাণীর মাংস গ্রহণীয় তারা ভূচর ও খেচর-ভেদে দ্বিবিধ। আবার ভূচর পশু বনজ ও গ্রামজ-ভেদে দ্বিবিধ। প্রশস্ত ভূচর পশু দশটি। তার মধ্যে ছাগ আর মেষ গ্রামজ। আর বরাহ, শল্যক অর্থাৎ শজারু, রোজ, রুরু, হরিণ, খঙ্গী, গোধা এবং শশক বন্য। রুগ্ন ও মৃত পশু বর্জনীয়। কোমল সর্বাঙ্গপুষ্ট প্রাণী সর্বোত্তম। প্রশস্ত খেচরও দশটি, যথা-গ্রাম্য কুক্কুট, আরণ্য কুক্কুট, ময়ূর, তিতির, চক্রবাক, সারস, রাজহংস, জলকুক্কুট, হংস ও চটক।

সূত্র: পরশুরামকল্পসূত্র বৃত্তি ১০।৬২

২। মহামাংস কী ? শ্যামারহস্যে [৩য় পরিচ্ছেদ] উদ্ধৃত যামলবচনে গো, নর, ইভ, অশ্ব, মহিষ, বরাহ, অজ এবং মৃগের মাংসকে মহামাংস বলা হয়েছে। আর এই অষ্ট মহামাংসকে দেবতার প্রীতিকর বলা হয়েছে। বৃহৎতন্ত্রসার-ধৃত ভৈরব-তন্ত্রবচনেও এই অষ্ট মহামাংসের উল্লেখ আছে, তবে ইভের স্থলে মেষের নাম করা হয়েছে।

৩।।কাঁটাশূন্য, তৈলাক্ত এবং স্বাদু—এই চার রকমের মাছ মধ্যম। মধ্যম মাছ দেবীর প্রীতিকর [শ্যামরহস্য পরি০ ৩] । উত্তম ব্যক্তিরা বলেন, মৎস্য ক্ষুদ্র হলেই অধম। মহানির্বাণতন্ত্রের [৬।৮] মতে, অধম মৎস্য বহু কণ্টকযুক্ত তবে উত্তমরূপে ভাজা হলে তাও দেবীকে প্রদান করা যায়। কচ্ছপও এর অন্তর্ভুক্ত পরশুরাম কল্পসূত্রবৃত্তি [১০।৬৩] অনুযায়ী।

মহানির্বাণ তন্ত্র [৯.২৮৩] অনুযায়ী, মনুস্মৃতির অনুকরণেই বলা হয়েছে যদিও মাংস-মাছ বিহিত কিন্ত সেগুলোকে নিয়ম অনুযায়ী পূজায় দিয়ে অর্থাৎ দেবীকে ভোগ দিয়ে তারপর খেতে হবে। একই কথা শ্রীমদ্ভাগবতের [১১।৫।১১] শ্রীধর স্বামীর টীকাতেও আছে, 'হুতশেষং ভক্ষয়েৎ'-যজ্ঞাবশিষ্ট আমিষ ভক্ষণ করবে.. যজ্ঞাবশেষ মাংস ভিন্ন অন্য মাংস আহার করবে না।

পরশুরাম কল্পসূত্র [১০.৬৩] অনুযায়ী, সাধক (যে কোনো সাধারণ মানুষ নয়) মাছ-মাংস খাবেন, কিন্তু নিজে বধ করবেন না, অন্য কেউ করে দিবে। যদি কাউকে না পান নিজেই আগে পূজায় বধ করে তারপর নিবেদন করে খাবেন। মন্ত্রপাঠ করে সংস্কার করে নিতে হবে। মাছ খাওয়ার পূর্বেও মন্ত্রপাঠ করে মাছের প্রাণনাশ করতে হবে [প০ ক০ সূ০ ১০।৬৩, রামেশ্বরবৃত্তি]। অত্যন্ত কৌতুহলজনক বিষয়, মাছের শোধনে মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রের বিনিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

পূর্বপক্ষ: তাহলে এভাবেই তো আমরা মাংস-মৎস্যাহার করতে পারি। স্মার্তশাস্ত্রাদির কী আবশ্যকতা এই কলিযুগে।
উত্তরপক্ষ: বাদীপক্ষের উচিত তারা কোন শাস্ত্র প্রামাণিক মনে করেন তা ঘোষণা করা। যদি বৈদিক শাস্ত্র মানেন, তবে তন্ত্রের কী আবশ্যকতা ? যদি তন্ত্র মানেন কলিতে তবে অহেতুক বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রমাণ প্রদর্শন কেন ? [যেহেতু তন্ত্র ও বেদ ভিন্ন পথ] আর যদি দুটোই মানেন তবুও আপনাকে একটি পথই বেছে নিতে হবে। এটা আপনার আচার্যদেরই সিদ্ধান্ত। মিশ্রিত ধারা গ্রহণ করলেও সুনির্দিষ্টভাবে আচরণ করতে হবে নিজ সম্প্রদায় অনুযায়ী দীক্ষিত হয়েই। যদি অদীক্ষিত হয়ে থাকেন তবে এই বিষয়ে আপনার অনধিকার চর্চা না করাই উত্তম।

পূর্বপক্ষ: তন্ত্রানুযায়ী আহার কি সর্বজনীন নয়?
উত্তরপক্ষ: তন্ত্র অনুযায়ী অবশ্যই তা সর্বজনীন। তবে-
১. যদি তন্ত্রানুসারী ও দীক্ষিত না হন তবেও এই আচার আপনার জন্য পাপজনক ও আপনি এই প্রচার করতে পারেন না যে 'এভাবে বিহিত আছে বলে আহার করি'।
২. যেহেতু পঞ্চতত্ত্ব অনুযায়ীই দেবীপূজা বিহিত [কামাখ্যাতন্ত্র ৬।১৫] ও সেই নিয়মানুসারেই তত্ত্বগ্রহণ করতে হয় তাই যথেচ্ছাচার এখানেও অনুমোদিত নয়।

পূর্বপক্ষ: তাহলে দীক্ষিত হয়ে আহার করলেই হবে।
উত্তরপক্ষ: হ্যাঁ করতে পারেন। যদি সেটা করে মদ্যাদি-মাংসাহার করেন সেটা ব্যক্তিগত। কিন্তু আমাদের আলোচ্য সনাতন ধর্ম তা সমর্থন করে কিনা? যেহেতু আপনি বেদকে নিষ্ফল বলেছেন ইতোমধ্যেই আপনি সনাতন ব্যতীত ভিন্নমতে রয়েছেন। অধিকন্তু যদি দীক্ষিতের প্রশ্ন তোলেন, তবে দরকার দুইটি বিষয় - গুরু ও শিষ্য। তা যথাবিধি শাস্ত্রানুযায়ী আপনি হবেন। এখানে মূল বিষয় - রুদ্রযামলতন্ত্র [উ০প০ ৩], গৌতমীয় তন্ত্র [৫], মৎস্যসূক্ত, বৃহৎ তন্ত্রসার, শারদাতিলক তন্ত্র [৪।১] রাঘবভট্টকৃত টীকা ইত্যাদি অনুযায়ী অদীক্ষিতদের পূজার্চনায় অধিকার নেই। তাই যত্রতত্র মাংস-মাছ কিনে পূজায় ভোগ ও মন্ত্রপাঠ করলে হবে না।
অর্থাৎ, আপনি যদি তন্ত্রানুসারী হয়ে বা মাতৃভক্ত হয়ে মাংস-মাছ খেতে চান তবে আপনাকে স্পষ্টভাষায় বলতে হবে আপনি বেদানুযায়ী বিধান মানেন না এবং কেবল নামেমাত্র শাক্ত না বরং তন্ত্র অনুযায়ী পূর্ণ দীক্ষিত হয়ে সর্ব-আচার পালন করে আহার গ্রহণ করছেন। নতুবা আপনার বক্তব্য ও যুক্তি উভয়ই ব্যর্থ।

সারসংক্ষেপ:

১। যদি আপনি নামে মাত্র হিন্দু হন এবং ভাবেন যে "ধর্ম কেবল খাবার ও রান্নাঘরে সীমাবদ্ধ কিনা" তাহলে আপনি ভ্রান্ত। ধর্ম যেভাবে মানবের নৈতিকতা শেখায় তেমনি সকল প্রাণীর প্রতিই কর্তব্য শেখায়। যদি আধুনিকতার বলে শাস্ত্রবিধান অগ্রাহ্য করেন তবে সেই অগ্রাহ্য বিবাহসংস্কার ব্যতীত যৌনসমাগমের সাথেই তুল্য, মানতে হলে সবটুকুই যথাসম্ভব মানতে কিংবা অন্তত স্বীকার করতে হবে। কেননা যে শাস্ত্র এক ক্ষেত্রে মানে কিন্তু স্বেচ্ছাচারী হয়ে নিজের প্রতিকূল ক্ষেত্রে অস্বীকার করে সে দ্বিচারিতা করে।
২। যদি আপনি শাস্ত্রে শ্রদ্ধাশীল সনাতনী হন তবে প্রশ্ন -

(১) আপনি কি তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ও সর্বাচার পালন করেন? যদি না করেন তবে তন্ত্রের বলি নিয়ে আপনার কী আসে যায়? কেননা আপনি যে বর্ণেরই হোন না কেন দীক্ষিত ও সাধক না হয়ে খেয়ে পাপই করছেন।

(২) আপনি কি বেদবিধি স্বীকার করে মাংসাহার প্রতিপন্ন করতে চান? আপনি পশুকে শ্বাসরোধ করেন না তাহলে কীভাবে তা শ্রৌতযাগের অনুমোদিত হলো ও আপনি খেলেন? এখানেও পাপই করছেন।

(৩) চিংড়ি কি মাছ? এর অনুমতি যেহেতু শাস্ত্রে নেই তা বিহিত কীভাবে ? মুরগী যা খাচ্ছেন যেভাবেই তা তো দেবীকে দিচ্ছেন না বা মুরগীমেধ বলেও হয়না কিছু, এখানে শাস্ত্রীয়তা দেখাচ্ছেন না কেন ?

(৪) খাসি হলো কৃত্রিমভাবে অণ্ডকোষহীন ছাগ। ত্রুটিপূর্ণ পশু বলির যোগ্যই না। তাহলে যে পশু বলির যোগ্যও না তা আহার করছেন কীভাবে?

(৫) ডিম কি কোনো যজ্ঞে বা পূজায় হোক তা তান্ত্রিক বা বৈদিক দেওয়া হয় ? তাহলে তা বিহিত কীভাবে?

(৬) পশুবলি যদি আপনার নিকট আদরণীয় হয় তবে নিজে পশুবধ করলে তা অহিংসা-অবধ আর অন্য মতের কেউ পশুবধ করলে মানবতাবাদী হন ও সাময়িক পশুপ্রেম জেগে উঠে কেন? এটা কি দ্বিচারিতা ও ভণ্ডামি নয়?

পরিশেষে, যদি আপনি শাস্ত্র না মানতে পারেন ও সেজন্য মাংসাহারী হন তবে তা দুঃখজনক তবে আমরা আশা করব আপনি ধর্মানুসরণ করবেন, কিন্তু কখনোই শাস্ত্রকে নিজের অক্ষমতা ঢাকতে ব্যবহার করা যাবে না। আপনার যদি মনে হয় আপনি শাস্ত্র না মেনে খাবেন আপনার ইচ্ছা সেটা - স্বাধীনতা, বরং মানতে অপারগ হলে তা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তা করে আপনি বৈদিক (?) বা তান্ত্রিক (কু-)যুক্তি প্রদর্শন করলে তা আপনার জন্যেই হানিকারক হবে।

[সতর্কতা: বৈদিক শাস্ত্রে পশুবলি আদি নেই, হয় তা কদর্থ বা প্রক্ষিপ্ত ~ বেদবিরুদ্ধ হওয়ায় অমান্য। তবে যেহেতু এটি সর্বজনীন নিবন্ধ তাই সেই বিষয়টি না ধরেই আলোচনা করা হয়েছে]

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

গোমূত্র ও গোবর তত্ত্ব : বৈদিক ও অবৈদিক গ্রন্থের আলোকে

সনাতন ধর্মে গোরুর মাহাত্ম্য নানাভাবে নানা শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও গো মাত্রেই পশুবাচক শব্দ, তারপরেও গোরু অর্থই সব থেকে বেশি প্রচলিত। একটি খুবই আলোচিত প্রশ্ন হলো, সনাতন ধর্মে গোমূত্র বা গোময় [গোবর] সম্পর্কে কী বলা হয়েছে ?

গোমূত্র ও গোময় তথা গোবরের বিষয়ে চতুর্বেদের ২০৩৭৯ মন্ত্রে সরাসরি কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, গোরুর প্রভূত উপকারিতা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা অবশ্যই করা হয়েছে, তবে সুনির্দিষ্টভাবে এই দুটি উপাদান সম্পর্কে পৃথক কোনো আদেশ নেই। যদিও কতিপয় ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাতে গোরু থেকে প্রাপ্ত উপাদানের সূচিতে গোমূত্র বা গোবর দৃষ্ট হলেও তা সরাসরি বৈদিক আদেশ নয় বিধায় আদরণীয় নয়, পাশাপাশি বেদে গোদুগ্ধেরই 'গব্য' হিসেবে উদাহরণ পাওয়া যায়, গোমূত্র বা গোবর নয়।

স্মার্তগ্রন্থের মধ্যে মনুস্মৃতিতে গোমূত্র পানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে তা কেবলই প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে। স্বাভাবিকভাবে প্রায়শ্চিত্ত পাপকর্মের জন্যই করা হয়। সুতরাং তাতে যে অস্বাভাবিক উপাদান থাকবে এটিই

স্বাভাবিক। কেননা দণ্ড মাত্রেই ভয়াবহ। উদাহরণ - মনুস্মৃতির ১১।২১৩ তে বর্ণিত অংশটি মূলত সান্তপনকৃচ্ছ্রব্রত - প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ । যা পুণ্যলাভের আশায় নয় বরং পূর্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ করা হয়।

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্ । একবাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্ ॥

[মনুস্মৃতি ১১।২১৩]

অনুবাদঃ- গোমূত্র, গোবর, দুধ, দই, ঘি এবং কুশোদক- এগুলি মিশিয়ে একদিন খেয়ে থাকতে হবে[সেদিন অন্য কিছু খাওয়া চলবে না] এবং পরের দিন উপবাস করতে হবে। স্মৃতিমধ্যে এই ব্রতকেই সান্তপনকৃচ্ছ্র নামে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সুরাপানের প্রায়শ্চিত্তে আছে,

গোমূত্রমগ্নিবর্ণং বা পিবেদুদকমেব বা।

পয়ো ঘৃতং বা মরণাদ্ গোশকৃদ্রসমেব বা ॥

[মনুস্মৃতি ১১।৯২]

অনুবাদ: অগ্নির মতো উত্তপ্ত গোমূত্র, জল, দুধ, ঘি, কিংবা গোময়জল ততক্ষণ ধরে পান করতে থাকবে, যতক্ষণ না মরণ হয়।

সুতরাং, মনুস্মৃতির উক্ত শ্লোকে আমরা পুণ্যার্থে গোমূত্রপান নয় বরং কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তরূপ কৃত্য দেখতে পাই। প্রসঙ্গত এই একই বিধান কূর্মপূরাণ উপরিভাগ ৩২।২ ও গরুড় পুরাণ ১।৫২।৮-তেও পাই। এমন অনেক প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপার গৌণ স্মৃতি ও পুরাণে দৃষ্ট হয়। তবে এগুলোকে মূল স্মৃতিতে পুণ্যফলবাচক বলা হয়নি কিংবা প্রোৎসাহিত করা হয়নি বলে উল্লেখ করা হলো না।

মনুস্মৃতি ৫।১২২-১২৪, ভাগবত ৭।১১।২৬, মহাভারত ১৩।১৪৬, বিষ্ণু স্মৃতি ২৩।৫৬-৫৭, পরাশর স্মৃতি ৬।৪৭-তে গৃহভূমি, শিবপুরাণ রুদ্রসংহিতা সৃষ্টিখণ্ড ১৩।১৮-তে শিবপূজনের স্থান, গোময় দ্বারা লেপনের নির্দেশ রয়েছে। গ্রামীণ বাংলায় অদ্যাবধি এই সংস্কার প্রচলিত। বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১।৫।৮।৫২, বিষ্ণুস্মৃতি ২২।৮৭ গোময়কে শুদ্ধিকারক উপাদান হিসেবে পরিগণিত করে।

■ পঞ্চগব্য কী?

যদিও আমরা ভাবি যে কোনো গোরু থেকেই ৫ প্রকার দ্রব্য নিলেই পঞ্চগব্য হবে, তবে গৌণস্মৃতিতে গোরু কেমন হবে ও কতটা পরিমাণে নিতে হবে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে। যেমন,

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকম্।

নিরদ্দিষ্টং পঞ্চগব্যন্তুপবিত্রং পাপনশনম্ ॥

গোমূত্রং কৃষ্ণবর্ণায়াঃ শ্বেতায়া গোময়ং হরেৎ।

পয়শ্চ তাম্রবর্ণায়া রক্তায়া দধি চোচ্যতে ॥

কপিলায়া ঘৃতং গ্রাহ্যং সর্বং কাপিলমেব বা।

গোমূত্রস্য পলং দদ্যাদ্দধ্নস্ত্রিপলমুচ্যতে ॥

আজ্যস্যৈকপলং দদ্যাদঙ্গুষ্ঠার্দ্ধন্তু গোময়ম্।

ক্ষীরং সপ্তপলং দদ্যাৎ পলমেকং কুশোদকম্ ॥

পরাশর স্মৃতি ১১।২৭-২৯

অর্থাৎ, গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশজল-ইহাই ব্রহ্মকুর্চ্চ বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, এই পঞ্চগব্য পবিত্রতাজনক ও পাপনাশকারক। কৃষ্ণবর্ণ গাভীর গোমূত্র ও শ্বেতবর্ণ গাভীর গোময় গ্রহণ করিবে, তাম্রবর্ণ গাভীর দুগ্ধ লইবে এবং রক্তবর্ণ গাভীর দধি লইতে হইবে। কপিলবর্ণ গাভীর ঘৃত গ্রহণ করিবে। তবে যদি এই পাঁচ বর্ণের গাভী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কপিলা হইতেই সমস্ত সংগ্রহ করিবে। গোমূত্র এক পল লইবে, দধি তিন পল লইবে, ঘৃত এক পল লইবে, গোময় অর্দ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত লইবে, দুগ্ধ সপ্ত পল লইবে, আর কুশোদক এক পল লইবে। সমতুল্য তথ্য গরুড়পুরাণের পূর্বখণ্ডের ২২২ অধ্যায়েও দৃষ্ট হয়।

কালিকা পুরাণের ৬৩ তম অধ্যায়ের ১৫ নং শ্লোকে,

মধুক্ষীরাজ্যদধিভির্গোমূত্রৈর্গোময়ৈস্তথা।

রত্নোদকৈঃ শর্করাভির্গুড়রত্নকুশোদকৈঃ॥

অর্থাৎ, "পূজক- মধু, ক্ষীর, দধি,গোমূত্র,গোময়,রত্নোদক,শর্করা, গুড়, রত্ন এবং কুশোদক দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে প্রথমে দেবীকে স্নান করাবে।" এরূপ বলা আছে।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উত্তরখণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে-

গবাং মূত্রং পুরীষঞ্চ পবিত্রং পরমং মতম্ ॥৩৬॥ ক্ষীরং দধি ঘৃতঞ্চৈব ভোজনে হ্যমৃতোপমম্। এতৈর্বিনা ভোজনঞ্চ বৃথাভোজনমিষ্যতে॥৩৭॥ বিশেষতো ব্রাহ্মণস্তু নাগব্যং ভোজনঞ্চরেৎ। উপেক্ষ্যং সর্ব্বমেব স্যান্ন তু গব্যং কদাচন ॥৩৮॥ গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিস্তথোত্তমম্ । পঞ্চগব্যমিদং প্রোক্তং স্নানীয়ং সর্ব্বদৈবতৈঃ ॥৩৯॥

অর্থাৎ, গোমূত্র ও গোবর পরম পবিত্র। দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত ভোজনে অমৃত তুল্য , এই সব ছাড়া ভোজন বৃথা ভোজন মধ্যে গণ্য।বিশেষত ব্রাহ্মণ গব্য ছাড়া ভোজন করবে না। অন্য দ্রব্য উপেক্ষা করতে পারে কিন্তু কখনো গব্য উপেক্ষা করবে না। গোমূত্র, গোবর, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই কয়েকটিকে পঞ্চগব্য বলে। এগুলো সকল দেবতার স্নানীয় দ্রব্য। [অর্থাৎ, দেব প্রতিমার স্নানে গোমূত্র ও গোবর ব্যবহার করা হবে]

কালিকা পুরাণের ৫৯ তম অধ্যায়ের ৮২ নং শ্লোকে বলা হয়েছে ,

পবিত্রং মূর্দ্ধ্নি চৈকৈকং দদ্যাদেভ্যঃ সমাহিতঃ।

পঞ্চগব্যচরুং কৃত্বা দেব্যৈ দত্ত্বাহুতিত্রয়ম্॥

তেনৈব বিষ্ণবে দত্ত্বা শম্ভবে চ যথাবিধি।

আজ্যৈরষ্টোত্তরশতং তিলৈরাজ্যৈস্তথৈব চ॥

অর্থাৎ, পঞ্চগব্য চরু নির্মাণ করে, তার দ্বারা তিনবার দেবীর হবন করে তথাবিধি বিষ্ণু ও শম্ভুর হবন করবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে [১০.৬.১৯-২১] ও অগ্নিপুরাণে [২৯৯.১৯-২৩] শ্রীকৃষ্ণকে গোমূত্র দিয়ে স্নানের ও গোবরের তিলক দানের উল্লেখ পাওয়া যায়, রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষার জন্য ~ গোপীগণ সহ মা যশোদা এবং রোহিণী গোপুচ্ছ ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন থেকে শিশু শ্রীকৃষ্ণের সম্যকভাবে রক্ষা বিধান করেছিলেন। শিশুটিকে গোমূত্র দ্বারা স্নান করিয়ে গোধুলি লিপ্ত করা হয়েছিল। তারপর গোময় দ্বারা ললাট আদি দ্বাদশ অঙ্গে ভগবানের বিভিন্ন নাম লিখে তিলক অঙ্কন করা হয়েছিল। এইভাবে শিশুটির রক্ষা বিধান করা হয়েছিল। [শ্রীল প্রভুপাদের অনুবাদ]

শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত [৮।৮।১১] তাৎপর্যে লিখেছেন,

সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানে পঞ্চগব্য, অর্থাৎ গাভী থেকে প্রাপ্ত পাঁচটি পদার্থ দুধ, দধি, ঘি, গোময় এবং গোমূত্রের আবশ্যকতা হয়। গোমূত্র এবং গোময় পবিত্র।

বরাহপুরাণ [২০৬.২৮] মতে, পঞ্চগব্য তথা গোমূত্র-গোবরসহ পানে বাজিমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

পঞ্চগব্যেন পীতেন বাজিমেধফলং লভেৎ ।

গব্যং তু পরমং মেধ্যং গব্যাদন্যন্ন বিদ্যতে ॥

কূর্মপুরাণের [উপরিভাগ ৩৩।৩৭-৩৮] মতে, ব্রাহ্মণ যদি চণ্ডালের কূপ থেকে বা তার স্পর্শ করা জল পান করে তবে পঞ্চগব্য তথা গোমূত্র, গোময়াদি ৩ রাত্রি পান করবে।

চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু যদি জ্ঞানাৎ পিবেজ্জলম্ ।

চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং ব্রাহ্মণঃ পাপশোধনম্ ॥

চাণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টং পীত্বা বারি দ্বিজোত্তমঃ ।

ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধ্যেত পঞ্চগব্যেন চৈব হি ॥

- পঞ্চগব্য তথা গোমূত্র, গোময়াদি দ্বারা দেবপ্রতিমা শুদ্ধিকরণ

পঞ্চগব্যকষায়েণ মৃদ্ভির্ভস্মোদকেন বা।

শৌচং তত্র প্রকুর্বীত বেদমন্ত্র চতুষ্টয়াৎ ॥

মৎস্য পুরাণ ২৬৫।৮

অর্থাৎ, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে ৪টি মন্ত্রে পঞ্চগব্য দ্বারা পবিত্র করাতে হবে।

একই বিধান নিম্নলিখিত স্থানেও দৃষ্ট হয়, শিব পুরাণ বায়ব্যসংহিতা ১।৩৩।৩১-৩২

প্রতিষ্ঠাপ্য বিধানেন তল্লিঙ্গং কৃতশোধনম্ ॥

পরিকল্প্যাসনং মূর্তিং পঞ্চবক্ত্রপ্রকারতঃ ॥

পঞ্চগব্যাদিভিঃ পূর্ণৈর্যথাবিভবসম্ভৃতৈঃ ॥

শিব পুরাণ বিদ্যেশ্বর সংহিতা ১৬।১১১-১২ অনুযায়ী, রবিবারে পঞ্চগব্য দ্বারা করা লিঙ্গের অভিষেক বিশেষ মহত্বপূর্ণ।

আদিবারে পঞ্চগব্যৈরভিষেকো বিশিষ্যতে ।

গোময়ং গোজলং ক্ষীরং দধ্যাজ্যং পঞ্চগব্যকম্॥

অগ্নি পুরাণ ৯১।১ অনুযায়ী, পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান পূর্বক শিব, বিষ্ণু, সূর্যাদি দেবতার পূজা করা উচিত।

অভিষিক্তঃ শিবং বিষ্ণুং পূজয়েদ্ভাস্করাদিকান্।

শঙ্খভের্য্যাদিনির্ঘাষৈঃ স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যকে ॥

অগ্নিপুরাণ ৬০।৬-৭ অনুযায়ী, বাসুদেবাদি প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিমাকে পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ করে তারপর কুশের জল ও তীর্থের জল দিয়ে স্নান করাতে হবে।

রত্ননাসবিধিং কৃত্বা প্রতিমামালভেদ্গুরুঃ।

সশলাকৈর্দ্দর্ভপুঞ্জৈঃ সহদেবৈঃ সমন্বিতৈঃ ॥

সবাহ্যন্তৈশ্চ সংস্কৃত্য পঞ্চগব্যেন শোধয়েৎ।

প্রোক্ষয়েদ্দর্ভতোয়েন নদীতীর্থোদকেন চ ॥

অধুনা সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যকৃত পুরোহিত দর্পণেও, দোলযাত্রায় নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্বক দেববিগ্রহ স্নানের নির্দেশ বিদ্যমান,

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।

চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমা বহ ॥

পঞ্চগব্য (গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এবং কুশোদক) দ্বারা তত্তৎ শোধনীয় মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করাইবে।

- গোবর দিয়ে প্রতিমা নির্মাণ

ব্রহ্মবৈবর্ত [শ্রীকৃষ্ণ জন্ম০ ৭৫।৮৩-৮৪] অনুযায়ী, মাটি, ভস্ম, গোবর ও বালি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করে একবার মাত্র পূজা করলেও শতকল্প স্বর্গবাস হয়।

মৃদ্ভস্মগোসকৃৎপঞ্চৈস্তথা বালুকয়াঽপি বা ।

কৃত্বা লিঙ্গং সকৃৎপূজ্য বসেৎকল্পশতং দিবি ।

বৃহন্নারদীয় [পূর্বভাগে তথা তৃতীয়পাদে ৭৫।৭৭] পুরাণে শত্রুসৈন্যের ভয় হলে গোবর দিয়ে হনুমানের প্রতিমা বানানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তত্রাবলম্বমানাং চ প্রতিমাং গোময়েন তু।

বামহস্তেন তালাগ্রং দক্ষিণে জ্ঞানমুদ্রিকা ॥

- গোমূত্র - গোবর পান, স্নান

গরুড় পুরাণে [পূর্বভাগ ১২৩।১১] ভীষ্মপঞ্চকাদি ব্রত বর্ণনায় বিষ্ণু আরাধনায় - ১ম দিন গোময় (গোবর), ২য় দিন গোমূত্র, ৩য় দিন দুধ, ৪র্থ দিন দই ও ৫ম দিন সম্পূর্ণ পঞ্চগব্য আহারের বিধি দেওয়া হয়েছে।

গোমূত্রং চ দধি ক্ষীরং পঞ্চমে পঞ্চগব্যকম্ ।

নক্তং কুর্যাৎপঞ্চদশ্যাং ব্রতী স্যাদ্ভুক্তিমুক্তিভাক্ ॥

মহাভারতের অনুশাসন পর্বে [৭৮।১৯] বলা হয়েছে, গোভক্তের উচিত প্রতিদিন শরীরে গোবর লাগিয়ে স্নান করা, শুকনো গোবরের উপর বসা।

গোময়েন সদা স্নায়াৎ করীষে চাপি সংবিশেৎ।

শ্লেষ্মমূত্রপুরীষাণি প্রতিঘাতং চ বর্জয়েৎ ॥

গোভক্তদের(?) জন্য বিধান বিষ্ণুসংহিতায় [৫০।২২] রয়েছে। বলা হয়েছে, "গোমূত্রেণ স্নায়াৎ" = গোব্রতে গোমূত্র দিয়ে স্নান করবে।

গোময় বা গোবর দিয়ে স্নানের নির্দেশ আমরা গরুড় পুরাণেও [পূর্বভাগ ৫০।১১] পাই। সেখানে একে 'গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়ব্যং স্নানমুত্তমং' তথা 'বায়ব্য স্নান' বলা হয়েছে।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যকৃত পুরোহিত দর্পণে, 'বিধানসপ্তমী' ব্রতে কপিলাগাভীর গোবর সংগ্রহ করে যবপরিমিত গোবর খেতে বলা হয়েছে।

কূর্মপুরাণে [উপরিভাগ ২৭।৩১] বানপ্রস্থীকে কৃষ্ণপক্ষে গোবর খেতে বলা হয়েছে। যদিও এই বিধান বৈদিক শাস্ত্র তথা গৃহ্যসূত্রাদির বিপরীত।

পঞ্চাগ্নির্ধূমপো বা স্যাদুষ্মপঃ সোমপোঽথ বা ।

পয়ঃ পিবেচ্ছুক্লপক্ষে কৃষ্ণাপক্ষে তু গোময়ম্॥

১০৮ উপনিষদের মধ্যে একটি হলো ভিক্ষুকোপনিষদ্ । এতে [৪] বলা হয়েছে,

অথ হংসা নাম গ্রাম একরাত্রং নগরে পঞ্চরাত্রং ক্ষেত্রে সপ্তরাত্রং তদুপরি ন বসেয়ুঃ । গোমূত্রগোময়াহারিণো নিত্যং চান্দ্রায়ণপরায়ণা যোগমার্গে মোক্ষমেব প্রার্থয়ন্তে ।

অর্থাৎ, হংস নামক ভিক্ষুরা (সন্ন্যাসী, বৌদ্ধ নয়) কেবল গোমূত্র ও গোবর আহার করেন এবং সদৈব চান্দ্রায়ণ ব্রতপরায়ণ হয়ে মোক্ষের প্রার্থনা করেন।

অগ্নিপুরাণে শৈবদের জন্য 'একতত্ত্বদীক্ষাবিধি'র বর্ণনা রয়েছে। শিষ্যের অভিষেক বর্ণনায় অগ্নিপুরাণ [৯০।৭] বলছে,

শিষ্যং নিবেশ্য পূর্বাস্যং সকলীকৃত্য পূজয়েৎ।

কাঞ্চিকৌদনমৃদ্ভস্মদূর্বাগোময়গোলকৈঃ ॥

অর্থাৎ, শিষ্যের দেহকে কাঞ্জি, ভাত, মাটি, ভস্ম, দুর্বা, গোবর, সরিষা ও দই দিয়ে মেখে স্নান করাতে হবে।

- ধর্ষিতাকেই অভিযুক্তকরণ ও প্রায়শ্চিত্তবিধান

ধর্মশাস্ত্রগুলোতে [মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী যেগুলোকে বর্জনীয় বললেও, স্মার্ত-পৌরাণিকদের অবশ্য পালনীয়] ধর্ষিতাকেও শুদ্ধিকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অত্রি সংহিতা [১৯৮] ও পরাশর সংহিতা [১০।২৬] অনুযায়ী, যদি কোনো নারী বলপূর্বক হৃতা বা একবার মাত্র উপভুক্তা তথা ধর্ষিত হয় তবে প্রাজাপত্য ব্রত করে শুদ্ধ হবে।

সকৃদ্ভুক্তা তু যা নারী নেচ্ছন্তী পাপকর্মভিঃ ।

প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত ঋতুপ্রস্রবণেন চ ॥

তবে পরাশর সংহিতা যা কিনা কলিযুগের একমাত্র মান্য স্মৃতি বলে অনেকের দাবি, তাতে [১০। ২৫,২৯] নারীর শুদ্ধির জন্য কৃচ্ছ্র সান্তপনের ব্রতের বিধান রয়েছে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এই পঞ্চগব্য ও কুশোদক পান করে এক রাত্রি উপবাস করলেই স্মৃতিমতে কৃচ্ছসান্তপন ব্রত করা হয়।

গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকং ।

একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতম্ ।

- শূদ্র বা চণ্ডালের সংস্পর্শে এলে প্রায়শ্চিত্ত

পরাশরস্মৃতি ৬।৩০-৩৪ = যদি চতুর্বর্ণ চণ্ডালের সংস্পর্শ জল পান করে থাকে তবে ব্রাহ্মণ গোমূত্র ও যব আহার করবে। ব্রাহ্মণের ঘরে চণ্ডাল অবস্থান করলে ব্রাহ্মণ দই,ঘি, দুধের সাথে গোমূত্র মিশিয়ে খাবে।

ভাণ্ডস্থং অন্ত্যজানাং তু জলং দধি পয়ঃ পিবেৎ ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈব প্রমাদতঃ ॥

ব্রহ্মকূর্চোপবাসেন দ্বিজাতীনাং তু নিষ্কৃতিঃ ।

শূদ্রস্য চোপবাসেন তথা দানেন শক্তিতঃ ॥

ভুঙ্ক্তেঽজ্ঞানাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠশ্চণ্ডালান্নং কথঞ্চন ।
গোমূত্রয়াবকাহারো দশরাত্রেণ শুধ্যতি ॥
একৈকং গ্রাসং অশ্নীয়াদ্গোমূত্রয়াবকস্য চ ।
দশাহং নিয়মস্থস্য ব্রতং তত্তু বিনির্দিশেৎ ॥
দধ্না চ সর্পিষা চৈব ক্ষীরগোমূত্রয়াবকম্ ।
ভুঞ্জীত সহ সর্বৈশ্চ ত্রিসন্ধ্যং অবগাহনং ॥ ৬.৩৬ ॥
একই তথ্য অগ্নিপুরাণ ১৭০।১৮-২৫ -
প্রাজাপত্যন্তু শূদ্রাণাং শেষন্তদনুসারতঃ ।
গুণ্ডঙ্কুসুম্ভং লবণং তথা ধান্যানি যানি চ ॥
ব্রতং চান্দ্রায়ণং কুর্যুস্ত্রিরাত্রং শূদ্র এব তু ।
চণ্ডালকূপভাণ্ডেষু অজ্ঞানাৎপিবতে জলং ॥
গরুড় পুরাণ পূর্ব০ ২২২।২,২০-২১
যঃ শূদ্রোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টং প্রমাদাদ্ভক্ষয়েদ্দ্বিজঃ ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥
প্রাজাপত্যাদিভির্ভ্রষ্টা স্ত্রী শুধ্যেত্তু দ্বিভোজনাৎ ।
উচ্ছিষ্টোচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টংশুনা শূদ্রেণ বা দ্বিজঃ ॥
উপোষ্য রজনীমেকাং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ।
বর্ণবাহ্যেন সংস্পৃষ্টঃ পঞ্চরাত্রেণ বৈ তদা ॥
কূর্মপুরাণ উপরি০ ৩৪।৩৮
চাণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টং পীত্বা বারি দ্বিজোত্তমঃ ।
ত্রিরাত্রেণ বিশুদ্ধ্যেত পঞ্চগব্যেন চৈব হি ॥
তুলনীয় সংবর্তস্মৃতি ৩০, আপস্তম্বস্মৃতি ২।২, আঙ্গিরসস্মৃতি ১।৯-১০, উশন সংহিতা ৯।৪৯।

- রোগের চিকিৎসায় গোমূত্র-গোবর

গরুড় পুরাণ [১।১৭৪।৪১] অনুযায়ী, গোমূত্রের সাথে গুগ্গুল খেলে উরুস্তম্ভ নাশ হয়।
ঊরুস্তম্ভবিনাশায় গোমূত্রেণ চ গুগ্গুলুঃ ॥
অগ্নিপুরাণ [২৮৩।৪০] অনুযায়ী, 'শুণ্ঠীদারুনবাক্ষীরক্কাথো মূত্রান্বিতোঽপরঃ' অর্থাৎ, শুণ্ঠী, দারু, পুনর্নভ, ক্ষীরাদি গোমূত্রে মিশিয়ে পান করলে চুলকানি দূর হয়ে যায়।
অগ্নিপুরাণ [২৮৫।৩৮] অনুযায়ী, হরিতকী গোমূত্রে ভিজিয়ে শুদ্ধ করে তেল ও লবণ মিশিয়ে প্রতিদিন সকালে খেলে কফ ও বাতজনিত রোগ দূর হয়। একই পুরাণে [২৮৫।৫৭-৫৮] পাড়, কচুরিপানা, ত্রিকটূ ও ত্রিফলা, চিত্তা এদের একত্রে গোমূত্রে পিষ্ট করে বড়ি বানিয়ে খেলে গুল্ম, প্লীহা রোগ দূর হয়।
হরিতকীং মূত্রসিদ্ধাং সতৈললবণান্বিতাং ।
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেৎ কফবাতাময়াপহাং ॥

পাঠানিকুম্ভত্রিকটুত্রিফলাগ্নিষু সাধিতম্ ।
মূত্রেণ চূর্ণগুটিকা গুল্মপ্লীহাদিমর্দ্দনী ॥

গরুড় পুরাণ [১।১৮১।৪০] অনুযায়ী, দুধ বা কাকজঙ্ঘার রসের সাথে গোবরের রস মিশিয়ে পান করলে বিষমজ্বর দূর হয়।

দুগ্ধং পীতং তু সংযুক্তং গোপুরীষরসেন চ ।
বিষমজ্বরনুৎস্যাচ্চ কাকজন্ধারসস্তথা ॥

হরিবংশ পুরাণে [বিষ্ণুপর্ব ৮০।৬-৮] পার্বতী অরুন্ধতীকে বলছেন, যিনি শিরঃশোভা কামনা করিয়া কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে মস্তকে গোময় অথবা শ্রীফল বিলেপনপূর্ব্বক গোমূত্র প্রদান করিয়া পরিষ্কৃত জলে ধৌত করিবেন এবং গোমূত্র পান করিবেন, তাঁহাকে কদাচ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না, প্রত্যুত শিরঃরোগও তাঁহাকে উপতাপিত করে না, তিনি বিগতজ্বরা ও সুভগা হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করেন।

শিরো নির্বেষ্টুকামা তু গোময়েন শিরঃ শতী।
প্রক্ষালয়েন্মলং ধাত্র্যা বিল্বেন শ্রীফলেন চ ॥ ৬ ॥
গোমূত্রং চ সদা প্রাশ্যেচ্ছিরঃস্নানং চ মিশ্রয়েৎ।
কৃষ্ণাং চতুর্দশীং ত্বেতৎ কর্তব্যং বরবর্ণিনি ॥ ৭ ॥
ভবত্যবিধবা চৈব সুভগা বিজ্বরা তথা ।
শিরোরোগৈর্নৈব চাস্যাঃ শরীরমভিতপ্যতে॥৮॥

প্রসঙ্গতঃ, শূদ্রের কি পঞ্চগব্যে অধিকার আছে ?

না, নেই। এটিই স্মার্ত-পৌরাণিক সিদ্ধান্ত।

আপস্তম্ব স্মৃতি [৫।৪] অনুযায়ী,

পঞ্চগব্যং ন দাতব্যং তস্য মন্ত্রবিবর্জনাৎ।
খ্যাপয়িত্বা দ্বিজানান্ত শূদ্রো দানেন শুধ্যতি॥

অর্থাৎ, শূদ্র পঞ্চগব্য পান করবে না। বরং সে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজদের দান করে নিজে শুদ্ধ হবে।

বিষ্ণু স্মৃতি [৫৪।৭] অনুযায়ী,

পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিবেৎ ।
উভৌ তৌ নরকং যাতো মহারৌরবসংজ্ঞিতম্ ॥

অর্থাৎ, শূদ্র যদি পঞ্চগব্য ও ব্রাহ্মণ যদি সুরাপান করে তবে তারা মহারৌরব নরকে গমন করে।

গরুড় পুরাণ সারোদ্ধার [৪।২২] "বেদাক্ষরং পঠেচ্ছূদ্রঃ কাপিলং যঃ পয়ঃ পিবেৎ" বেদ পাঠক, কপিলা গাভীর দুধ পানকারী শূদ্রের নরক গমনের তথ্য আমাদের দিচ্ছে [বৈতরণ্যাং পতন্তি তে]।

- ঔষধী হিসেবে গোমূত্র

আয়ুর্বেদে গোরুসহ নানা প্রাণীর মূত্রের বর্ণনা আছে। সুশ্রুত সংহিতায় [সূত্রস্থান|৪৫] ৮ প্রকার প্রাণীর মূত্রের বর্ণনা আছে।

গোমহিষ্যজাবিগজহয়খরোষ্ট্রাণাং মূত্রাণি তীক্ষ্ণানি কটূন্যুষ্ণানি তিক্তানি লবণানুরসানি লঘূনি শোধনানি কফবাতকৃমিমেদোবিষগুল্মার্শউদরকুষ্ঠশোফারোচকপাণ্ডুরোগহরাণি হৃদ্যানি দীপনানি চ সামান্যতঃ ২১৭

ভবতশ্চাত্র

তৎ সর্বং কটূতীক্ষ্ণোষ্ণং লবণানুরসং লঘু
শোধনং কফবাতঘ্নং কৃমিমেদোবিষাপহম্ ২১৮
অর্শোজঠরগুল্মঘ্নং শোফারোচকনাশনম্
পাণ্ডুরোগহরং ভেদি হৃদ্যং দীপনপাচনম্ ২১৯
গোমূত্রং কট তীক্ষ্ণোষ্ণং সক্ষারত্বান্ন বাতলম্
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তলং কফবাতনুৎ ২২০
শূলগুল্মোদরানাহবিরেকা স্থাপনাদিষু
মূত্রপ্রয়োগসাধ্যেষু গব্যং মূত্রং প্রয়োজয়েৎ ২২১
দুর্নামোদরশূলেষু কুষ্ঠমেহাবিশুদ্ধিষু
আনাহশোফগুল্মেষু পাণ্ডুরোগে চ মাহিষম্ ২২২
কাসশ্বাসাপহং শোফকামলাপাণ্ডুরোগনুৎ
কটূতিক্তান্বিতং ছাগমীষন্মারুতকোপনম্ ২২৩
কাসপ্লীহোদরশ্বাসশোষবর্চোগ্রহে হিতম্
সক্ষারং তিক্তকটুকমুষ্ণং বাতঘ্নমাবিকম্ ২২৪
দীপনং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং বাতচেতোবিকারনুৎ
আশ্বং কফহরং মূত্রং কৃমিদদ্রুষু শস্যতে ২২৫
সতিক্তং লবণং ভেদি বাতঘ্নং পিত্তকোপনম্
তীক্ষ্ণং ক্ষারে কিলাসে চ নাগং মূত্রং প্রয়োজয়েৎ ২২৬
গরচেতোবিকারঘ্নং তীক্ষ্ণং গ্রহণিরোগনুৎ
দীপনং গার্দভং মূত্রং কৃমিবাতকফাপহম্ ২২৭
শোফকুষ্ঠোদরোন্মাদমারুত ক্রিমিনাশনম্
অর্শোঘ্নং কারভং মূত্রং মানুষং চ বিষাপহম্ ২২৮

অর্থাৎ, গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, গজ, অশ্ব, গর্দভ ও উষ্ট্রের মুত্র সাধারণতঃ তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, লবণানুরস, লঘু, শোধন, কফ বাত কৃমি মেদ বিষ গুল্ম অর্শ উদর কুষ্ঠ শোথ অঙ্কচি ও পাণ্ডুরোগনাশক, হৃদ্য ও দীপন। এই স্থলে কয়েকটী শ্লোক বলিয়া উপ-সংহার করা হইতেছে, যথা ঐ সকল মূত্র কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণানুরস, লঘু, শোধন, কফবাতঘ্ন, কৃমি,মেদ ও বিষনাশক, অর্শ উদর ও গুল্মনাশক, শোথ ও অরুচি-নাশক, পাণ্ডুরোগনাশক, ভেদক, হৃদয়ের পক্ষে হিত, দীপন ও পাচন।

১। গোমূত্র কটূ, তীক্ষ, উষ্ণ এবং ঈষৎ ক্ষারযুক্ত বলিয়া বায়ুনাশক। ইহা লঘু, অগ্নিদীপক, মেধ্য, পিত্তকারক ও কফবাতনাশক। শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, বিরেচন ও আস্থাপনাদি মূত্রপ্রয়োগ-সাধ্য হইলে সে স্থলে গোমূত্রই প্রয়োগ করিবে।

২। অর্শ, উদর ও শূলে এবং কুষ্ঠ ও মেহ রোগের অশুদ্ধ অবস্থায় বমনাদি প্রয়োগ করিতে হইলে এবং আনাহ, শোখ, গুল্ম ও পাণ্ডুরোগে মূত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হইলে মহিষীর মূত্র দিবে।

৩। ছাগীর মূত্র কাসশ্বাসনাশক, শোষ কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক, কটূ ও তিক্ত এবং ঈষৎ বায়ু-কারক।

৪।মেষ মূত্র কাস, প্লীহা, উদর, শ্বাস, শোষ ও বিষ্ঠা বন্ধে হিতকর। ইহা ঈষৎ ক্ষার, তিক্ত, কটু, উষ্ণ ও বাতঘ্ন।

৫। অশ্বমূত্র দীপন, কটূ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বায়ুনাশক, চিত্তবিকারনাশক, কফহারক এবং কৃমি ও দদ্রুরোগে প্রশস্ত।

৬। হস্তিমূত্র ঈষৎ তিক্ত, লবণ, ভেদক, বাতঘ্ন, পিত্তকোপন ও তীক্ষ্ণ। ইহা ক্ষারকর্ম ও কিলাসরোগে ব্যবহার করিতে হয়।

৭। গর্দভমূত্র গরদোষনাশক, চিত্তবিকারনাশক, তীক্ষ্ণ, গ্রহণীরোগনাশক, দ্রীপন, কৃমিনাশক এবং বাতকফনাশক।

৮। উটমূত্র শোথ, কুষ্ঠ, উদর, উন্মাদ, বায়ু ও কৃমি নাশ করে। ইহা অর্শোঘ্ন।

আর শেষে বলা, মানুষ-মূত্র বিষনাশক।

প্রসঙ্গতঃ, আয়ুর্বেদের মূখ্যকর্ম দ্রব্যগুণ বর্ণনা। বিহিত-অবিহিত দুই প্রকার উপাদানই আয়ুর্বেদে পাওয়া যায়। তবে শাস্ত্রানুকূল কোনটি তার নির্ণীত হবে ধর্মশাস্ত্র দ্বারা। আয়ুর্বেদ একটি ক্রমবিকাশমান শাস্ত্রও বটে। তাই একে অভ্রান্ত ও নিত্য ধরে ধর্মীয় সিদ্ধান্ত ভাবা ও সমালোচনা উচিত নয়। উদাহরণস্বরূপ -

১। মানব নারীর দুধ ও তার দইয়ের উপকারিতা -চরক০ সূত্র০ অ০ ২৭.২২১-২২৪।

২। গোমাংসের উপকারিতা - চরক০ সূত্র০ অ০ ২৭.৮১

৩। উন্মাদের চিকিৎসায় কুকুর ও গোমাংসের ধূপ [সু০ স০ উত্তরতন্ত্র ৬২.১৬/ বাংলায় শ্লোক ৮]

৪। ছাগলের অণ্ডকোষ খেয়ে যৌনশক্তি বৃদ্ধি - সু০ স০

চিকিৎসা স্থান ২৬.৪

উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম, বৈদিক শাস্ত্রে গোমূত্র বা গোবরের এতোটা মাহাত্ম্য খ্যাপন করা হয়নি যা পরবর্তীযুগের গৌণস্মৃতি বা পুরাণাদিতে আছে । গোবোরের ব্যবহার গৃহস্থালিতে লেপনের ঐতিহ্য প্রাচীন ও ধর্মীয়সিদ্ধান্তও না, সেই হিসেবে সমালোচনাযোগ্যও না। গোমূত্রও প্রায়শ্চিত্তাদিতেই বিহিত হয়েছিলো এবং অত্যন্ত গুরুতর পাপেই। শাস্তিতে তীব্রতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই গোমূত্র বা গোবরের অলৌকিক বা অতিমাহাত্ম্য সনাতন ধর্মের নির্দিষ্ট অংশ নয়, তাই এই বিষয়ে সমালোচনা ও সংশ্লিষ্টতা সনাতন ধর্মকে আহত করে না বরং গবেষণা সাপেক্ষেই গ্রহণ করা উচিত। গো এবং গবাদি পশু পালনীয় ও রক্ষণীয়, সর্বপ্রাণীকে যেমন আমরা শ্রদ্ধা করি তারাও শ্রদ্ধার পাত্র। প্রাণীমাত্রই সেবা করা সনাতন ধর্মাবলম্বীর ভূতযজ্ঞের অবশ্য কর্তব্য।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ব্রাহ্মণ গ্রন্থ শব্দে 'ব্রাহ্মণ' পদের পর্যালোচনা

বৈদিক বাঙ্ময়ে সংহিতার পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো ‘ব্রাহ্মণ’। আমরা শুরুতেই আমাদের সিদ্ধান্ত পরিষ্কার করতে চাই, 'আর্য সমাজ বা অগ্নিবীর' শুধু সংহিতাকেই বেদ মান্য করে। ব্রাহ্মণাদি কে বেদের ব্যাখ্যান শাস্ত্র বলে গ্রহণ করি। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে “এতদ্ ব্রাহ্মণান্যেব পঞ্চ হবিংষি” [তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩।৭।১।১]। যাস্কাচার্য নিরুক্তে বলেছেন, “যথো এতদ্ ব্রাহ্মণং ভবতীনি। বহুভক্তিবাদীনি ব্রাহ্মণানি ভবন্তি” [নিরুক্ত ৭।২৪]। এখানে বৈশ্বানর শব্দের নির্বচন করতে গিয়ে যাস্কাচার্য ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ করেন। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীজি ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যাখ্যা করেছে, “ব্রহ্মণাং বেদনামিমানি ব্যাখ্যানানি ব্রাহ্মণানি” অর্থাৎ ঐতরেয় ও শতপথাদি গ্রন্থ বেদ তথা ব্রহ্মের ব্যাখ্যান করায় এর নাম ব্রাহ্মণ।

এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় সংহিতার অর্থাৎ কৃষ্ণ যজুর্বেদের বিখ্যাত টীকাকার ভট্টভাস্কর বলেন, “ব্রাহ্মণং নাম কর্মণস্তন্মন্ত্রাণাম্ চ ব্যাখ্যান গ্রন্থঃ” [তৈত্তিরীয় সংহিতা, ভট্টভাস্কর টীকা ১।৫।১]। কর্মের নাম হলো ব্রাহ্মণ, এই প্রতিপাদ্য বিষয়ে ব্যাখ্যান থাকার কারণে এই গ্রন্থসমূহের নাম ‘ব্রাহ্মণ’।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর ‘অনুভ্রমোচ্ছেদন’ গ্রন্থে বলেছেন, যেকারণে এই ঐতরেয় ইত্যাদি গ্রন্থ ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদের ব্যাখ্যা করে অর্থাৎ ‘ব্রহ্মণাম্ বেদানামিমানি ব্যাখ্যানানি ব্রাহ্মণানি’।

বেদান্তশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো ব্রহ্ম। আমরা যদি বেদান্ত দর্শনের ১ম ও ২য় সূত্র দেখি, সেখানে বলা হয়েছে।

অথাতো ব্রহ্মাজিজ্ঞসা [ব্রহ্মসূত্র ১।১।১]

অর্থ: এখন আমরা ব্রহ্ম সম্পর্কে জানবো।

জন্মাদস্য যতঃ। [ব্রহ্মসূত্র ১।১।২]

অর্থ: যাঁর দ্বারা এর জগতের সৃষ্টি, পালন ও লয় হয় তিনিই সেই ব্রহ্ম।

এই হিসেব থেকে বলা যায় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়েরকারী ব্রহ্মের বর্ণনা থাকার কারণে এই গ্রন্থগুলোর নাম ‘ব্রাহ্মণ’ গ্রন্থ।

মহাভারতে বলা হয়েছে,

দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে শব্দব্রহ্ম পরং চ যৎ॥

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।

[মহাভারত, শান্তিপর্ব ২৭০।১-২]

অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম অর্থ হলো পবিত্র বেদ এবং পরব্রহ্মের অর্থ হলো পরমপূজ্য পরমাত্মা। তাই শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মের বিশদ ব্যাখ্যা থাকায় শতপথ ও ঐতেরীয়াদি গ্রন্থগুলো নাম ব্রাহ্মণ।

এছাড়া শতপথে ব্রহ্মের ব্যক্ত-অব্যক্ত, অক্ষরাদি বিভিন্ন স্বরূপের ব্যাখ্যা থাকায় এর নাম ‘ব্রাহ্মণ’।

- এছাড়া আমরা যদি আরো দেখি শতপথ ব্রাহ্মণে অনেক স্থলে শরীরতত্ত্ব নিয়ে বহু আলোচনা করা হয়েছে। যেমন [১৪।৬।১০।১৮] তে বর্ণিত হয়েছে, ‘হৃদয় বৈ সম্রাট্ পরমম্ ব্রহ্ম’ অর্থাৎ হৃদয়ই পরমব্রহ্ম।

যজুর্বেদের ৩৫।১-৬ এ অর্থাৎ শিবসংকল্প সূক্ত যেটি আমরা শয়নের পূর্বে পাঠ করি সেখানে মন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এই মনের ব্যাখ্যা শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪।৪।৩ এ রয়েছে, এর ৯ম কাণ্ডে বলা হয়েছে,

‘কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎসর্বম্মন এব’ অর্থাৎ কামনা, সংকল্প, সন্দেহ, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয় এই সবগুলোই ‘মন’।

এরপরবর্তীতে ১১-১৪ কাণ্ডে মনের নিবর্চন যথাক্রমে ‘মনোঽন্তরিক্ষলেক’, ‘মনো যজুর্বেদ’, ‘মনঃ পিতর’, ‘মন এব পিতা’ করা হয়েছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে আরো বলা হয়েছে, ‘বাগ্বৈ ব্রহ্ম’

বাক্ ই হলো ব্রহ্ম [শতপথ ২।১।৪।১০, জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ ১।১০২]। ‘বাগ বা ইন্দ্র’ [কৌষিতকী ব্রাহ্মণ ২।৫।৩৬]। ঐতরেয় আরণ্যকের ১।৩।৮ এ উল্লেখিত হয়েছে, ‘যাবদ্ ব্রহ্ম বিষ্ঠিতং তাবতী বাগ্ ইতি যত্র হ ক্ষ চ ব্রহ্ম তদ্ বাগ্ যত্র বা বাক্ তদ্ বা ব্রহ্মেত্যেতত্ তদুক্তং ভবতি’ অর্থাৎ যেখানেই ব্রহ্ম সেখানেই বাক্, যেখানে বাক্ সেখানেই ব্রহ্ম। এর অর্থ না ব্রহ্মের কোন শেষ আছে না বাণীর।

এছাড়া শতপথ ব্রাহ্মণে আরো বলা হয়েছে, ‘সত্যমেব ব্রহ্ম - সত্যই ব্রহ্ম [১৪।৪।১।২৩]’, ‘ত্রেধা বিহিতা হি বাক্ ঋচো যজুংষি সামানি - বেদই ব্রহ্ম [৬।৫।৩।৪]’

এইজন্য মন, বাক, সত্য, বেদ রূপী ব্রহ্মের ব্যাখ্যা থাকার কারণেও শতপথাদির নাম ‘ব্রাহ্মণ গ্রন্থ’ বলা যায়।

এছাড়া যদি আমরা দেখি যজ্ঞ বিষয়ক, সেইক্ষেত্রে যজ্ঞ নিয়ে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে যজ্ঞ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। অথর্ববেদের ১৯।৪২।২ এ বলা হয়েছে, ‘ব্রহ্ম স্রুচো ঘৃতবতীর্ব্রহ্মণা বেদিরুদ্ধিতা’ অর্থ: ব্রহ্মযজ্ঞে ব্রহ্মাই ঘৃতাহুতির নিমিত্ত স্রুব তথা যজ্ঞ চামচাদি যজ্ঞপাত্র, ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞবেদি উচ্চস্থলে নিহিত।

এখানে যজ্ঞ ও যজ্ঞে ব্যবহৃত সকল উপকরণকে ব্রহ্ম উপমা দেয়া হয়েছে। একাধিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অসংখ্যবার বলা হয়েছে, ‘যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু, যজ্ঞো বৈ প্রজাপতি’। এই যজ্ঞকে শতপথ ব্রাহ্মণের ১।৭।১।৪-৫ এ উদ্ধৃত হয়েছে যজ্ঞের মহিমা। ‘দেবো বঃ সবিতা প্রার্পযত্বি তি.....শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণ ইতি। যজ্ঞো বৈ শ্রষ্ঠতমম্ কর্ম যজ্ঞায় হি তস্মাদাহ শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণ ইতি’ এর অর্থ হলো, সবিতার প্রেরণায় প্রেরিত হয়ে সে যজ্ঞ করে। সে বললো - “সবিতা দেব তোমাকে প্রেরণা প্রদান করুক,” শ্রেষ্ঠতম কর্মের জন্য। যজ্ঞই শ্রেষ্ঠতম কর্ম। যজ্ঞের জন্য বলার তাৎপর্য হলো, শ্রেষ্ঠতম কর্মের জন্য।

এই যজ্ঞাদি শ্রেষ্ঠ কর্ম তথা যজ্ঞরূপী ব্রহ্মের ব্যাখ্যা থাকায় এই ঐতেরীয় ও শতপথাদি গ্রন্থসমূহের নাম ‘ব্রাহ্মণ গ্রন্থ’।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থকে বলা হয় বেদের সর্বপ্রথম ভাষ্য। ধর্মীয় সিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ শাস্ত্র অতীত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে বহু ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিলুপ্ত।

এখনের প্রচলিত ব্রাহ্মণ গুলো হলো:

১| শতপথ ব্রাহ্মণ

২| ঐতরেয় ব্রাহ্মণ

৩| তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ

৫| তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ

৬| ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ

৭| কৌষিতকী ব্রাহ্মণ

৮| শাঙ্খ্যায়ন ব্রাহ্মণ

৯| আর্ষেয় ব্রাহ্মণ

১০| জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ

১১| গোপথ ব্রাহ্মণ

এই সকল ব্রাহ্মণ বর্তমানে বিভিন্নভাবে উপলব্ধ, ফলতঃ বেদার্থ তথা শব্দ নির্বচনে এইসকল ব্রাহ্মণ নিসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক

"মনুস্মৃতিতে প্রক্ষিপ্ততা" – পন্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়

আমরা পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে সামান্য বর্ণনা করব। মনুস্মৃতির বর্তমান রূপক্রম মনুস্মৃতিতে প্রক্ষিপ্ততার চেয়ে অন্তত দুই হাজার বছরের পুরনো। এর মধ্যে অনেক প্রক্ষিপ্ততা আছে। কিন্তু এই প্রক্ষিপ্ততা নতুন নয় বরং যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি স্মৃতিতে এই মনুস্মৃতির উদ্ধৃতি পাওয়া যায়। মেধাতিথি প্রভৃতি যে সকল ভাষ্য করেছেন তা এই মনুস্মৃতির। কিছু পাঠভেদ অবশ্যই আছে। শ্লোকেও পার্থক্য আছে। এমন অনেক শ্লোক আছে যা মেধাতিথি ও কুল্লূক ইত্যাদির ভাষ্যে পাওয়া যায় না এবং সেগুলো পরবর্তী ভাষ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। কিছু শ্লোক আছে যা পরবর্তীতে বিলুপ্ত হয়েছে।

এভাবে এখানেও হস্তক্ষেপ হয়েছে, তবে তা অধিক নয়। তবে বেশকিছু সিদ্ধান্তে বড়ধরনের প্রক্ষিপ্ততা হয়েছে। কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে না যে এই প্রাচীন মনুস্মৃতিতে বড় ধরনের কোনো হস্তক্ষেপ হয় নি। মহাত্মা বুদ্ধের কিছুকাল আগে, যখন বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্মে ভয়ানক বিকৃতি ঘটেছিল এবং মহাত্মা বুদ্ধের কিছুকাল পরে, যখন অবৈদিক বৌদ্ধধর্ম এবং বৈদিক পৌরাণিক ধর্মের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছিল, তখন বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতরা স্বেচ্ছাচারিতা চালাতে থাকে।

তারা যা খুশি মিশ্রিত করতেন এবং যা খুশি সরিয়ে ফেলতেন।

এতে বৈদিক সিদ্ধান্তে বড় ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়। মনুস্মৃতিতে কি প্রক্ষিপ্তপাঠ আছে? হ্যাঁ, অবশ্যই আছে। কোন নিরপেক্ষ বিদ্বান্ এটি মেনে নিতে দ্বিধা করতে পারেন না। এর প্রমাণ প্রচুর রয়েছে। এতে কতটা প্রক্ষিপ্ততা এবং কতটা মৌলিক পাঠ রয়েছে তা নিয়ে মতপার্থক্য থাকতে পারে। প্রথমত, এমন অনেক পরস্পর বৈপরীত্য রয়েছে যা ভাষ্যকারদের প্রতিভাসম্পন্ন সমালোচনাও দূর করতে পারেনি। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

(১) সবর্ণাSগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি।

কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।।

শূদৈব ভার্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।

তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ।।

(মনু০ ৩/১২,১৩)

এখানে একজন ব্রাহ্মণ, শূদ্রকে বিয়ে করার পূর্ণ অধিকার রাখে। কিন্তু পরের শ্লোকে জোর দিয়ে তা নিষেধ করা হয়েছে -

ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যাপি হি তিষ্ঠতোঃ।

কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে।।

(মনু০ ৩/১৪)

এর পূর্ববর্তী চারটি শ্লোকে জোর দেয়া হয়েছে যে যেকোনো দ্বিজ তার চেয়ে নিম্ন বর্ণের স্ত্রীকে বিয়ে করা উচিত নয়। এমনকি আপদকালীন পরিস্থিতিতেও এটি অলঙ্ঘনীয়। কুল্লূক লিখেছেন-

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োর্গার্হস্থ্যমিচ্ছতোঃ সর্বথা সবর্ণালাভে কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে ইতিহাসাখ্যানেऽপি শূদ্রা ভার্য্যোং নাভিধীয়তে।"

এই দুই বিরোধের কোন সমন্বয় হতে পারে না। আমার ধারণা হলো মনুর আদেশ শূদ্রের সাথে বিবাহের পক্ষে স্পষ্ট। শেষের ছয়টি শ্লোক যা বর্তমান মনুস্মৃতির ৩/১৪-১৯ শ্লোক সেই সময়ে মিশ্রণ যখন জাতি বন্ধন কঠোর করা হয়েছিল এবং শূদ্রদের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। এগুলো যদি মনুস্মৃতির মৌলিক শ্লোক হতো তাহলে এত বিরোধিতা হতো না।

(২) মনু ৩/২১ - এ আট ধরনের বিবাহ সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে–

ব্রাহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।

গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোऽধমঃ।।

অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। এর পরবর্তীতে ৩/২৬ থেকে ৩/৩৪ তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেয়া আছে। তারপর ৩/৩৯ থেকে ৩/৪২ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে প্রথম চারটি, যথা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, শ্রেষ্ঠ এবং "শিষ্টসম্মত", বাকি চারটি বিবাহ কুৎসিত। তাদের সন্তান ভোগী ও "ব্রহ্মধর্ম দ্বিষ" হয়ে থাকে। তাই শুধু চার প্রকার বিবাহের আজ্ঞা রয়েছে। বাকি চারটি অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ "নিন্দিত"। তাই তাদের "নিন্দ্যান্ বিবর্জয়েত্" করা উচিত নয়।

আমার ধারণা এটি মনু মহারাজের ব্যক্তিগত সম্মতি। স্বামী দয়ানন্দ এই আটটি বিবাহ সম্পর্কে এই সম্মতি দিয়েছেন– "এই সমস্ত বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্মণ বিবাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, দৈব এবং প্রজাপতি মধ্যম, আর্ষ, অসুর এবং গান্ধর্ব সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, রাক্ষস সর্বনিম্ন এবং পৈশাচ সবচেয়ে মহাভ্রষ্ট। " (সত্যার্থ প্রকাশ, ৪র্থ সমুল্লাস)।

আর্ষ বিবাহকে মনু দ্বারা অনিন্দিত এবং স্বামী দয়ানন্দের দ্বারা নিকৃষ্ট হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাকি চারটি নিন্দিত। কিন্তু নিচের শ্লোকটি সম্পূর্ণ বিপরীত–

ষড়ানুপূর্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরাऽবরান্।

বিট্শূদ্রয়োস্তু তানেব বিদ্যাদ্ধর্ম্যানরাক্ষসান্।।

(মনু০ ৩/২৩)

এখানে প্রথম ছয়টি অর্থাৎ ব্রাহ্ম দেব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, অসুর এবং গান্ধর্ব, ব্রাহ্মণদের জন্য ধর্মানুকূল করা হয়েছে। শেষ চারটি অর্থাৎ অসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচকে ক্ষত্রিয়দের জন্য "ধর্ম" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বৈশ্য

এবং শূদ্রদের জন্য রাক্ষস বিবাহ পরিত্যাগ করে অসুর, গান্ধর্ব এবং পৈশাচকে ধর্ম হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি শুধুমাত্র ৩/৪৯ এর সম্পূর্ণ বিপরীত নয়, বরং বিস্ময়কর।

ক্ষত্রিয়দের প্রথম চারটি বিয়ের আজ্ঞা কেন দেওয়া হয় নি? তাদের শেষ চারটি কেন? 'পৈশাচ' বিবাহের এমন কি গুণ আছে, তা ক্ষত্রিয়দের জন্য ভালো আর বৈশ্য ও শূদ্রদের জন্য খারাপ। কোন বুদ্ধিমান পুরুষ পৈশাচ বিবাহকে কারো জন্য ভালো বলতে পারে না। তাহলে ক্ষত্রিয় রাজাদের কি কৃপা ছিল যে তাদের বিয়ের জন্য কোন নিয়ম রাখা হয়নি।

সবকিছু নিয়ম নির্ধারিত বলা হয়েছে। এটি প্রক্ষিপ্ত না হওয়ার কোন সন্দেহ রয়েছে? আদৌ কোনো রাজার মহৎ আচরণকে 'ধর্ম' বলে বর্ণনা করার জন্য এই কাজটি করা হয়নি? তাহলে গান্ধর্ব বিবাহ ব্যভিচার থেকে কম কিছু নয়। কিন্তু এতে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলের আজ্ঞা রয়েছে। রাজা দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলার প্রতি আসক্ত হলেন তখন তা মনুস্মৃতির প্রমাণ দিয়ে একান্ত প্রসঙ্গ অনুশীলনে হস্তক্ষেপ করতে হয়। মনুস্মৃতির এই অস্ত্র দিয়ে রাজারা কি না করতে পারে? শুধু এটাই না।

এর পরের শ্লোকটি এর আরও বিপরীত-

চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কাবয়ো বিদুঃ।

রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।।

(মনু০ ৩/২৪)

বিদ্বানেরা বলেন, প্রথম চারটি বিবাহ ব্রাহ্মণের জন্য উপযুক্ত। ক্ষত্রিয়ের জন্য এক রাক্ষস বিবাহ। বৈশ্য ও শূদ্রের জন্য অসুর বিবাহ আছে এই সব কথা কিভাবে ঠিক হতে পারে। রাক্ষস বিবাহের বিশেষত্ব এমন কি যে এটি কেবল একজন ক্ষত্রিয়ের জন্য উপযুক্ত বলা হয়েছে। পরবর্তী দুটি শ্লোকও দেখুন-

পঞ্চানাস্তু ত্রয়ো ধর্ম্যা দ্বাবধর্ম্যৌ স্মৃতাবিহ।

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্তব্যৌ কদাচন।।

পৃথক্ পৃথগ্বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্বচোদিতৌ।

গান্ধর্বো রাক্ষসশ্চৈব ধর্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ।।

(মনু০ ৩/২৫,২৬)

কখনো এটা আবার কখনো ওটা। কোন জ্ঞানী মানুষ এমন আজে বাজে কথা বলবে না। সামান্য কিছু দিলেও নির্ধারণ হয় যে ৩/২৩ থেকে ৩/২৬ পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোক মিশ্রিত ছিল। আটটি বিয়ের নাম দেওয়া এবং তাদের লক্ষণগুলি বলা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। এর মধ্যে 'ধর্ম' এবং 'অধর্ম' বিবাহ গণনা করা, যেখানে ৩/৪১-৪২ -এ 'অনিন্দ্য' এবং 'নিন্দ্য' বিবাহের কথা আবার উল্লেখ করা হয়েছে, তা কেবল অস্বাভাবিকই নয়, অনুপযুক্ত বটে।

একইভাবে ৩/৩৬, ৩৭, ৩৮ অযৌক্তিকভাবে যোগ করা হয়েছে। আর সেখানে ২১ প্রজন্ম উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। এই মিশ্রণ এমন এক ছেঁড়া বস্ত্র যা দূর থেকে জ্বলজ্বল করে, রিপুর কাজটি এরকম কুৎসিতভাবে করা হয়েছে যে পুরো কাপড়টি কুৎসিত দেখায়। (৩) অধ্যায় ৯ এর ৫৯ থেকে ৬৩ এই চারটি শ্লোকে "নিয়োগ"

আদেশ করা হয়েছে এবং ৬৩ তম শ্লোকে বলা হয়েছে যে "নিয়োগ বিধি" ত্যাগ করতে এবং যারা ব্যবহার করে তারা পতিত হয়ে যায়।

কিন্তু ৬৪ থেকে ৬৭ পর্যন্ত নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ৫৯ থেকে ৬৯ পর্যন্ত এই এগারোটি শ্লোক পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় যে, কিছু ডাল মে কুছ কালা হে। স্যার পি.ভি. কাণে বলেছেন-

In one breath Manu seems to permit niyoga (9.59-63) and immediately afterwards he strongly reprobates it .(9.64-69)

৬৬ তম শ্লোকে রাজার গল্প দিলেও বোঝা যায় যে এই শ্লোকগুলি পেছন থেকে যুক্ত করা হয়েছিল।

(৪) অধ্যায় ৫/৪৮ - ৫০ তম শ্লোকে মাংস খাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ -

নাকৃত্বা প্রাণিনাং হিংসাং মাংসমুৎপদ্যতে ক্বচিৎ।

ন চ প্রাণিবধঃ স্বর্গ্যস্তস্মান্মাংসং বিবর্জয়েৎ।।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌ চে দেহিনাম্।।

প্রসমীক্ষ্য নিবর্তেত সর্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ।।

যেখানে কেবল মাংসাহার নিষেধ করে নি বরং প্রবল যুক্তিও দেয়া হয়েছে এর পক্ষে। অর্থাৎ, পশুর প্রতি হিংসা ছাড়া মাংস পাওয়া যায় না এবং পশুকে হত্যা করে স্বর্গলাভ হয় না তাই মাংসও বর্জনীয়। এই যুক্তি অনুসারে শুধু সাধারণ মাংস খাওয়াই নিষেধ নয়, বরং যজ্ঞে মাংস আহুতি দেয়া, খাওয়াও নিন্দিত কারণ যজ্ঞে মাংস দিলেও পশুর প্রতি সহিংসতা হয়।

পরবর্তীতে মাংসকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে–

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রিয়বিক্রয়ী।

সংস্কর্তা চোপহর্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ।

(মনু০ ৫/৫১)

অর্থাৎ, শুধুমাত্র মাংস ভক্ষণকারীই হিংসার জন্য পাপী নয়, এর মধ্যে রয়েছে পশুকে হত্যাকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, রাঁধুনি ইত্যাদি। এই স্পষ্ট শ্লোক থাকা সত্ত্বেও, নিম্নোক্ত শ্লোকে মাংসের বিধান রয়েছে–

যজ্ঞায় জগ্ধির্মাংসস্যেত্যেষ দৈবো বিধিঃ স্মৃতঃ।

অতোऽন্যথা প্রবত্তিস্তু রাক্ষসো বিধিরূচ্যতে।।

(মনু০ ৫/৩১)

অর্থাৎ যজ্ঞতে মাংস আহুতি দেয়া হলো ‘দৈব বিধি’ এবং মাংস আহুতি ছাড়া যজ্ঞ হলো 'রাক্ষস বিধি'। প্রাণীদের উপর হিংসা না করে যজ্ঞে মাংস দেয়া যাবে কি? তা না হলে 'দৈব বিধান' এবং 'রাক্ষস বিধি'-এর মধ্যে পার্থক্য কী? একইভাবে ৫/৩২ থেকে ৪২ পর্যন্ত অসঙ্গত কথাগুলো বলা হয়েছে। ৫/৪০ এক অদ্ভুত যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, যজ্ঞার্থ নিধনং প্রাপ্তাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যুচ্ছ্রি তীঃ পুনঃ।। অর্থাৎ, যজ্ঞের জন্য যে সকল পশু-পাখি হত্যা করা হয় তারা পরবর্তী জন্মে উৎকৃষ্ট যোনি লাভ করে।

একইভাবে শ্রাদ্ধে বিভিন্ন পশু বধ করার কথা উল্লেখ আছে। (দেখুন অধ্যায় ৩/২৬৮,২৬৯)

এর কিছু জায়গায় পরস্পর বিরোধ হওয়ার কারন মানতেই হবে যে এর কিছু মৌলিক এবং কিছু প্রক্ষিপ্ত; দুটি পারস্পরিক বিরোধপূর্ন বিষয় কোনো একক লেখকের হতে পারে না। কিন্তু প্রক্ষিপ্ততা এতেই সীমাবদ্ধ নয়। সময় সকল বস্তুকে প্রভাবিত করে। যে বাড়িটি তৈরি করা হয়, তা যতই আধুনিক হোক না কেন তাতে বায়ু, মাটি ও জলের কিছুটা প্রভাব পরে। প্রতিটি বাড়ির আকৃতি দেখে আমরা বলতে পারি যে সময়ে এটি কতটা পরিবর্তন হয়েছে।

প্রথমে পানির জন্য দেয়ালে দাগ পরে। তারপর বাড়ির কর্তা তা খোদাই করেন। তারপর বৃষ্টি আসে এবং কিছু অংশ ধুয়ে যায় এবং কিছু কালো দাগ পরে যায়। তারপর গৃহকর্তা চুনের আরেকটি সূক্ষ্ম প্রলেপ লাগান। এইভাবে প্রত্যেক দেয়াল ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। কখনও কখনও পুরানো ভঙ্গুর দেয়াল নতুন করে বানানো হয়। কিন্তু তারপরেও এটাকে মৌলিক দেয়াল বলা যায় না। এইসব আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত হলো প্রক্ষিপ্ততা। বইয়ের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। সাধারণ বিনোদনের বইগুলিতে মানুষ খুব কম হস্তক্ষেপ করে এবং তাও ইচ্ছাকৃত নয় তাদের প্রক্ষিপ্ততা এই প্রকারের হয়ে থাকে যে লেখকের অসাবধানতার কারনে কিছু শব্দ বিপর্যয় ঘটে বা কিছু পংক্তি একইরকম থাকে বা কোন কোন সময়ে উপরের অর্ধেক পংক্তি নিচের অর্ধেক পংক্তির সাথে মিলে যায়। কখনও কখনও একটি শব্দ বাদ গেলে, লোকেরা সংশোধনের উদ্দেশ্যে পেছন থেকে কিছু শব্দ যোগ করে। এভাবে বিকল্প আসতে থাকে। এইভাবে, প্রক্ষিপ্ততা যুক্ত হয় কিন্তু কারো ক্ষতি হয় না।

কিন্তু ধর্মীয় বইয়ের প্রক্ষিপ্ততা খুবই বিপজ্জনক।তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন, কোনো দেশে যখন ধর্মীয় সংঘাত হয়, প্রথমে ধর্মগ্রন্থের ওপর হামলা হয়। কোনো ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি। তারা প্রত্যেকেই বলে পূর্ব থেকে যা এসেছে তা আমি শুধু তাই বলি যা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান। এইকথা বলার পর দুই পক্ষ তৈরি হয় এবং শাস্ত্র উভয় পক্ষের হাতেই মোমের নাক হয়ে যায়। মনুস্মৃতির মতো গ্রন্থে এই জিনিসগুলো খুব সহজ ছিল। অনুষ্টুভ্ ছন্দ অতি সরল ছন্দ।

স্পষ্ট প্রক্ষিপ্ততার পরেও মনুস্মৃতির ভাষা জটিল নয়। দৈনন্দিন উদাহরণ ব্যবহারের বিষয়গুলো সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে। এতে মিশানো কঠিন ছিল না। উদাহরণ হিসেবে 'নিয়োগ'-এর কথাই ধরুন। যখন মানুষ কোনো কারণে নিয়োগ বন্ধ করতে চেয়েছিল, তখন কিছু শ্লোক তৈরি করে যুক্ত করে দিয়েছিল। এবং এর জন্য দুই একটি কারণও দিয়েছিলো। আমরা ইতিমধ্যে নিয়োগ সংক্রান্ত শ্লোক দিয়েছি। প্রথম কয়েকটি শ্লোক নিয়োগকে প্রামাণিক হিসাবে বর্ণনা করে। এরপরে বলা হয়েছে–

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্য দ্বিজাতিভিঃ। অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্মং হন্যুঃ সনাতনম্।। (৯/৬৪)

অর্থাৎ, দ্বিজদের বিধবা নারী অন্যের সাথে নিয়োগ করা উচিত নয়। এর অর্থ কি? বিধবাকে কি অন্য কুলে নিয়োগ না করে তার নিজের কুলে নিয়োগ করা উচিত? নাকি বিধবাদের নিয়োগ করা নিষেধ?সধবাদের বিশেষ পরিস্থিতিতে নিয়োগ করা উচিত? নাকি নিয়োগ কোন অবস্থায় কোন দ্বিজের জন্য বিহিত নয়? এই শ্লোক দ্বারা এই তিনটি নিষেধের কোনটি প্রতিপাদন করা হয়েছে? পরবর্তীতে একটি শ্লোক হলো–

নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্যতে ক্বচিৎ।
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ।।
(৯/৬৫)

অর্থাৎ, বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রগুলিতে নিয়োগের উল্লেখ নেই, বিবাহের আচার- অনুষ্ঠানে বিধবাকে পুনঃসংস্কারেও অনুমতি নেই। প্রথম শ্লোকের সাথে এই শ্লোকের সম্পর্ক কি? নিয়োগ যদি কোথাও এবং কোনোভাবে নির্ধারিত না থাকে, তাহলে উপরের ৯.৫৯ এর অর্থ কী হবে? যদি বলা হয় যে, এই শ্লোকে শুধু বলা হয়েছে নিয়োগ বা বিধবা অনুষ্ঠানের পদ্ধতি সাধারণ বিবাহ অনুষ্ঠানের থেকে আলাদা, তাহলে পরবর্তী শ্লোকগুলিতে 'পশুধর্ম' বলে কেন রাজা বেণ সময়কার অত্যাচার বলে উল্লেখ করা হয়েছে? এই থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রথমে একটি শ্লোক সন্নিবেশিত হয়েছিল।

অতঃপর প্রক্ষিপ্তকারী ব্যক্তি ধরা পরার ভয় পেয়ে প্রতিকার হিসেবে পরবর্তী শ্লোকটি যোগ করতে থাকেন। একইভাবে অন্যান্য প্রক্ষেপণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমে একটি সিদ্ধান্তের নিষেধাজ্ঞায় একটি শ্লোক যোগ করা হয়েছিল, একে আমরা আক্রমণ (Attack) বলতে পারি। অতঃপর তার বিরোধীরা মৌলিক সিদ্ধান্ত সত্যায়নে আরেকটি শ্লোক যোগ করে। এটাকে পাল্টা আক্রমণ (Counter- attack) বলা হয়। এভাবে আক্রমণ- পাল্টা আক্রমণে বিশৃঙ্খলায় অনেক স্থলে প্রক্ষিপ্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোথাও এমনও হয়েছে বিধি বা নিষেধের ব্যাখ্যার জন্য অতিরিক্ত প্রশংসায় শ্লোক যুক্ত করা হয়েছে, যা কোন উপযুক্ত ধর্মশাস্ত্রের মতো গ্রন্থে লেখা বলে মনে হয় না। এরকম অনেক জায়গায় রয়েছে। যেমন ব্রহ্মবিবাহের শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ করার জন্য লেখা হয়েছে এই প্রকারের উৎপন্ন হওয়া সন্তান পরবর্তী দশটি প্রজন্ম, পূর্ববর্তী দশ প্রজন্ম এবং বর্তমান - এই একুশ প্রজন্ম উদ্ধার হয়। ব্রহ্মবিবাহ যে শ্রেষ্ঠতম তার সন্দেহ নেই কিন্তু এর মানে এই নয় যে একুশ প্রজন্ম উদ্ধার হবে। যদি আমরা মনুস্মৃতির দিকে তাকাই তাহলে দেখব, প্রথমে গ্রাসে হি মক্ষিকাপাতঃ অর্থাৎ, প্রথম অধ্যায়ে বূহলার প্রক্ষিপ্ততার মুখোমুখি হয়েছে। বূহলার মহোদয় লিখেছেন–

The whole first chapter must be considered as a latter addition. No Dharma-Sutra begins with a description of its own origin, much less with an account of the creation. The former, which would be absurd in a Dharma-Sutra, has been added in order to give authority to a remodeled version. The letter has been dragged in, because the myths connected with Manu presented a good opportunity ‘to show the greatness of the scope of the work’ as Medhatithi says. (Introduction ixvi)

প্রথমে সম্পূর্ণ অধ্যায়কে শেষ থেকে মিলিয়ে বুঝতে হবে। যেকোনো ধর্মসূত্রই তার প্রস্থানের কাহিনি বা সৃষ্টি উৎপত্তি দিয়ে শুরু হয় না। প্রথমতঃ ধর্মসূত্রের জন্য একবারেই অনুপযুক্ত নতুন রূপ প্রমাণ সিদ্ধ করার জন্য দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত ধর্ষণের বিষয়টি প্রবেশ করানো হয়েছিলো যাতে মনু সম্পর্কিত যে কথা প্রসিদ্ধ হয়েছিলো সেই গ্রন্থটির মান বৃদ্ধি পায় যা মূলত মেধাতিথির বচন।

বূহলার মহোদয় সূত্র সম্পর্কে যা লিখেছেন তা বর্তমান সংহিতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রথম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে সৃষ্টি-উৎপত্তির বর্ণনা দেয়া হয়েছিলো তা "মনু- প্রজাপতি" অর্থাৎ ঈশ্বর এবং মানব ধর্মশাস্ত্রের লেখকের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে নারায়ণ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মনুকে কেবল মানব ধর্মশাস্ত্রেরই নয় সমগ্র বিশ্বজগতের পিতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং কবির প্রতিভা যখন একসময় উত্তেজিত হয়েছিল তখন তিনি কবিতার তরঙ্গে সব লিখেছিলেন।

যক্ষ, ঋক্ষ, পিশাচ, বিদ্যুৎ মেঘ, ইন্দ্রধনুক, কিন্নর, বানর, মৎস, কৃমি, কীট, পতঙ্গ সবই উৎপন্ন হয়েছে। এখানে কোনো সন্দেহ নেই যে এখানে অনেক উত্তম জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।

তা যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।।

(১/১০)

অর্থ- 'আপ' অর্থাৎ জলকে নরা বলা হয় কারণ তা পরমাত্মার পুত্র (তা নরাখ্যস্য পরমাত্মনঃ সূনবোSপত্যানি-ইতি কুল্লূকঃ)। এই জল যার অয়ন এইজন্য সেই ঈশ্বরের নাম নারায়ণ। কিন্তু পূর্বের সাথে সম্পর্ক কিছুই নেই। নারায়ণ শব্দটি আগের কোনো শ্লোকে ছিল না। তাহলে এর অর্থ বলার কি আবশ্যকতা ছিল? এতে, উপরোক্ত শ্লোক অণ্ড তেজস্বরূপ (তদণ্ডম্ভবদ্ধৈমং) হওয়ার বর্ণনা করা হয়েছে এবং দুটি শ্লোকের পর সেই অণ্ড দুই ভাগে ভাগ করার বর্ণনা রয়েছে। মাঝখানে নারায়ণ শব্দটা কোথা থেকে এলো তা বোধগম্য হয় না।

যদি বলা হয় যে ১/১২ শ্লোকে উল্লেখিত ভগবান নারায়ণের নাম সর্বব্যাপী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তবে তাও সঠিক নয় কারণ এর জন্য নারায়ণ শব্দের বিশেষত্ব সিদ্ধ হয় না। একইভাবে 'শরীর' শব্দটির অতি উত্তম শরীর শব্দের ব্যুৎপত্তি করা হয়েছে–

যন্ মূত্র্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।

তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূত্র্যিংমনীষিণঃ।।

অর্থাৎ তন্মাত্র, অহংকার প্রভৃতি ছয়কে আশ্রয় প্রদানের কারণে এই দেহের নাম হয়েছে। শরীর শব্দটি সাধারণত 'শৃ' ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ 'হিংসা' (শৃ হিসায়াং)। কিন্তু এখানে দেহ ও আশ্রয়ের মধ্যে ব্যুৎপত্তিগত সম্পর্ক রয়েছে, এদের মিশ্রন ন্যায়দর্শনের সূত্রে হয়েছে– চেষ্টেন্দ্রিয়ার্থশ্রয়ঃ শরীরম্।

এই শ্লোক এবং এই সূত্রে অবশ্যই কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। সূত্রাকারের মস্তিষ্কে 'শরীর' শব্দের সঙ্গে 'আশ্রয়' শব্দটির সম্বন্ধ থাকবে, এইরকম প্রতীয়মান হয়। সম্ভবত 'শৃ' ধাতুর 'আশ্রয়' অর্থও রয়েছে। এই ব্যুৎপত্তি অবশ্যই উত্তম কিন্তু প্রসঙ্গত নয়। 'নারায়ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি যেমন মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পরেছিলো, তেমনি 'শরীর শব্দটিও। না প্রসঙ্গ না ক্রম। আরও একটি বক্তব্য রয়েছে। সাধারণভাবে প্রতীয়মান হয় সাংখ্যে যে সৃষ্টি ব্যুৎপত্তির বিধান রয়েছে এখানে তাই বলা আছে। শ্রী শঙ্করাচার্যজী মনুকে প্রমাণ হিসাবে মানতেন, তাই কিছু ভাষ্যকার শেষ পর্যন্ত মনগড়া বেদান্তপরক সিদ্ধ করেছেন।

কিন্তু বাস্তবতা হলো সৃষ্টি- উৎপত্তির বর্ণনা সাংখ্য মতানুসারে নয়, ডাঃ ঝা- এর সাক্ষী বেদান্ত মতানুসারেও নয়। এমন কিছু গোলমাল আছে যে তা ভাষ্যকারদেরও বিরক্ত করে এমনকি মাথা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বিচার করেও বড় কোনো সমন্বয় সাধন করা যায় না। এটি এত দীর্ঘ গল্প যার বর্ণনা শুরু করলে বড় আকারে একটা বই হয়ে যাবে, তবে আমরা মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গঙ্গানাথ ঝা-এর নিম্নলিখিত উদাহরণ পর্যাপ্ত বলে মনে করি। ডাঃ মহোদয় মনুস্মৃতির (Manu- Smriti- Notes) দুই খণ্ডের ভাষ্য লিখেছেন যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মুদ্রিত হয়েছে। তিনি দ্বিতীয় খণ্ডে মনুস্মৃতি শ্লোক ১৪ এবং ১৫ এর উপর একটি দীর্ঘ নোট লিখেছেন। শ্লোকটি হল–

উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্। মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্।

মহান্তমেব চাত্মানং সর্বাণি ত্রিগুণানি চ।

বিষয়াণং গৃহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ।।

(মনু ১/১৪-১৫) ডাঃ ঝা এর টিপ্পনী এইরূপ-

The confusion regarding the account of the process of creation in Manu is best exemplified by these two verses. The name of the various evolutes have been so promiscuously used, thet the commentators have been led to have recourse to various forced interpretation, with a view to bring tha statement herein contained into line with their own philosophical predilections. Medha ., Kullu, Govi, and Ragh take it as describing the three prin ciples of the Sankhya-Mahat, Ahankara and Manad ; but finding that the production of Ahankara from Manas, or of Mahat (which is what they understand by the term 'Mahantam Atmanm') is not in conformity with the Sankhya doctrine.- they assert that the three evolutes have been mentioned here 'in the inverted.' Even so, how they can get over the statement that 'Ahankar' was produced 'from manas' , (Manasah') it is not easy to see. Similarly the 'atman' from which Manas is described as being produced, Medha explains as the Sankhya 'Pradhana' and Kulla, as the Vedantic 'Supreme solu.' Buhler remarks that according to Medha, by the particle 'cha' 'the subtle elements alone are to be understood.' This dose not represent Medha-correctly. His words being- Inorder to escape from the above difficulties Nandan has recurse to another method of interpretation- no less forced than the former. He takes 'Manas'as standing for mahat, and 'Mahantam Atmanam' as the Manas. Not satisfied with all this, Nandan remarks that the two verses uUnu dh lk{kh are not meant to provide an accurate account of the precise order of creation ; all that is meant to be shown is that all things were producedout of parts of the body of the Creator Himself.

এই উদাহরণের ভাবানুবাদ মনুতে সৃষ্টি-উৎপত্তির বর্ণনা নিয়ে বিভ্রান্তির সর্বোত্তম উদাহরণ হলো এই দুটি শ্লোক (১/১৪-১৫)। বিভিন্ন বিকৃতির নাম এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে, ভাষ্যকারদের নিজ নিজ ধর্মীয় সিদ্ধান্তের সাথে সৃষ্টির এই বর্ণনার সমন্বয় করতে অনেক মনগড়ার আবশ্যকতার হয়েছে। মেঘাতিথি, কুল্লূক, গোবিন্দরাজ এবং রাঘবানন্দের অভিমত যে এটি সাংখ্যের তিনটি উপাদান - মহৎ, অহংকার এবং মনকে বর্ণনা করে। কিন্তু এটি দেখা যায় সাংখ্য তত্ত্ব অনুসারে মন থেকে অহংকার বা মহৎ উৎপন্ন হয় না (মহান্তং আত্মানং হতে তিনি মহৎ অর্থ নিয়েছে), তাকে বলতে হয়েছে যে তিনটি বিকৃতিকে 'বিপরীত ক্রমে' বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপরও মন থেকে (মনস্) অহংকার উৎপন্ন হওয়া এই বাঁধা বোঝা সহজ নয়। একইভাবে 'আত্মা' থেকে মনের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে তা মেঘতিথির মতে সাংখ্যের 'প্রধান' এবং কুল্লূকের মতে বেদান্তিদের 'ব্রহ্ম'।

বৃহলারের বক্তব্য হলো মেঘাতিথির মতামত অনুসারে 'চ' দ্বার সূক্ষ্ম তত্ত্বই বোঝা উচিত। কিন্তু মেধাতিথির বক্তব্যের এই শুদ্ধ অনুবাদ নেই। মেধাতিথির শব্দটি ছিল- 'চশব্দেন বিষয়াংশ্চ শব্দস্পর্শ রূপরসগন্ধান্ পৃথিব্যয়দিনি চ'। এই অসুবিধাগুলি থেকে বাঁচার নিমিত্তে নন্দন ভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করে যা কম মনগড়া নয়। তিনি বলেন, 'মন' এর অর্থ 'মহৎ' এবং 'মহৎ' হলো আত্মার মন। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে নন্দন বলেন যে এই দুটি শ্লোকের উদ্দেশ্য বিশুদ্ধভাবে সৃষ্টির সঠিক ক্রম বর্ণনা করা নয়। তার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে ব্রহ্মার দেহের অবয়ব থেকে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হয়েছে। আমরা এই দীর্ঘ উদাহরণ এইজন্য দিয়েছি যাতে পাঠকগণ সৃষ্টি- ক্রম সম্পর্কে এই মনোরঞ্জক কিন্তু ভুল বর্ণনা বুঝতে পারেন এবং বৃহলারের বক্তব্যের সত্যতা বুঝতে পারেন যে মনগড়া এতকিছু যোগ করা হয়েছে।

আপনার দার্শনিক সিদ্ধান্ত যাইহোক না কেন আপনি এই সৃষ্টি-উৎপত্তি বর্ণনার আদি-অন্ত খুঁজে পাবেন না। যদি নন্দনের এই বক্তব্য সত্য হয় যে এই শ্লোকগুলির মূল উদ্দেশ্য কেবল ব্রহ্মার শরীর থেকে সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি দেখানো তবে এই উদ্দেশ্যটি দুটি শব্দে বা অর্ধেক শ্লোকেই সিদ্ধ হতে পারত।

এত শ্লোক বৃদ্ধি করে স্মৃতির আকার অকারণে বাড়ানো হলো কেন? পাঠকগণ যদি এই শ্লোকগুলো বারংবার পড়ে এবং পূর্বের প্রেক্ষাপটের সাথে মেলানোর চেষ্টা করেন তাহলে তাদের অবশ্যই গোলক ধাঁধার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই অধ্যায়ে আরেকটি স্থল রয়েছে যা উত্তম কিন্তু প্রক্ষিপ্ত প্রতীয়মান হয়। শ্লোক ৬১ থেকে মন্বন্তর নিয়ে ৭৩ পর্যন্ত মন্বন্তর, যুগ, সন্ধ্যা তথা সন্ধ্যাশের বর্ণনা রয়েছে যা সৃষ্টির উৎপত্তিকাল সম্পর্কে ভালো আলোকপাত করে। কিন্তু যে স্থানে এই বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে কালের কোন সংখ্যা উল্লেখ নেই।

এটি ৬১ তম শ্লোকটি–

স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়শ্যা মনবোSপরে।

সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ।।

(মনু০ ১/৬১)

অর্থাৎ, এই স্বায়ম্ভুব মনুর আরও ছয়টি বংশধর ছিল যারা তাদের নিজ নিজ প্রজা সৃষ্টি করেছিল। এই তত্ত্বের সত্যতা খুবই সন্দেহজনক। মন্বন্তর মানে এই নয় যে প্রতিটি মনুর শুরুতে সৃষ্টি উৎপন্ন হয় এবং শেষে বিনাশ এবং অন্য মনু তার প্রজাদের পুনরায় উৎপাদন করে। যেখানে সৃষ্টির কাল তথা ব্রহ্ম-দিন ও ব্রহ্ম-রাত্রি বর্ণিত আছে সেখানে মন্বন্তর ব্রহ্ম-দিন অর্থাৎ সৃষ্টির কালেরই ভিন্ন ভিন্ন ভাগ। আগে বলা হয়েছে–

ব্রাহ্মস্য তু ক্ষপাহস্য যৎ প্রমাণং সমাসতঃ।

একৈকশো যুগানাং তু ক্রমশস্তন্নিবোধত।।

(মনু০ ১/৬৮)

যেভাবে মনু শব্দটি কখনও মনুষ্য বাচক আবার কখনও ঈশ্বর বাচক তেমনি ‘মন্বন্তর’ শব্দে ‘মনু’ শব্দটি কালের একটি নির্দিষ্ট একক বাচক, কোনো পুরুষ- বিশেষের নয়। কালের একককে মানুষ মনে করে তার বংশধর নির্ধারণ করা এবং সেই বংশধরদের দ্বারা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমমূলক কল্পনা।

মনুর বংশধর মনুদের অর্থ কি? স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের মনুর স্বারোচিষ মন্বন্তর বংশ কিভাবে পরিণত হলেন? এটি কি শারীরিক বংশ পরম্পরা ছিল? এটি কি দ্বিতীয় মনু পুত্র, প্রপৌত্রের ধারাবাহিক ভাবে প্রথম মনুর বংশধর

ছিলেন? যদি থাকে তাহলে দ্বিতীয় মন্বন্তরের শুরুতে কি সবাই মারা গিয়েছিল, শুধুমাত্র একজন মনু রেখে গিয়েছিল যিনি প্রজা সৃষ্টি করেছিলেন, এবং এইভাবে পরবর্তী মন্বন্তরেও সবাই মারা গিয়েছিল, শুধুমাত্র একজন মনু বেঁচে ছিল?

যদি বলা হয় যে একটি মন্বন্তরের শেষে ধ্বংস হয় এবং অন্য মন্বন্তরের শুরুতে আবার সৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তাহলে ব্রহ্মদিনের অর্থ কি হবে কারণ প্রতিটি ব্রহ্মদিনে ১৪টি মন্বন্তর থাকতে হবে। বস্তুতঃ কথা হচ্ছে 'মনু' শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বিভ্রান্তি উৎপন্ন করে মনু দ্বারা প্রজা উৎপন্ন করা বিষয়টি মনগড়া।

১/৬২ শ্লোকে এ সাত মন্বন্তরের নাম গণনা করা হয়েছে–

স্বরোচিষশ্চৌত্তমশ্চ তামসো রৈবতস্তথা।

চাক্ষুষশ্চ মহাতেজা বিবস্বৎসুত এব চ।।

অর্থাৎ স্বরোচিষ, ঔত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত এবং প্রথম স্বায়ম্ভুব যার বর্ণনা আগে এসেছে, এখানে প্রশ্ন জাগে কেন পরবর্তী সাত মন্বন্তরের উল্লেখ করা হয়নি। এখানে বলা যেতে পারে যে মনুস্মৃতিতে শুধু অতীতের কথা বলা হয়েছে ভবিষ্যতের নয়। বর্তমানে বৈবস্বত মন্বন্তর রয়েছে, সেজন্য শুরু থেকে আজ অবধি মন্বন্তর গণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটি কোন সন্তোষজনক উত্তর নয়।

এখানে পুরানো ইতিহাস লেখার কথা নয় কালের বিভাগ দেয়ার কথা। এটি করার জন্য পরবর্তী যুগের নামগুলিও প্রয়োজন ছিল। এমনকি যদি বলা হয় যে শুধুমাত্র ইতিহাস দেওয়া হয়েছে তাও সঠিক নয়। কারণ যদি বর্তমান মন্বন্তর অর্থাৎ বৈবস্বত সম্পূর্ণ নতুন হয় এবং তাতে প্রজা নতুন করে উৎপন্ন করা হয়, তাহলে এই মনুস্মৃতিটি বৈবস্বত মনু দ্বারা তৈরি হওয়া উচিত ছিল স্বায়ম্ভুব মনুর নয়। এইরকম মানা হয় না। ১/৬৪ শ্লোকে কাল পরিমাণ এর জন্য ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম একক অর্থাৎ 'নিমেষ' থেকে শুরু হয়েছে এবং শেষে 'যুগ' পর্যন্ত বর্ণনা এসেছে।

এই ক্রমশঃ বর্ণনার পূর্বে হঠাৎ মন্বন্তরসমূহের নামগুলো কোথা থেকে এসে পরলো? ১/৭৩ শ্লোকে সময়ের বিভাগ বলার পর আকাশ, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদির উৎপত্তির বর্ণনা শুরু হয়। ১/৮১ থেকে ১/৮৬ শ্লোকে সময়ের বিভাগ বলার পরে পুনরায় আকাশ, বায়ু, অগ্নি ইত্যাদির উৎপত্তির বর্ণনা শুরু হয়। ১/৮১ থেকে ১/৮৬ শ্লোক পর্যন্ত সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভ্রমমূলক। কলিযুগকে হাস্যরসের যুগ বলে আখ্যায়িত করে এমন শিক্ষার বীজ বপন করা হয়েছে যা ভারতবাসীকে রসাতলে নিয়ে গেছে।

এই ভ্রম প্রতিটি ভারতবাসীর মস্তিষ্কে স্থির হয়ে গেছে যে কলিযুগে কোন উন্নতি হতে পারে না, ধর্মীয় জীবন একেবারেই গড়ে তোলা অসম্ভব। এটি তো কালের প্রভাব, এতে তাদের দোষ নেই। এই প্রবৃত্তি যে কতটা ভয়াবহ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ধর্মের সঙ্গে কালের বিভাগের সম্পর্ক কি? অনেকে বলেন যে মানুষ যেমন শীতকালে কম্বল মুড়ি দেয় এবং গ্রীষ্মে পাখা চালায় তেমনি সত্যযুগে সত্য ও ধর্মের জয় হয় এবং কলিযুগে তাদের হ্রাস হয়।

কিন্তু ধর্মের বৈশিষ্ট্য সার্বজনীন ও চিরন্তন এই মানুষগুলো মোটেও ভাবে না। কাল যদি ধর্ম ও অধর্মের মাত্রা নির্ধারণ করে, তাহলে মানুষ্য কি করবে? এবং কিভাবে তার কাজের সাথে সম্পৃক্ত স্বতন্ত্রতা বজায় থাকবে। মাত্র

তো হলো সিদ্ধান্তের কথা, কিন্তু যে ক্রম ভঙ্গের উপর আমি আলোকপাত করেছি তাতে স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে যে এগুলো সব প্রক্ষিপ্ত এবং অনেক সময় এই প্রক্ষিপ্ততা যা সঠিকভাবে তদন্ত করাও একটি কঠিন কাজ।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক

আপনার প্রকৃত বন্ধু কে?

একটি শহরে এক ব্যক্তি বাস করত। তার তিনজন বন্ধু ছিল। প্রথম বন্ধুর জন্য সে প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল। দ্বিতীয় বন্ধুকে নিয়ে তার ধারণা ছিল—'এ একদিন না একদিন কাজে লাগবেই'। আর তৃতীয় বন্ধুর প্রতি তার মনোযোগ ছিল খুবই সামান্য; সে কালেভদ্রে তার কথা ভাবত।

একদিন সেই ব্যক্তির জীবনে এক ভয়ংকর বিপদ নেমে এল। তার বিরুদ্ধে এক গুরুতর মামলা দায়ের হল, যার থেকে মুক্তির কোনো আশাই তার ছিল না। বিপদে পড়ে সে ছুটে গেল তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুর কাছে। সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। প্রিয়তম বন্ধু বলল—"বন্ধু, আমাদের মধ্যে অটুট বন্ধুত্ব থাকলেও এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তোমার ব্যক্তিগত। এতে আমি কিছুই করতে পারব না।"

এই প্রত্যাখ্যানে হতাশ হয়ে সে ছুটল দ্বিতীয় বন্ধুর কাছে। সেও তার কাহিনি শুনে বলল—"আমি তোমার পাশে থাকব, তবে কেবলমাত্র আদালতের বাইরে পর্যন্ত। আদালতের ভেতরে ঢোকার পর তোমাকেই একা লড়তে হবে।"

এই উত্তরেও আশাহত হয়ে সে গেল তৃতীয় বন্ধুর কাছে—যার কথা সে কমই মনে রাখত। তবু তাকে সে সব খুলে বলল। অবাক করার মতো ব্যাপার, সেই তৃতীয় বন্ধু এক মুহূর্তও দেরি না করে তার সঙ্গে চলল, আদালতেও প্রবেশ করল এবং তার পক্ষে মামলা লড়ল।

- বন্ধুগণ, জানেন কি এই তিন বন্ধু আসলে কার প্রতীক?

প্রথম বন্ধু—**ধন-সম্পদ**। মানুষ যে জিনিসটিকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। কিন্তু মৃত্যু এসে গেলে সেই ধন সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বন্ধু—**স্নেহের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব**। তারা কেবল মৃতদেহকে শ্মশানদ্বার পর্যন্ত নিয়ে যায়, কিন্তু তারপর কেউ সঙ্গ দেয় না।

তৃতীয় বন্ধু—**সৎকর্ম**। অর্থাৎ নিঃস্বার্থভাবে করা আমাদের সদগুণময় কর্ম। কেবল এই কর্মরাই আমাদের সঙ্গে যায়, মৃত্যুর পরেও। তারা আমাদের আত্মার পক্ষে "মামলা" লড়ে এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী জন্ম নির্ধারিত হয়। **ঋগ্বেদ ১.১৮১.৩**—এও এই কথাটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলা হয়েছে।

সেখানে বলা হয়েছে,

আ বাং রথোঽবনির্ন প্রবত্বান্ৎসৃপ্রবন্ধুরঃ সুবিতায় গম্যাঃ ।

বৃষ্ণঃ স্থাতারা মনসো জবীয়ানহম্পূর্বো যজতো ধিষ্ণ্যা যঃ ॥

এই শরীররূপী রথ যেন আমাদের সুন্দর, শোভন আচরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের শরীর যেন কখনো অশোভন কার্যকলাপে লিপ্ত না হয়। এই রথ সর্বদা গতিশীল হোক, ক্রিয়াশীল হোক, এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য হোক ঈশ্বরের সঙ্গে ঐক্য স্থাপন।

মানুষ সাধারণত জীবনে **ধন**কে সবচেয়ে বেশি মূল্য দেয়। তারপর আসে **পরিবার ও আত্মীয়স্বজন**। কিন্তু সে খুব কমই গুরুত্ব দেয় নিজের **কর্ম** ও **জীবনের পরম লক্ষ্য**-এর দিকে।

আমাদের সদা স্মরণে রাখা উচিত, এই শরীরের উদ্দেশ্য কেবল ধনের সংগ্রহ নয়, কেবল পরিবারবর্গের সেবাও নয়। এই সংসার নামক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও আমাদের উচিত সঠিক পথে সৎকর্ম করে যাওয়া, যেন আমরা **মোক্ষরূপী চূড়ান্ত আনন্দ ও শান্তি** লাভ করতে পারি।

সত্যিকারের বন্ধু কেবল সেই—যে আমাদের মৃত্যুর পরেও সঙ্গ দেয়।

আপনি কি জানেন, আপনার সেই প্রকৃত বন্ধুর পরিচর্যা আপনি আজই শুরু করতে পারেন?

আর্য সনাতন ধর্ম একদিন বিশ্বধর্ম হয়ে উঠবে

— রাজর্ষি শাহু মহারাজের ঐতিহাসিক ভাষণ

[সম্পাদনা: ড. বিবেক আর্য, দীপংকর সিংহ দীপ

১৯২০ সালের ৮ই মার্চ সৌরাষ্ট্রের ভাবনগরে সর্বভারতীয় আর্যসভার (আর্য সমাজ) এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার প্রধান অতিথি রাজর্ষি শাহু মহারাজ ভাষণ দেন। তাঁর বক্তব্যে তিনি স্বামী দয়ানন্দ মহারাজের জীবন ও কর্ম বর্ণনা করে বলেন যে, স্বামী দয়ানন্দ পুনঃনির্দেশিত বৈদিক সনাতন ধর্মই দেশকে জাগ্রত করতে সক্ষম, এবং এজন্য এই ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি জানান, তিনি নিজে বৈদিক সনাতন ধর্ম আত্মস্থ করেছেন এবং আশীর্বাদ দেন যে এই ধর্ম একদিন বিশ্বধর্ম হয়ে উঠবে।]

সজ্জনবৃন্দ,

আমরা যদি ভারতবর্ষের হাজার বছর আগের ইতিহাসের দিকে তাকাই, তবে আজকের ভারতের সঙ্গে সেই সময়কার ভারতের আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখতে পাব। আজ বীরত্ব, জ্ঞান, ধর্মীয় নিষ্ঠা, উদারতা – সব সদ্‌গুণ হারিয়ে গিয়েছে। হাজারো কুসংস্কার ও গোঁড়ামিতে আজকের ভারত পরিপূর্ণ। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, মদ্যপান, নারীশিক্ষার নিষেধ, বর্ণাশ্রমধর্মের অপব্যবস্থা – এসব সমাজকে নিঃসাড় করে তুলেছে।

উদাহরণস্বরূপ, বর্ণব্যবস্থার কথা ধরা যাক। ভারতে বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে ব্রাহ্মণবহির্ভূত জাতিগুলোর অবস্থা খুবই শোচনীয়। তাদের অগ্রগতি ও উন্নতির কোনো সুযোগই দেওয়া হয় না। আজ ২০তম শতাব্দীতেও [বর্তমানে একবিংশ শতাব্দী] কিছু মানুষ অচ্ছ্যুত বলে জীবন কাটাচ্ছেন, শুধুমাত্র তাদের জন্ম একটি নির্দিষ্ট জাতিতে হয়নি বলেই। সমাজে আজ কোথাও প্রেম, ঐক্য বা শ্রদ্ধা দেখা যায় না। এর মূলে রয়েছে আমাদের নিজেদের অজ্ঞতা।

ভারতে এমন মানুষও রয়েছেন যারা নিজের ভাইয়ের ছায়া গায়েও পড়তে দেন না। নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করা এই জাতিবাদী ব্রাহ্মণেরা নিচু জাতির উপর অত্যাচার করে। অথচ প্রাচীন ঋষিরা বলেছিলেন:

“ধর্মচ্যুত ব্যক্তি নিচু বর্ণে গমন করে এবং ধর্মাচরণকারী নিচু বর্ণের ব্যক্তিও উন্নত বর্ণে উত্তীর্ণ হতে পারে।” [ii] কিন্তু পরবর্তীকালে স্মার্ত-পৌরাণিক ব্যাখ্যায় “ব্রাহ্মণ জন্ম থেকেই ব্রাহ্মণ” – এই মত চালু হয় এবং জাতি ভিত্তিক বৈষম্য গড়ে ওঠে। তদুপরি, “স্ত্রী ও শূদ্রকে পড়তে দেওয়া যাবে না” এই মিথ্যা ধারণাকে “বেদমন্ত্র” [iii] বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। ফলত, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয় নারী ও শূদ্রদের। বহু সময় ধরে এই অবস্থা চলার ফলে শূদ্রেরা নিজেদের অচ্ছুত ভাবতে শুরু করে। এর ফলে ব্রাহ্মণদের সুবিধা হয়, তারা নিজেদের ব্রাহ্মণ্যত্বের ঠিকাদার বলে প্রতিষ্ঠিত করে।

আজকের ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই সাধুতা ও জ্ঞানের অভাবে জন্মসূত্রেই ব্রাহ্মণত্ব দাবি করে। তারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে শোষণ করে এবং পরলোকগতের ক্ষেত্রেও শ্রাদ্ধ ইত্যাদির নামে ভণ্ডামি বাড়িয়ে তোলে।

সজ্জনবৃন্দ!

যখন ব্রাহ্মণরা জাতির নেতা হয়ে স্বার্থপর হয়ে উঠেছিল, তখন থেকেই জাতীয়তাবোধ লোপ পায়। ঠিক সেই সময়, এই কাঁঠিয়াওয়ার অঞ্চলের মোরবি গ্রামে জন্ম নেন মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী। তিনি কঠোর তপস্যা করে, ভেদাভেদহীনভাবে বেদের প্রচার করেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সত্যপথে মানুষকে ফিরিয়ে আনেন। যদিও তাঁকে অনেক গালমন্দ ও আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তবু তিনি বিরত হননি। তাঁর প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণরা অস্থির হয়ে ওঠে, তাঁকে থামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদ থাকলে কেউ রুখতে পারে না। [iv]

মাত্র দশ বছরেই তাঁর প্রচারের ফলে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, রাজপুতানা, লাহোর, মধ্যপ্রদেশ জেগে উঠেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। উত্তর ভারত তো বটেই, সমগ্র ভারতেই অবৈদিক আচার পরিত্যাগ করে বৈদিক আচার পালন আবার শুরু হয়।

উদাহরণস্বরূপ, শাস্ত্র বলে:

“ব্রহ্মচর্য পালন করে কন্যা উপযুক্ত যুবককে বরণ করুক।” [v] “শূদ্রও ব্রাহ্মণ হতে পারে।” [vi]

আর্য সমাজ জাতিভেদ দূর করে, সামাজিক সমতা ও মানবিক গৌরব প্রতিষ্ঠা করে। বিদেশযাত্রা, যা আগে পাপ বলে বিবেচিত হতো, আজ গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর্য ধর্ম পূর্ণরূপে মানবসমাজের কল্যাণের জন্য উৎসর্গিত। উল্লেখযোগ্য যে, অনেক ইউরোপীয় নারী-পুরুষও এই ধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, লর্ড কিচনার, স্যার হেগ, লর্ড ফ্রেঞ্চ – এইসব যোদ্ধাদের ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি তারা আর্য সমাজের আদর্শ পালন করেছেন।

আমার বিশ্বাস, এই ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে প্রেম ও একতা গড়ে তুলবে। রাজা প্রতাপসিংহ, সজ্জনসিংহ প্রমুখ এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, যা গর্বের বিষয়। আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করব।

আমি রাজারাম কলেজ, হাইস্কুল, গুরুকুল, অনাথ আশ্রম, সরদার বোর্ডিং – সব আর্য প্রসারক সভার হাতে তুলে দিয়েছি, যাতে মানসিক পরিবর্তন সম্ভব হয়। আমি বিশ্বাস করি, মানসিক পরিবর্তনের চাবিকাঠি হলো জ্ঞান, আর সেই জ্ঞানের ধারক আর্য সমাজ।

আমার দায়িত্ব আমি শেষ করেছি। এখন দায়িত্ব আপনারা নিন। যদি এর পরেও আর্য ধর্মের প্রসার না ঘটে, তবে এর দায় আপনি এবং আর্য সমাজের প্রচারকগণ বহন করবেন। আমি চাই, কিছু সৎ কর্মবীর আমার মতো এই কাজে আত্মনিয়োগ করুন।

আজও আমরা বৈদিক-কর্মহীন। কিন্তু ঋষিরা শিক্ষিত সমাজে প্রেরণা দিচ্ছেন। সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান যেন বৈদিক নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

“যথেমাং বাচং কল্যাণীম্...” এই মন্ত্র [যজু০ ২৬।২] অনুসারে, আর্য সমাজ গুরুকুল, অনাথাশ্রম, কলেজ স্থাপন করে বেদবাণী প্রচার করছে। তবুও অনেকেই এখনও কর্মবীর হয়ে উঠতে পারেনি। এখন আর অলস বসে থাকার সময় নয় – এখন কাজ করার সময়।

আমাদের আচরণ শুরু হওয়া উচিত বৈদিক নিয়ম অনুসারে। আমরা যে গুণ ও কর্ম অনুযায়ী সমাজ গঠনের কথা বলি, তা এখন কাজে প্রমাণ করার সময় এসেছে।

আমি অনেক সময় নিলাম, কিন্তু আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন বলে ধন্যবাদ জানাই। এবং বিনীতভাবে আপনাদের বলতে চাই, যদি সত্যিই মহর্ষি দয়ানন্দের কাজ আপনাদের হৃদয় স্পর্শ করে, তাহলে এই পুণ্যভূমি থেকে যাওয়ার সময় প্রতিজ্ঞা করুন – আমরা বৈদিক আদর্শ ও নীতিকে জীবনে গ্রহণ করব এবং এতে এক বিন্দুও পিছপা হব না।

বন্ধুগণ!

সত্যমেব জয়তে ~ শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। এই বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে চলুন, প্রচার করুন ঋষিদের আদর্শ। ঈশ্বর আপনাদের শক্তি দেবেন, কারণ ঈশ্বর সবসময় সত্য কর্মীদের পাশে থাকেন।

টীকা:

[i] রাজর্ষি শাহু মহারাজ (২৬শে জুন, ১৮৭৪ খ্রি. – ৬ই মে, ১৯২২ খ্রি.) ভোঁসলে বংশের কোহলাপুরের রাজা ছিলেন। তিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারার বৈদিকধর্মী শাসক ছিলেন। তিনি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীজীকে তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি দলিত ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষালাভের জন্য বৃত্তি প্রদান করেন।

[ii] বর্ণব্যবস্থা গুণ ও কর্মের উপর ভিত্তি করে ছিল, অথচ জাতিভেদ প্রথা জন্ম ও কুলের উপর নির্ভরশীল। এই বিভাজন জাতিপ্রথা নামক বিষবৃক্ষের জন্ম দিয়েছে। বৈদিক যুগে ‘ব্রাহ্মণ’ পদবাচ্য ছিল এক আদর্শ, জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য, যা কালের প্রবাহে বিকৃত হয়ে এক অহঙ্কারী জাতিভেদবাদী ব্যক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে অপবিত্র হয়ে যায়।

[iii] চারটি বেদেই কোথাও কোনো মন্ত্রে নারীদের বা শূদ্রদের শিক্ষালাভ থেকে বিরত রাখার কোনো বিধি নেই। সুতরাং এই বেদবিরোধী বক্তব্যকে অসত্য ও মিথ্যা বলে পরিত্যাগ করতে হবে।

[iv] মহর্ষি দয়ানন্দ স্বামী লিখেছেন—

"বেদ পাঠ করার ও শ্রবণ করার অধিকার সকল মানুষেরই আছে। দেখো! গার্গী প্রভৃতি নারী এবং যজুর্বেদের ২৬তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় মন্ত্রে স্পষ্টভাবে লিখিত রয়েছে যে—বেদ পাঠ ও শ্রবণের অধিকার মনুষ্যমাত্রের জন্য সংরক্ষিত।"

[v] অথর্ববেদের [১১।৫।১৮] একটি স্পষ্ট বার্তা হলো—ব্রহ্মচর্য পালন করে কন্যা যেন পাত্র গ্রহণ করে। এখানে 'ব্রহ্মচর্য' শব্দের অর্থ হচ্ছে—'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বেদে 'চর' অর্থাৎ গমন, জ্ঞান বা প্রাপ্তি করা; অর্থাৎ বেদজ্ঞান অর্জনের পথ অনুসরণ।

[vi] বেদে শূদ্রদের জন্যও প্রীতিকর বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন প্রার্থনায় বলা হয়েছে—"হে পরমাত্মা! আপনি যেন আমাকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র এবং বৈশ্যদের প্রিয় করে তুলেন।" [অথর্ববেদ ১৯।৬২।১] আরও বলা হয়েছে—"হে পরমাত্মন! আপনি যেন আমাদের রুচি ব্রাহ্মণদের প্রতি, ক্ষত্রিয়দের প্রতি, বৈশ্যদের প্রতি এবং শূদ্রদের প্রতিও উৎপন্ন করেন।" [যজুর্বেদ ১৮।৪৬]

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

রাত্রিসূক্তম্ ঋগ্বেদ ১০.১২৭.১-৮

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত রাত্রি সূক্ত (১০.১২৭) একটি অনন্য কাব্যিক ও দার্শনিক বর্ণনা , যেখানে রাত্রিকে কেবল একটি প্রাকৃতিক ঘটনা নয় , বরং এক চেতন-সত্ত্বা , দেবী , রক্ষাকর্ত্রী ও স্নেহময়ী মাতৃরূপে চিত্রিত করা হয়েছে । এই সূক্তে রাত্রি আলোবিমুখ অন্ধকার নয় , বরং অন্ধকারের অন্তরালে থাকা গভীর শান্তি, সুরক্ষা ও নবজীবনের প্রতীক ।

ঋষি কুশিক এই সূক্তে রাত্রিকে 'দেবী ' রূপে আহ্বান করেন । যিনি সর্বত্র বিস্তৃত, নক্ষত্ররূপ নয়নের দ্বারা আমাদের পর্যবেক্ষণ করেন, আমাদের নিদ্রায় নিমগ্ন করে ক্লান্ত শরীরে প্রাণসঞ্চার করেন। এ যেন এক দৈনন্দিন পুনর্জন্মের অনুপম স্তোত্র । ঋগ্বেদের ১০.১২৭ সূক্তে রাত্রিকে একটি জীবন্ত সত্তা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে । তিনি শুধু অন্ধকার নন, বরং মমতাময়ী জননীরূপে অভিভাবিকা । তিনি আমাদের ঘুমে নিমজ্জিত করেন , তত্ত্বাবধান করেন এবং রক্ষা করেন। এখানে 'নিদ্রা' দার্শনিকভাবে একটি অস্তিত্বগত পুনর্গঠনের প্রতীকবি । যেমন মৃত্যু ও পুনর্জন্ম একটি চক্রও , তেমনি প্রতিদিনের ঘুম এক ক্ষুদ্র মৃত্যু , আর জাগরণ এক নতুন জন্ম । রাত্রি এখানে অন্ধকারের প্রতীক হয়েও নেতিবাচক নয় । তিনি আলোর বিরোধী নন , বরং আলোর পথ প্রস্তুতকারী । রাত্রি মানেই অন্তর্মুখীনতা , চিন্তন , রাত্রির 'নয়ন' হিসেবে নক্ষত্রের উল্লেখ এটি "বিশ্ববুদ্ধি" বা "চেতনা-সত্তার সর্বব্যাপী দৃষ্টি"র রূপক । রাত্রি যেন সর্বত্র চেতনা ছড়িয়ে একটি সচেতন নিরীক্ষিকা , আমাদের কাজ ও অস্তিত্বকে নিরবধি পর্যবেক্ষণ করছেন ।

রাত্রী॒ ব্য॑খ্যদায়॒তী পু॑রু॒ত্রা দে॒ব্য১॒॑ক্ষভি॑: । বিশ্বা॒ অধি॒ শ্রিয়ো॑ঽধিত ॥

[১] এই রাত্রি– আমাদের প্রশান্তিদায়িনী , আনন্দদায়িনী ।

(পুরুত্রা) যিনি সর্বত্র উপস্থিত থেকে পালন করেন , পূর্ণতা প্রদান করেন এবং সুরক্ষা করেন ।

(দেবী) ('দিব্' ধাতু থেকে নির্গত- ঘুম , আলোক) যিনি আমাদের নিদ্রার কারণ , আমাদের নিদ্রায় নিমগ্ন করেন । (আয়তী)যিনি সমাগত , উপস্থিত হচ্ছেন ।

(অক্ষভিঃ ব্যবখ্যত) যিনি নক্ষত্রস্বরূপ নয়নের দ্বারা আমাদের দিকে চেয়ে আছেন ।

যেমন মাতা শিশুকে স্নেহ ও যত্নের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেন , তেমনই এই দেবী রাত্রি আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন । নক্ষত্রসমূহই তাঁর নয়ন , যেগুলোর মাধ্যমে তিনি আমাদের নিরবিচারে রক্ষা ও তত্ত্বাবধান করেন ।

[২] এই রাত্রি আমাদের নিদ্রামগ্ন করে

(বিশ্বা শ্রিয়ঃ) — সমস্ত শক্তি , সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য

অধি অধিক — আমাদের দেহে প্রাচুর্যে ধারণ করান ।

রাত্রির নিদ্রার মাঝে ক্লান্ত দেহে পুনরায় সতেজতা ও প্রাণসঞ্চার ঘটে । নিঃশেষিত প্রাণশক্তি নতুন করে পূর্ণতা পায় । এইভাবে রাত্রি প্রকৃতপক্ষে আমাদের জন্য

পালনকর্ত্রী , পুনরুজ্জীবনদাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রীরূপে আবির্ভূত হন । ঘুমান্ত ব্যক্তি জেগে উঠে নিজেকে যেন নবপ্রাণবন্তরূপে অনুভব করে ।

ভাবার্থঃ রাত্রির নিদ্রা কেবল বিশ্রাম নয় , তা এক নবজীবনের উপহার । যার পরশে ক্লান্ত জীবন আবার প্রস্ফুটিত হয় , চেতনার পুষ্পপুঞ্জ আবার বিকশিত হয়ে ওঠে ।

ওর্ব॑প্রা॒ অম॑র্ত্যা নি॒বতো॑ দে॒ব্য১॒॑দ্বত॑: । জ্যোতি॑ষা বাধতে॒ তম॑: ॥

পদার্থ: [১] এই রাত্রি (অমর্ত্যা) = অদ্বিতীয় , অবিনাশী । এটি কখনো নষ্ট হয় না । দিন শেষ হলে আবার ফিরে আসে । রাত্রি দিন শেষে ঘুমিয়ে পড়ে , তারপর দিন শেষ হলে আবার জেগে ওঠে । এটি কখনো ধ্বংস হয় না । এটি (দেবী) = সবার স্বপ্নের কারণ [দিব্- স্বপনে] । যখন এটি আসে , তখন এটি (নিবত:) = পৃথিবীর নীচু স্থানগুলো , (উদ্বত:) = উচ্চ স্থানগুলো, গুহা, গর্ত ও পর্বতশিখরগুলোকে (আ) = চারপাশে , (উরু) = ব্যাপকভাবে বিস্তৃত আকাশকে পূর্ণ করে ফেলে । চারপাশে রাত্রির অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে ।

[২] এই রাত্রি এখন (জ্যোতিষা) = নক্ষত্রের আলো দিয়ে (তমঃ) = অন্ধকারকে কিছুটা তাড়িত করে। নক্ষত্রের আলো দ্বারা সেই অন্ধকার এত ভয়ানক হয়ে ওঠে না ।

ভাবার্থ - রাত্রির আগমন হয় এবং পুরো পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে পড়ে । এই অন্ধকার নক্ষত্রের আলো দ্বারা কিছুটা তাড়িত হয় , তবে এটি পুরোপুরি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে না ।

নিরু॒ স্বসা॑রমস্কৃতো॒ষসং॑ দে॒ব্যা॑য়॒তী । অপেদু॑ হাসতে॒ তম॑: ॥

পদার্থ: [১] এই (দেবী) = আমাদের স্বপ্নের কারণ রাত্রি [দিব্-স্বপনে] (আয়তী) = সর্বত্র চলমান , ক্রমশ এগিয়ে চলা , (স্বসারং উষসম্) = নিজের বোন উষার মতো লক্ষ্য রেখে (উ) = নির্দিষ্টভাবে (নিঃঅস্কৃত) = স্থান ছেড়ে দিয়ে রাত্রি শেষ হয় এবং উষা আসেন

[২] এই উষার আগমনে (ইৎ উ) = নির্দিষ্টভাবে (তমঃ অবহাসতে) = অন্ধকার ধ্বংস হয়ে যায় । বাস্তবে জীবনধারায় যে বিভ্রান্তি বা উত্তেজনার অভাব ছিল তা রাত্রির ঘুমের পর শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুনরায় ফিরে আসে । প্রভাববেলায় আমরা উঠি এবং নিজের মধ্যে সেই উদ্দীপনা পুনরায় অনুভব করি । এটাই অন্ধকারের ধ্বংসের অনুভূতি ।

ভাবার্থ: রাত্রি ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে উষার জন্য স্থান খালি করে দেয় , অন্ধকার ধ্বংস হয়ে যায় । ঠিক তেমনি , আমাদের জীবনে অনুৎসাহের অন্ধকারও নিঃশেষিত হয়ে , নতুন উদ্দীপনার আলোকিত প্রকাশ পুনরায় উজ্জ্বল হয় ।

সা নো॑ অ॒দ্য যস্যা॑ ব॒য়ং নি তে॒ যাম॒ন্নবি॑ক্ষহি । বৃ॒ক্ষে ন ব॑স॒তিং বয়॑: ॥

পদার্থ:[১] হে রাত্রি! (সে) = তুমি (আজ) = আজ (আমাদের জন্য) হও , (যার মাধ্যমে) তোমার (আগতিতে) = আমরা (নির্দিষ্টভাবে) আমাদের গৃহে প্রবেশ করি । ঠিক যেমন (পক্ষী) = পাখিরা (গাছের) = বৃক্ষের (উপরে) = তাদের বাসায় প্রবেশ করে ।

[২] রাত্রি আসে , এবং আমাদের কাজের মাঝে বিশ্রাম প্রদান করে । যদি রাত্রির নিয়মিত আগমন না হতো , তবে আমরা ক্রমাগত কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম । তাই রাত্রি সত্যিই আমাদের জন্য এক নীরব প্রশান্তি , আমাদের পুনঃপ্রাণিত করে ।

ভাবার্থ: রাত্রি আসে এবং আমাদের জীবনে বিশ্রামের সুযোগ সৃষ্টি করে , যাতে আমরা পুনরায় শক্তি ফিরে পেতে পারি । রাত্রির আগমন , ঠিক যেমন পাখিরা গাছের ডালে ফিরে আসে , আমাদের জন্য এক শান্তি ও পুনঃপ্রাণের অভ্যর্থনা ।

নি গ্রামা॑সো অবিক্ষত॒ নি প॒দ্বন্তো॒ নি প॒ক্ষিণ॑: । নি শ্যে॒নাস॑শ্চিদ॒র্থিন॑: ॥

পদার্থ: [১] রাত্রি সমাগত হলে

গ্রামাসঃ নিঅবিক্ষত: এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রাম , সমস্ত জনপদ ধীরে ধীরে নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করে , রাত্রির নিঃশব্দতায় নিমগ্ন হয় ।

পদ্বন্তঃ: দুই পায়ে গমনকারী মানবসমাজ হোক বা

চতুষ্পদঃ: চতুষ্পদ প্রাণীরা

সকলেই (নি) বিশ্রামের উদ্দেশ্যে নিজেদের আশ্রয়ে স্থিত হয় ।

পক্ষিণঃ: আকাশচারী পক্ষীরাও নিজেদের নীড়ে ফিরে যায় , নিদ্রার পরশে নিবিষ্ট হয় ।

[২]

শ্যেনাসঃ: অতি দ্রুতগামী , চঞ্চল , ধনলাভে প্রতিনিয়ত ছুটে চলা

অর্থিনঃ: ধনান্বেষী বণিকগণও ,

যারা চতুর্দিকে ছুটে বেড়ায় , এক স্থান হতে অপর স্থানে গমন করে , তর্পিত জীবনের উদ্দেশ্যে পরিশ্রমে লিপ্ত থাকে, তাঁরাও (চিত্) অবশেষে ক্লান্ত হয়ে নিজেদের আশ্রয়ে ফিরে আসে এবং নিদ্রায় নিমগ্ন হয় ।

ভাবার্থঃ রাত্রি— বিশ্রামের মহামন্ত্রণা।

সে জীবজগতের ক্লান্ত গাঁথা মোচনের এক অলৌকিক অধ্যায় । দিন যেমন কর্মের অবধি , তেমনি রাত্রি বিশ্রামের অবলম্বন । মানব , জন্তু , পক্ষী

ধনলোভী বহমান বণিক হোক বা নির্বাক পশু

সকল জীব এক সুরে নিদ্রার মন্ত্রে বাঁধা পড়ে ।

রাত্রি তাদের মাঝে এক মহামায়ার মতো নেমে আসে

শান্তি , পুনর্জীবন ও পুনরাবিষ্কারের প্রতীক হয়ে ।

যা॒বয়া॑ বৃ॒ক্যং১॒॑ বৃকং॑ য॒বয়॑ স্তে॒নমূ॑র্ম্যে । অথা॑ নঃ সু॒তরা॑ ভব ॥

[১] পূর্ববর্তী মন্ত্র অনুযায়ী রাত্রি বিশ্রামের সময় হলেও, যদি সে সময় হিংস্র পশুদের ভয় বা চোরদের ভয় থাকে, তবে সঠিকভাবে নিদ্রা নেওয়া সম্ভব নয় । তাই বলা হয়েছে , হে (উর্ম্যে) = রাত্রি! তুমি যে সমস্ত পৃথিবীকে অন্ধকারে আচ্ছাদিত করে দাও! [উর্ণুঞ্জ আচ্ছাদনে] (বৃক্যং বৃকম্) = শিয়াল ও বাঘ-ভেড়িদের (যাবয়া) = আমাদের থেকে দূরে রাখো। রাজা এভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক যাতে জনপদের কাছে এই হিংস্র পশুরা না আসতে পারে

। একইভাবে (স্তেনম্) = চোরকে (যবয়া) = আমাদের থেকে পৃথক করে দাও । রাত্রির রক্ষাকর্মীদের সঠিক ব্যবস্থার কারণে চোরদের ভয়ও দূর হয়ে যায় ।

[২] এইভাবে হিংস্র পশু ও চোরদের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, তুমি (নঃ) = আমাদের জন্য (সুতরাভব) = শরীরের রোগ ও মানসিক ঈর্ষা , দ্বেষ , ক্রোধ ইত্যাদি অসুখ-ব্যাধি থেকে আমাদের সুস্থ করে তোলো । রোগী যদি ঘুমায় , তবে তার অর্ধেক রোগ দূর হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি ক্রোধে অস্থির হয়ে থাকে , সে যদি ঘুমায় , তবে পরবর্তী দিন সে পুরোপুরি ক্রোধ মুক্ত হয়ে ওঠে । এই রাত্রি আমাদের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি থেকে মুক্তি দেয় ।

ভাবার্থঃ হিংস্র পশু ও চোরদের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে , আমরা সঠিকভাবে ঘুমাতে সক্ষম হই এবং শরীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার উপরে উঠে আসি ।

উপ॑ মা॒ পেপি॑শ॒ত্তম॑: কৃ॒ষ্ণং ব্য॑ক্তমস্থিত । উষ॑ ঋ॒ণেব॑ যাতয় ॥

[১] রাত্রে ঘুমিয়ে উষাকাল প্রভাতে যিনি জাগ্রত হন, তিনি উষাকে বলেন যে , এই (পেপিশৎ) = আমাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা , আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে (কৃষ্ণম্) = গভীর কালো (ব্যক্তম্) = চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া (তমঃ) = অন্ধকার , (মা উপ অস্থিত) = আমাকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করেছে যে , এ যেন আমার উপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করেছে ।

[২] হে (উষঃ) = উষা দেবী ! তুমি এই অন্ধকারকে এইভাবে (যাতয়) = আমার থেকে দূর করে দাও , (ইব) = যেমন ঋণদাতারা ঋণ পরিশোধ করে । উষাকালে উঠেও একজন মানুষ পিতৃ ঋণ পরিশোধের জন্য বড়দের প্রণাম , দেবযজ্ঞের মাধ্যমে দেব ঋণ মিটিয়ে এবং স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে ঋষি ঋণ মুক্ত হয় । একইভাবে উষা আমাদের সকল ঋণ থেকে মুক্তি দেয় । বলা হয় , তেমনই তুমি আমাদের এই রাত্রির অন্ধকার থেকেও মুক্তি দাও ।

ভাবার্থঃ যেমন উষা আমাদের ঋণ থেকে মুক্তি দেয় বড়দের প্রণাম , দেবযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে ঠিক তেমনি উষার মতো রাত্রির অন্ধকার থেকেও আমাদের মুক্তি প্রদান করো ।

উপ॑ তে॒ গা ই॒বাক॑রং বৃণী॒ষ দু॑হিতর্দিবঃ । রাত্রি॒ স্তোম॑ং॒ ন জি॒গ্যুষে॑ ॥

[১] হে (রাত্রি) = আমার প্রিয় রাত্রি ! (তেতপ) = তোমার কাছে পৌঁছে (গাঃ ইব) = এই রশ্মির মতো [গাঃ] (অকরম) = জ্ঞানের বাণীকে নিজের মধ্যে ধারণ করি । রাত্রির শেষ সীমা উষাকাল । এই উষাকালে যেমন আলোর রশ্মির শুরু হয় , তেমনই আমি এই মুহূর্তে নিদ্রার অবসান ঘটিয়ে জ্ঞানের বাণী গ্রহণ করতে প্রস্তুত ।

[২] হে (দ্বিহঃ দুঘিতঃ) = [দু পূরণকারী] আলোর পূর্ণতার সঞ্চারিকা! আমরা তোমার জন্য (স্তোমম্) = স্তুতির সমূহ উচ্চারণ করি । তেমনই উচ্চারণ করি (ন) = যেমন (জিগ্যুষে) = এক বিজয়ী পুরুষের জন্য স্তোত্র উচ্চারণ করা হয়। তুমি (বৃণীষ্) = সেই স্তোত্রের সঞ্চারিকা হবে । এই প্রভাতে আমরা স্তুতি উচ্চারণ করবো ।

ভাবার্থঃ রাত্রির সমাপ্তির পর , জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হয়ে আমরা স্তোত্রের উচ্চারণ করতে থাকব এবং জ্ঞানের বাণী অধ্যয়ন করব । এই সুচক থেকে বুঝা যায় যে , দিনের সমস্ত ক্লান্তি থেকে যদি আমরা ঘরেই নিরাপদ নিদ্রা উপভোগ করি , তবে আমাদের সব ইন্দ্রিয় আবার শক্তিশালী হয়ে ওঠে , এবং প্রভাতে জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা স্বাধ্যায়ে এবং স্তোত্রে দিন শুরু করতে পারব । যদি আমাদের দিন এভাবেই শুরু হয় , তবে আমরা 'বিহব্য'—বিশিষ্ট পূজা ও বিশেষ আহ্বানকারী—হই, এবং এই 'বিহব্য' এর পরবর্তী সুচক সেই বিশেষ প্রার্থনা করতে থাকে ।

✅[ভাষ্যকারঃ পণ্ডিত হরিশরণ সিদ্ধান্তালঙ্কার]

ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্তম্ মানব অস্তিত্বের এক অনবদ্য দার্শনিক অন্বেষণ । এখানে রাত্রি কেবল দৈহিক ক্লান্তির পর বিশ্রামের সময় নয় , বরং এক গভীর আধ্যাত্মিক বাস্তবতা যার আঁধারে লুকিয়ে থাকে প্রজ্ঞা , অনন্ততা ও আত্মপরিচয়ের আহ্বান । রাত্রি যেমন প্রতিদিন আমাদের চেতনার অন্তরালে ডুবিয়ে দিয়ে এক অন্তঃপ্রবাহের দিকে নিয়ে যায় , তেমনি ঋষি কুশিকও এই সূক্তম্-এর মাধ্যমে আমাদের মনে করিয়ে দেন যে সত্যের অন্বেষণ সবসময় আলোয় হয় না ; কখনো কখনো তা ঘটে নিস্তব্ধ , রহস্যঘেরা , নক্ষত্রবিন্দুতে উজ্জ্বল অন্ধকারের ভিতরেই। এই অন্ধকার ভয়ংকর নয় , কারণ রাত্রি নিজেই এক রক্ষা এক প্রশ্রয়–যেখানে আত্মা পুনর্প্রতিষ্ঠা পায় । এই উপলব্ধি আমাদের আহ্বান জানায় দৈনন্দিন জীবনেও রাত্রির মতো হয়ে উঠতে বিস্তৃত , গ্রহণশীল , ও আশ্রয়দাত্রী।

ঈশ্বরের উপাসনা কেন ? কখন ? কীভাবে ? না করলে কী হবে ?

■ **ঈশ্বরের উপাসনা কেন করবো ❓**

ঈশ্বরের উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে।

আত্মশুদ্ধি এবং মন ও ইন্দ্রিয়গুলির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে।

খারাপ সংস্কার নষ্ট করতে।

ঈশ্বরের প্রেরণায় ভালো সংস্কার সৃষ্টি করতে।

শুভ ও নিষ্কাম কর্ম করার অনুপ্রেরণা পেতে।

উত্তম আচরণ অনুসরণ করতে।

প্রাপ্য ঈশ্বরীয় গুণসমূহ অর্থাৎ সদ্‌গুণ অর্জন করতে।

ঈশ্বরীয় আনন্দ তথা মুক্তি লাভের জন্য।

জীবনে পরিপূর্ণতা অর্জন করে সন্তুষ্টি লাভের জন্য।

সব প্রাণীর প্রতি প্রেমের ভাবনা বজায় রাখতে ও জগতের কল্যাণ করতে।

■ **উপাসনায় সাফল্য লাভের জন্য সহায়ক পরিস্থিতিসমূহ:**

পূর্বজন্মের সংস্কার।

সত্য বিদ্যার জ্ঞান।

সাধুসঙ্গ।

তীব্র ইচ্ছাশক্তি।

প্রয়োজনীয় উপকরণের প্রাপ্তি।

উপাসনার সঠিক পদ্ধতি ও প্রাণায়ামের জ্ঞান।

পূর্ণ পুরুষার্থ অর্থাৎ প্রচেষ্টা ও সত্যাচরণ।

ঈশ্বরের স্তুতি-প্রার্থনা-উপাসনার নিয়মিত অভ্যাস।

যম-নিয়মের জীবনচর্চা।

উপযুক্ত পরিবেশ ও ভক্তসঙ্গ।

- **ঈশ্বরোপাসনার লাভ:**

শুভবুদ্ধি লাভ অর্থাৎ বুদ্ধির বিকাশ।

স্মরণশক্তির স্থিতি ও বৃদ্ধি।

জীবনের সব কর্মে একাগ্রতা।

আত্মশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় ও মন নিয়ন্ত্রণে রাখা।

ঈশ্বর, প্রকৃতি ও আত্মার সঠিক জ্ঞান লাভ।

জীবনে সর্বদা, প্রতিকূল অবস্থাতেও, প্রশান্তি বজায় রাখা।

ভালো সংস্কারের উদ্‌ভব ও নিষ্কাম কর্মে প্রেরণা লাভ।

বেদানুযায়ী শুভ আচরণ করে সকল প্রাণীর মানবাধিকার রক্ষায় অনুপ্রাণিত হওয়া, এবং চিন্তাদূষণ থেকে মুক্তি লাভ।

পাপকর্ম থেকে দূরে থাকার স্বভাব গড়ে ওঠা।

ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি এবং ঈশ্বরীয় আনন্দ তথা ঈশ্বরকে লাভ করে মুক্তি প্রাপ্তি।

শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করার শক্তি লাভ।

দীর্ঘায়ু লাভ।

অর্থদান ও সময়দান করার প্রবৃত্তির বিকাশ।

- **ঈশ্বরোপাসনা বৈদিক পদ্ধতিতে না করার ক্ষতিসমূহ:**

নিজের আচরণে অন্যদের কষ্ট দেওয়া।

কৃতজ্ঞতার অভাব থাকা।

ইন্দ্রিয় ও মন-এর দাস হয়ে পড়া।

বৈদিক ও ধর্মীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে বুঝতে অপারগ হওয়া।

প্রতিকূল পরিস্থিতি ও দুঃখ সহ্য করতে না পারা।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে না রাখা।

উপাসনা দ্বারা অর্জিত ঈশ্বরীয় গুণ—বিশেষ জ্ঞান, বল, আনন্দ, নির্ভয়তা, স্বাধীনতা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত হওয়া।

জীবনের সমস্যাগুলোর সঠিক সমাধান করতে না পারা ও ফলস্বরূপ দুঃখী হওয়া।

যম-নিয়মের পালন করতে না পারা।

পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে না পারা।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

রামনবমী কি বহিরাগত সংস্কৃতি ? বাংলার লোকঐতিহ্যে শ্রীরামচন্দ্র

বাঙালি সনাতনীদের মধ্যে একটি আশ্চর্যজনক স্বভাব আছে। তা হলো না জেনে অতি আত্মবিশ্বাস। ইদানীং রাজনৈতিক মতবাদের কারণে হোক কিংবা তথাকথিত উদারপন্থী সাজার জন্যই হোক বাঙালি সনাতনী গৃহসম্ভূত রাজপুত্র-রাজকন্যাদের মধ্যে NOH (Name Only Hindu~নাম সর্বস্ব হিন্দু) হওয়া সত্ত্বেও সনাতন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কীভাবে পালিত হবে না হবে সেই বিষয়ে মতামত দেওয়ার অনধিকার চর্চা করার চেষ্টা করেন। যদিও এই চর্চার অধিকাংশই অহিন্দু পক্ষ তোষণের জন্য সেটা সহজেই বোঝা যায়। আমাদের তাদের তোষণ-লেহন-বমন কোনোটি নিয়েই খুব একটা মাথাব্যথা ছিলো না, যখন না তারা মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণীয় জন্মতিথি পালনকে কাল্পনিক ও বহিরাগত সংস্কৃতি বলে আখ্যায়িত করা শুরু করেন। স্বভাবতই তাদের এই বামৈল্লামিক মতবাদপুষ্ট এবং সারবত্তাবিহীন। আমাদের মন্তব্য দুটি -

ক. যদি আপনি শ্রীরামচন্দ্র ও সনাতন ধর্মে আস্থাশীল না হন তবে তারা কোন অনুষ্ঠান বা উৎসব কীভাবে পালন করবে না করবে সেটা নিয়ে অকালে চুল পাকানোর কোন দরকার নেই।

খ. যদি আপনি বিশ্বাস করেন তাদের অস্তিত্ব ছিলো তবে কীভাবে কী পালিত হবে সেটা জেনে বুঝে, পারিপার্শ্বিক দিকে বুঝে তারপর মতামত দিন।

ধর্মীয় কৃত্য হিসেবে রামনবমী পালনের সামান্য কিছু প্রমাণ দেই-

১. পুরোহিত দর্পণ,পৃষ্ঠা ৩২৬

২. পুরোহিত সর্বস্ব, পৃষ্ঠা ৩৩১

৩. ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫৭

এবং এই ৩টি গ্রন্থ যথাক্রমে ১৩৪০, ১৩১৩, ১৩১৭ বঙ্গাব্দে রচিত। অর্থাৎ এই গ্রন্থের শ্রীরামনমবী পালনের যে বিধি দেখা যায় তখন বর্তমান নবীন সমালোচকদের বাবার জন্ম তো দূরে থাক, তাদের দাদুর বিয়েও হয়েছিলো কিনা সন্দেহ আছে। আর তারা করতে আসে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কিনা এই নিয়ে মত দিতে ? হাসালেন। না জেনে কথা বললে লোকে বোকা বলে, আর জেনে বুঝেও একগুঁয়ে হলে তাকে বলা হয় অসৎ। আপনি নিজেও যে অডিয়েন্সকে খুশি রাখতে চান তাদের প্রতিটি ধর্মীয় উৎসব পালনে ক্রমবিবর্তন, ক্রমবিকাশ ও নানা পরিবর্তন মেনে নিয়েছেন। একইভাবে জন্মাষ্টমী, বিজয়াদশমী, দীপাবলী সবই কালের বিবর্তনে শাস্ত্রীয় কৃত্যের বাইরে উদ্‌যাপনের অংশটি পরিবর্তিত হয়েছে। এটা সামাজিক অনুষ্ঠানের বেলাতেও আমরা দেখি। গায়ে হলুদ, মেহেদী কিংবা বৌভাত অনেক গোষ্ঠীতে না থাকলেও তারাও এগুলো গ্রহণ করেছে। তার মানে পরিবর্তন অস্বাভাবিক না বরং মূলভাব অক্ষুন্ন রেখে উৎসব-আনন্দ পদ্ধতির পরিবর্ধন স্বাভাবিক ব্যাপার। তাহলে অহেতুক অন্য কোন দেশ বা বিচ্ছিন্ন বিষয় সম্পর্কে অপতথ্য দিয়ে রামনবমীর বিরোধীতা করার কী দরকার ? এখন আপনি বলতেই পারেন শ্রীরামের জয়ধ্বনি কিংবা এই দিবস নানা 'উগ্র' (?) ভাবে পালিত হয়। প্রশ্ন হলো, এই উগ্রতা কাকে বলে তার মানদণ্ড নির্ধারণ করে দেওয়ার আপনি কে ? সারাবছর সমাজের প্রতিটি স্তরে যখন সনাতনীদের অবজ্ঞা, অপমান কটাক্ষ হয় তখন আপনারা নীরব থাকেন, বড়জোর বললে বলেন 'এরা প্রকৃত অমুক না'। এই একই যুক্তি সনাতনীদের (যদিও সনাতনীরা করে না এমন ধর্মীয় বিধি হিসেবে) বেলায় কেন থাকে না ? শ্রীরামচন্দ্র কোন

রাজনৈতিক দল বা ভূখণ্ডের আওতাধীন না, তিনি সর্ব সনাতনীর। তাহলে কেন তাকে রাজনৈতিক বেড়াজালে আটকানোর এই কুৎসিত প্রচেষ্টা ।

যদি আপনি বলেন 'জয় শ্রীরাম' রাজনৈতিক শ্লোগান তবে আমরাও তো দেখাতে পারি যে রামায়ণে সুন্দরকাণ্ডেও (৪২.৩৩) শ্রীরামের নামে জয়ধ্বনি আছে 'জয়ত্যতিবলো রামো' । ১৮৭০ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং ২৭ ও ১৮৬১ সালে H.H. Wilson রচিত Religious sects of Hindus বইতে শ্রী সম্প্রদায়ের উপশাখা ১৪ শতকের রামানন্দী সম্প্রদায়ের অভিবাদন শব্দরূপে 'জয় শ্রীরাম' উল্লেখ পাওয়া যায় । নিশ্চয়ই ৬-৭শ বছর আগে রাজনৈতিক কারণে এই শব্দগুচ্ছ তৈরি হয়নি, কিংবা অক্ষয় কুমার দত্ত বা উলসনকেও কেউ টাইমমেশিনে গিয়ে জানিয়ে আসেনি । তাই " 'জয় শ্রীরাম' আধুনিক রাজনৈতিক উদ্ভাবন " - এটি সম্পূর্ণ ভুল বক্তব্য। তবে এই কাজের কারণ কী? উত্তরটা খুবই সোজা - আপনারা হিপোক্রিট, চরম মাত্রায় অসৎ চরিত্রের। আর বাঙালি সংস্কৃতি চেনাচ্ছ মামণি-বাবারা ? পড়ো ৬০০+ বছর আগের চতুর্দশ শতকের-

রামজয় শব্দ করে ধাইল বানর।
বানর দেখিয়া রোষে যত নিশাচর॥
রামজয় শব্দ করে যতেক বানরে ।
অন্ধকার ক'রে ফেলে বৃক্ষ ও পাথরে ।।
কৃত্তিবাসী রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ২৫২৬,২৫৫০

এই মাটি কৃত্তিবাসের, এই মাটি শ্রীরামচন্দ্রের, এই মাটিতে সমান অধিকার ভূমিপুত্র সনাতনীদের । শ্রীরামনবমী পালিত হবে। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বাংলার রক্তে মিশে আছেন। আপনি নিজে বহিরাগত হতে পারেন, তাদের নগ্ন সমর্থন করতে নিজের অস্তিত্বকে হেয় করতে পারেন, আমরা না। আমাদের মেরুদণ্ড এখনো আছে। রাজনৈতিক ও খ্যাতির লালসায় মানুষের ভক্তি, শ্রদ্ধাকে আঘাত করার কোনো অধিকার আপনাদের নেই। তাই যতদিন চন্দ্র-সূর্য থাকবে ততদিন বলবো -

এক ধ্বনি এক নাম
জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম
© বাংলাদেশ অগ্নিবীর
সত্য প্রকাশে নির্ভীক সৈনিক

শঙ্করাচার্য কি স্ত্রী – শূদ্রের বেদাধিকার মানতেন ?

উত্তরঃ না মানতেন না । প্রমাণসমূহ নিম্নরূপ -

শূদ্রের বেদাধিকার নেই । শূদ্র বেদ শ্রবণ করলে তার কানে সীসা ঢালতে হবে ও বেদ আয়ত্ত করলে তার শরীর খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলতে হবে ।

১। ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৩৮ ভাষ্যে -

ইতশ্চ ন শূদ্রস্যাধিকারঃ যদস্য স্মৃতেঃ শ্রবণাধ্যযনার্থপ্রতিষেধো ভবতি। বেদশ্রবণপ্রতিষেধঃ বেদাধ্যযনপ্রতিষেধঃ তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্যতে। শ্রবণপ্রতিষেধস্তাবৎ অথ হাস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণম্ ইতি পদ্যু হ বা এতচ্ছমশানং যচ্ছূদ্রস্তস্মাচ্ছূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যম্ ইতি চ। অত এবাধ্যযনপ্রতিষেধঃ যস্য হি সমীপেঽপি নাধ্যেতব্যং ভবতি স কথমশ্রুতমধীয়ীত। ভবতি চ বেদোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদঃ ধারণে শরীরভেদ ইতি। অত এব চার্থাদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধো ভবতি ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ ইতি দ্বিজাতীনামধ্যযনমিজ্যা দানম্ ইতি চ। যেষাং পুনঃ পূর্বকৃতসংস্কারবশাদ্বিদুরধর্মব্যাধপ্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তিঃ তেষাং ন শক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিষেদ্ধুম্ জ্ঞানস্যৈকান্তিকফলত্বাৎ। শ্রাবয়েচ্চতুরোবর্ণান্ ইতি চেতিহাসপুরাণাধিগমে চাতুর্বর্ণ্যস্যাধিকারস্মরণাৎ। বেদপূর্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতম্॥

অনুবাদঃ আর এইহেতুবশতঃও শূদ্রের [শ্রৌত ব্রহ্মবিদ্যাতে] অধিকার নাই, যেহেতু স্মৃতিবাক্যবলে ইহার 'শ্রবণ, অধ্যয়ন ও অর্থের প্রতিষেধ আছে । [ইহাই পরিষ্কার করিতেছেন—] শূদ্রের পক্ষে বেদশ্রবণের প্রতিষেধ, বেদাধ্যয়নের প্রতিষেধ এবং তাহার অর্থজ্ঞান ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের প্রতিষেধ স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত হইতেছে। শ্রবণের প্রতিষেধ এইপ্রকার—"আর সমীপবর্ত্তিস্থান হইতে [বুদ্ধিপূর্ব্বক] বেদশ্রবণকারী ইহার (শূদ্রের) কর্ণবিবর ত্রপু (—সীসক) ও জতুর (গালার) দ্বারা পরিপূরণরূপ প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য" [গৌ০ ধ০ ১২।৪] এবং "এই যে শূদ্র, ইহা নিশ্চয় চলমান শ্মশান, সেইহেতু শূদ্রের নিকট বেদাধ্যয়ন করিবে না", [বশি০ ১৮] ইত্যাদি। এইহেতুবশতঃই (– বেদশ্রবণের নিষেধবশতঃ ই) বেদাধ্যয়নের প্রতিষেধ সিদ্ধ হয়, কারণ যাহার সমীপেও [বেদ] অধীত হওয়া উচিত নহে, সে কি প্রকারে [গুরুর মুখে] শ্রবণ না করিয়া [বেদ] অধ্যয়ন করিবে ? আর বেদোচ্চারণ করিলে [শূদ্রের] জিহ্বাচ্ছেদন এবং ধারণ (অভ্যাসদ্বারা আয়ত্ত, - স্বয়ম্ উচ্চারণ) করিলে শরীরভেদ (-পরশুদ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন"), ইত্যাদি স্মৃতিবচন [গো০ ধ০ ১২।৪ ল] আছে। আর এইহেতুবশতঃই (— অধ্যয়ন ও অভ্যাস নিষিদ্ধ হওয়ায়) অর্থাপত্তিবলে [শূদ্রের পক্ষে] বেদার্থজ্ঞান ও [তদনুযায়ী] অনুষ্ঠানের প্রতিষেধ [সিদ্ধ] হয়। [সাক্ষাদ্ভাবেও বেদার্থজ্ঞানের প্রতিষেধ আছে, যথা—] "শূদ্রকে মতি দান করিবে না" [মনু০ ৪।৮০] এবং "বেদাধ্যয়ন যজ্ঞ ও দান দ্বিজাতিগণের জন্ম বিহিত", [গো০ ধ০ ৯।১] ইত্যাদি ।[আর যে বিদুর প্রভৃতির জ্ঞানোৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে (১/৩/৩৪ সূঃ ৭ বাক্য), তদুত্তরে বলিতেছেন-] কিন্তু বিদুর ও ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি ভাষ্যানুবাদ যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত সংস্কারবলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, তাঁহাদের [মোক্ষরূপ] ফল প্রাপ্তির প্রতিষেধ করিতে পারা যায় না, যেহেতু জ্ঞানের ফল অবশ্যম্ভাবী। [বেদমূলক বিস্তাতে অধিকার না থাকিলেও ইতিহাস ও পুরাণমূলক (স্মৃতিমূলক) বিজ্ঞাতে শূদ্রের অধিকার।] আচ্ছা, সিদ্ধ শূদ্রের ফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হইলেও সাধক শূদ্রের জ্ঞানলাভ কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] আর "চারিবর্ণকে শ্রবণ করাইবে" , এইপ্রকারে ইতিহাস ও পুরাণের জ্ঞানলাভে চারিবর্ণেরই অধিকার স্মৃতিতে বর্ণিত হওয়ায়, "সেই সকল হইতেই তাহাদের জ্ঞানোৎপত্তি হইবে"। [তাহা হইলে শূদ্রের কোন বিষয়ে অধিকার নিবারিত হইতেছে ? তাহা বলিতেছেন-] কিন্তু ? বেদপূর্ব্বক [জ্ঞানোৎপত্তিতে] শূদ্রগণের অধিকার নাই, ইহা নিশ্চিত হইল ।

উপনিষদের কন্যার পাণ্ডিত্যের কথা থাকলেও শঙ্করাচার্য তা ঘরের কাজের পাণ্ডিত্য বলেছেন কেননা বেদে অধিকার নেই ।

২। বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬।৪।১৭

দুহিতুঃ পাণ্ডিত্যং গৃহতন্ত্রবিষয়মেব, বেদেঽধিকারাৎ ।

অনুবাদঃ দুহিতার পাণ্ডিত্য কথায় গার্হস্থ্য - শাস্ত্রবিষয়ক বিদ্যাই বুঝিতে হইবে । কারণ , স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই।

শূদ্রের বেদাধিকার নেই এটি তার গীতা ভাষ্যেও স্পষ্টভাবে বলেছেন ।

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।৪১

ব্রাহ্মণাঃ চ ক্ষত্রিয়াঃ চ বিশঃ চ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশঃ তেষাং 'ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ ' শূদ্রাণাম্ অসমাসকরণম্ একজাতিত্বে সতি বেদানধিকারাৎ ।

অনুবাদঃ ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এবং বিশ (বৈশ্য)= ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশ, তাদের =ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশদের এবং শূদ্রদের— । এখানে ব্রাহ্মণাদির সহিত শূদ্রদের সমাস করা হয় নি; তার কারণ, তারা একজাতি, হওয়াতে (অর্থাৎ উপনয়নের দ্বারা দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্তি না হওয়ায়) বেদে তাদের অনধিকার ।

গীতার ব্যাখ্যা বলেছেন - স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য এদের জন্ম হলো পাপ । তাই এরা পাপযোনী ।

৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৯।৩২

মাং হি যস্মাৎ 'পার্থ ব্যপাশ্রিত্য' মাম্ আশ্রয়ত্বেন গৃহীত্বা '। ' যে অপি স্যুঃ' ভবেয়ুঃ পাপযোনয়ঃ পাপা যোনিঃ যেষাং তে পাপযোনয়ঃ পাপজন্মানঃ। কে তে ইতি? আহ ' স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ তেপি যান্তি গচ্ছন্তি 'পরাং গতিং' প্রকৃষ্টাং গতিম্ ।

অনুবাদঃ হে পার্থ ! যারা পাপযোনিও হয়ে থাকে—পাপযোনি অর্থাৎ পাপজন্ম যাদের তারা পাপযোনি অর্থাৎ পাপজন্মা।, —তারা কে? তাই বলেছেন, স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রেরা ; আমাকে আশ্রয়ত্বরূপে গ্রহণ করায় তারাও পরাগতি অর্থাৎ প্রকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়।

অলমিতি

ঘোর ঘন জঙ্গলে.....

এক ভয়ঙ্কর অরণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এক পথ হারানো মানুষ প্রবেশ করল। সে পথ খুঁজে পেল না। হঠাৎ দেখতে পেল, বনে সিংহ, চিতা, ভালুক, হাতি আর নানা হিংস্র জন্তু গর্জন করছে। আতঙ্কে তার হাত-পা কাঁপতে লাগল। সে না দেখেই দৌড়াতে লাগল।

দৌড়াতে দৌড়াতে এক জায়গায় এসে পৌঁছাল। দেখল, সেখানে পাঁচটি বিষধর সাপ ফণা তুলে ফুঁসছে। সাপগুলোর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক বৃদ্ধ। হঠাৎই একটি সাপ সেই বৃদ্ধের দিকে ধেয়ে এল, তখন মানুষটি আবার দৌড়ে পালাল।

শেষমেশ দম নিতে নিতে সে পড়ে গেল এক গভীর গর্তে, যেটি ঘাস আর গুল্মে ঢাকা ছিল।

সৌভাগ্যক্রমে, এক বড় গাছের ডাল তার হাতে এসে পড়ল। সে সেই ডাল ধরে ঝুলে থাকল। তখন সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখে, একটি বিশাল অজগর হাঁ করে বসে আছে। দৃশ্যটি দেখে তার আত্মা শুকিয়ে গেল। সে ডালটি শক্ত করে ধরে থাকল, যেন পড়ে গিয়ে অজগরের মুখে না পড়ে।

কিন্তু যখন সে উপরের দিকে তাকাল, তখন দেখল— সেই গাছটি ঝাঁকাচ্ছে একটি ছয়-মুখো হাতি। আর যেই ডাল ধরে সে ঝুলে আছে, সেটি কেটে ফেলছে এক সাদা ও এক কালো ইঁদুর। ভয়ে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে তার ঠোঁটে পড়ল মধুর এক ফোঁটা।

সে ওপরে তাকাল— দেখল, গাছের ওপরের ডালে মৌচাক। সেখান থেকেই ধীরে ধীরে মধু ঝরে পড়ছে। সেই মধুর স্বাদ পেতে পেতে সে ভুলে গেল নিচে অপেক্ষমাণ অজগরের কথা।
সে ভুলে গেল যে, ছয়-মুখো হাতি গাছটিকে কাঁপাচ্ছে।
সে ভুলে গেল, যে ডাল সে ধরে ঝুলছে, সেটিকে দুইটি ইঁদুর কেটে চলেছে।
সে ভুলে গেল, চারপাশে হিংস্র জানোয়ার গর্জন করছে, সে আছে এক বিভীষিকাময় অরণ্যে।

- কোন অরণ্য এটি ? কে সেই দুর্ভাগা মানুষ, যে এমন ভয়ানক অরণ্যে পড়ে এভাবে বিপদে জড়িয়েছে?

— এই সংসারটাই সেই অরণ্য। মানুষই সেই হতভাগ্য, যে এই সংসারে প্রবেশ করে নানা দুর্ভোগ ও রোগ-শোকের হিংস্র পশুদের সম্মুখীন হয়। এখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আর অহংকার— এই পাঁচ বিষধর সাপ ফণা তুলে ফুঁসছে।

এখানেই বাস করে সেই বৃদ্ধ, যার নাম বার্ধক্য— যে রূপ ও যৌবনকে নিঃশেষ করে দেয়। তাদের ভয়ে মানুষ দৌড়োয়। সেই ডাল, যা তার হাতে আসে, তাকে বলে 'জিজীবিষা' অর্থাৎ বেঁচে থাকার ইচ্ছা। সে ডাল ধরে ঝুলে থাকার সময় সে দেখে নিচে অপেক্ষা করছে মৃত্যু-রূপী অজগর— যার গ্রাস থেকে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায়নি। না কংস, না রাবণ, না রাজা, না মহারাজা, না ধনী, না দরিদ্র— কেউই কালের এই সাপকে এড়াতে পারেনি।

আর যেই ছয়-মুখো হাতি গাছটিকে কাঁপাচ্ছে, সে হলো বছর— ছয়টি ঋতুই তার মুখ। সারা বছর ধরে সে জীবনবৃক্ষটিকে নাড়া দেয়।

আর যে দুটি ইঁদুর গাছের ডাল কাটছে— তারা হল রাত্রি ও দিন।
এই দিন ও রাতই মানুষের জীবনকে প্রতিনিয়ত ক্ষয়ে দিচ্ছে।

তবুও, কিছু সুখ, কিছু ভোগ, কিছু আনন্দের মধুবিন্দু— মানুষকে এতটাই মোহাচ্ছন্ন করে রাখে, যে সে সমস্ত সত্য, সমস্ত ভয়াবহতা ভুলে যায়। এই-ই মানুষের অবস্থা, এই-ই সংসারের বাস্তবতা।

অর্চত প্রার্চত প্রিয়মেধাসো অর্চত ।

অর্চন্তু পুত্রকা উত পুরং ন ধৃষ্ণুর্হত ॥

ঋগ্বেদ ৮.৬৯.৮

হে যজ্ঞপ্রেমীভক্তগণ — তোমরা যারা যজ্ঞকে শুধু একটি আচার হিসেবে নয়, বরং ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের এক মহৎ পথ হিসেবে গ্রহণ করো, যারা তাঁর সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করতে চাও, তোমাদের উদ্দেশে আহ্বান করা হচ্ছে: যজ্ঞ করো, তাঁকে আরাধনা করো। তাঁকে একবার নয়, বারবার, আবারও আরাধ্না করো। এই উপাসনা যেন হয় অবিরাম, আন্তরিক এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান।

তোমরা শুধু নিজেরাই নয়, বরং তোমাদের সন্তান ও পৌত্রদের নিয়েও অংশগ্রহণ করো। যাতে এই ঐশিক সাধনার ধারাটি পরিবার ও সমাজে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

যেমন করে এক মহান শহরের নাগরিকেরা তাদের শহরকে ভালোবাসে, শহরের গৌরবকে সম্মান করে, এবং তাদের মহান শাসককে শ্রদ্ধা ও মহিমায় পূর্ণ করে তোলে—ঠিক সেইরকম করো ভগবানের আরাধনা। কারণ তিনিই এই জগতের মহিমান্বিত অধিপতি।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যজুর্বেদের ১ম মন্ত্র - গবাদি পশুর সুরক্ষা ও কর্তব্যের আজ্ঞা

ওঽম্,

কর্মপ্রধান বেদ যজুর্বেদ। যজুর্বেদ = যজুঃ + বেদ। সনাতন ধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু মহর্ষি দয়ানন্দ স্বামীজীর ভাষায় যজুর্বেদের সংজ্ঞায়ন নিম্নরূপ- "যা দ্বারা মনুষ্য ঈশ্বর ও ধার্মিক বিদ্বানদের পূজা করে তথা সর্ব ক্রিয়ার সঙ্গতি, শিল্পবিদ্যার সঙ্গ, বিদ্যা প্রভৃতি শুভ গুণসমূহের দান, যথাযোগ্য সকলের উপকার তথা শুভ ব্যবহার এবং বিদ্বানদের জন্য দ্রব্য প্রভৃতির ব্যয় করে তাকে যজুঃ বলে।" [সূত্রঃ যজুর্বেদ-ভাষ্য ভূমিকাভাগ] এবং "বেদ অর্থাৎ যা এই সত্য সত্য জ্ঞানের হেতু।" [সূত্রঃ ঋগ্বেদ-ভাষ্য ভূমিকাভাগ]

একইভাবে যজুর্বেদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষেপে স্বামীজী বলেছেন, "জীবকে গুণ-গুণীর বিজ্ঞান উপদেশ করার জন্য পরমেশ্বর ঋগ্বেদে সকল পদার্থের ব্যাখ্যা করেছেন। এখন [যজুর্বেদে] এসব পদার্থ দ্বারা মনুষ্যকে ঠিক-ঠিক উপযোগ নেয়ার জন্য কীভাবে কর্ম করা উচিত, এই উপদেশ করা হয়েছে। কর্ম করার জন্য যে যে অঙ্গ এবং সাধনের আবশ্যকতা রয়েছে, সেসকল যজুর্বেদে প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়াত্মক জ্ঞান (practical knowledge) অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম সুখও অর্জিত হয় না।" ... "যে-যে কর্ম বিজ্ঞানযুক্তভাবে সম্পাদিত হয় সে-সে কর্ম সুখ উৎপন্নকারী হয়। এজন্য মনুষ্যদের বিজ্ঞানপূর্বকই কর্মানুষ্ঠান করা উচিত।" [সূত্রঃ যজুর্বেদ-ভাষ্য ভূমিকাভাগ]

অর্থাৎ, এই বেদের মূখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে যজ্ঞ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কর্মের তত্ত্ব ও কৌশল বিষয়ক উপদেশ প্রদান করে জাগতিক সুখ ও মোক্ষের পথে ধাবিত করা। তাই এর প্রথম মন্ত্রেই পরমেশ্বর আমাদের প্রথমে যজ্ঞ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কর্ম করা এবং এর মাধ্যমে ভৌতিক সুখ ও মোক্ষের পথে ধাবিত হওয়ার প্রেরণা দিয়েছেন। এরপরেই তিনি আমাদের গোজাতি সহ অন্য সকল পশু-পাখিদের প্রতি কর্তব্যের চমৎকার ও বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করেছেন। আমাদের আলোচ্য বিষয় মন্ত্রের দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি। মন্ত্রটি নিম্নরূপ -

পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্ঋষিঃ॥ সবিতা দেবতা॥

(১) স্বরাড্ বৃহতী ছন্দঃ, মধ্যমঃ স্বরঃ। (২) ব্রাহ্মী উষ্ণিক্ ছন্দঃ, ঋষভঃ স্বরঃ॥

ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়বস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তুশ্রেষ্ঠতমায় কর্মণেঽআপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যােঽইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবাঽঅয়ক্ষ্মা মা বস্তেনঽঈশত মাঘশংসো ধ্রুবাঽঅস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি॥ [যজুর্বেদ ১।১]

এখন মন্ত্রের "আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যােঽইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবাঽঅয়ক্ষ্মা মা বস্তেনঽঈশত মাঘশংসো ধ্রুবাঽঅস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি॥" - অংশটুকুকে আর্যসমাজের চতুর্বেদ ভাষাভাষ্যকার আচার্যবর মীমাংসাতীর্থ পণ্ডিত শ্রী জয়দেব শর্মা বিদ্যালঙ্কার কৃত ভাষাভাষ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণ করে আমরা পাই-

✅ এখানে পরমেশ্বর প্রথমে আমাদেরকে সকল গোজাতির প্রতি কর্তব্যের উপদেশ করে বলেছেন-

[১] (অঘ্ন্যাঃ) সর্বদা বধের অযোগ্য এবং যজ্ঞযোগ্য [= ভূতযজ্ঞের উপর্যুক্ত] গোজাতিসকল! সকলে (আপ্যায়ধ্বম্) অত্যন্ত পরিপুষ্ট হোক।

🖋️ মন্তব্য = গো জাতির সমার্থক শব্দ হিসেবে নিঘণ্টুতে [২। ১১] 'অঘ্ন্যা' শব্দটি এসেছে, যার অর্থ মহর্ষি যাস্কাচার্য করেছেন "অঘ্ন্যা অহন্তব্যা ভবতি" [নিরুক্ত ১১। ৪৪] অর্থাৎ হত্যার অযোগ্য। তাই বোঝা যাচ্ছে মন্ত্রে অঘ্ন্যা দ্বারা গোজাতিকে বুঝিয়েছে এবং এই গোজাতি সর্বদা বধের অযোগ্য।

অর্থাৎ পরমেশ্বর আমাদের প্রথমেই জানাচ্ছেন, হে আমার মানব সন্তানগণ শোনো! গো প্রভৃতি পশুগণ তোমাদের দ্বারা সর্বদা বধের অযোগ্য বলে জানবে। অতএব কখনো তাদের বধ করোনা। সর্বদা তোমাদের নিত্য করণীয় পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্যতম ভূতযজ্ঞ ও অন্যান্য উত্তম কর্মের মাধ্যমে তাদের সেবা শুশ্রূষা করো যাতে তারা পরিপুষ্ট হতে থাকে এবং তোমাদের বিভিন্ন উপকারে আসে।

এখানে অঘ্ন্যা শব্দের দ্বারা অনেকে মনে করেন এখানে শুধু গাভীকে বুঝিয়েছে। কিন্তু বিষয়টি ভুল। 'অঘ্ন্যা' পদটি দ্বারা যেমন গাভীকে বোঝায় তেমনি বৃষ অর্থাৎ ষাঁড়, বলদ প্রভৃতিকেও বোঝায় এর প্রমাণ বেদ স্বয়ং প্রস্তুত করেছে। যেমন অথর্ববেদ ৯।৪।১৭ তে দেখুন, "গবাং য়ঃ পতিরঘ্ন্যঃ"। আরো দেখুন যজুর্বেদ ১২। ৭৩ মন্ত্রে - "বিমুচ্যধ্বমঘ্ন্যা দেবয়ানা" অর্থাৎ হে বিদ্বানগণ! (অঘ্ন্যাঃ) সর্বদা বধের অযোগ্য, রক্ষার যোগ্য, (দেবযানাঃ) দেব অর্থাৎ দিব্য ভোগসমূহ লাভে সহায়তাকারী বৃষ-বলদের (বি মুচ্যধ্বম্) সন্ধ্যাবেলা মুক্ত করো। অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় বৃষদের জোয়াল থেকে মুক্ত করো। তারপর সকাল হলে তাদের আবার কৃষিকাজে নিযুক্ত করো। [ভাষ্যকার - ঐ] এছাড়া আমরা আরো পাই অথর্ববেদ ৯।৪।১৯ এ- "ব্রাহ্মণেভ্য ঋষভং দত্ত্বা বরীয়ঃ কৃণুতে মনঃ। পুষ্টিং সো অঘ্ন্যানাং স্বে গোষ্ঠেঽব পশ্যতে॥" এখানেও ঋষভ অর্থাৎ বৃষ এবং অঘ্ন্যা উভয়ের প্রয়োগ স্পষ্ট বিদ্যমান। যদিও

আচার্যগণ এই মন্ত্রটিকে পরমেশ্বর অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন কারণ এর মূল উদ্দেশ্য পরমেশ্বরই। তবে এর দ্বারা যে বৃষের বর্ণনাও অভিপ্রেত তা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন আচার্য বিশ্বনাথ বেদালঙ্কার তিনি লিখছেন - "এই মন্ত্রগুলিতে বৃষের উল্লেখও অভিপ্রেত, যা মন্ত্রপাঠের সময় আপনা-আপনি প্রকাশিত হয়। তবে মন্ত্রগুলির মূল উদ্দেশ্য পরমেশ্বরই।" এখানে আর্যসমাজের অন্য আচার্যরা সবাই একারণে আধ্যাত্মিক ভাষ্য করেছেন তবে পদ্মভূষণ শ্রীপাদ দামোদর এই মন্ত্রে বৃষপরখ ভাষ্যই করেছেন। এইজন্যই মহাভারতে মহর্ষি ব্যাসদেব বালব্রহ্মচারী ভীষ্ম মহারাজের উপদেশকে নিম্নবাক্যে উপস্থাপন করে স্পষ্টভাবে লিখছেন- "অঘ্ন্যা ইতি গবাং নাম ক এতা হন্তুমর্হতি। মহচ্চকারাকুশলং বৃষং গাং বাঽঽলভেৎ তু যঃ॥" [মহাভারত (গীতাপ্রেস সং.) শান্তিপর্ব, ২৬২ অধ্যায়, ৪৭ শ্লোক] অনুবাদঃ গোজাতিকে অঘ্ন্যা বলা হয়েছে, এরপরও কে তাদের হত্যা করার চিন্তা করবে? যে ব্যক্তি গাভী এবং বৃষ প্রভৃতির হত্যা করে সে মহাপাপ করে।

সুতরাং আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি সকল প্রকার গোজাতিকে হত্যা করাই বেদ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। তারা সর্বদাই পালনপোষণের যোগ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ বিশ্বের সর্বাধিক আর্য জনগোষ্ঠীর দেশ ভারতবর্ষ তার সংবিধানে শুধুমাত্র গৃহপালিত গোজাতি অর্থাৎ বর্তমানের ভারতীয় জেবু গরু (Bos Indicas) কে উন্নয়ন, পালন ও হত্যার অযোগ্য বলে সংরক্ষণে জোড় দিলেও অন্যান্য গোজাতির ক্ষেত্রে তারা নিরব। এই নামকাওয়াস্তে আইন আবার রাজ্য দ্বারা আরোপিত হবে এমন উল্লেখ থাকায় অনেক রাজ্য এ ব্যাপারে শুধু নিরব থেকেই সন্তুষ্ট নয়, তাদের অনেক নেতা-মন্ত্রীরা গো-চোরাচালান প্রভৃতি গোবিধ্বংসী অপকর্মের মাধ্যমে নিত্য গোজাতির ক্ষয় করে যাচ্ছেন। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে? তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো আমাদের অনেক পৌরাণিক ভাইগণও Bos Indicas ভিন্ন অন্যান্য গোজাতিকে বলি হিসেবে তথাকথিত পূজার নামে উৎসর্গ করে। কোথাও কোথাও মহিষ, বৃষ, বলদ প্রভৃতিকেও উৎসর্গ করে। এ কী বেদাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করা নয়? এ কী বেদাজ্ঞা উল্লঙ্ঘনরূপ নাস্তিকতা নয়? ধর্মপ্রাণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উচিত এ ব্যাপারে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হওয়া। মনে রাখতে হবে সকল প্রকার গোজাতিই বেদ অনুসারে পবিত্র।

✅ এরপর এই কর্তব্যকে আরো বিস্তারিতভাবে বুঝাতে পরমাত্মা বলছেন-

[২] তারা (ইন্দ্রায়) ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি অথবা রাজার জন্য বা পরমৈশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য (ভাগম্) সেবার যোগ্য অথবা লাভ করার যোগ্য ভাগ হবে।

✒️ মন্তব্য = এই সেবা ও রক্ষণকর্মকে শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখলে হবেনা, সামষ্টিক এবং জাতীয় পর্যায়েও এই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এইজন্য পরমেশ্বর পুনঃ উপদেশ করছেন, হে মানব! তোমাদের মধ্যে যারা আমার কৃপায় ঐশ্বর্যবান অথবা রাজা হয়েছ তোমাদের উপরে এই কাজ বিশেষভাবে অর্পিত। তোমরা তোমাদের ঐশ্বর্য ও রাজশক্তি নিয়োগ করে গোজাতির সেবা করবে, তাদের পরিপুষ্ট করবে। তাদের লাভ করে, সেবা করে পরমৈশ্বর্য লাভ করবে। সুতরাং কর্তব্যের প্রতি অবহেলা করে ঐশ্বর্যহীন হয়ো না।

সাধারণভাবে উল্লেখ করার পর আবার বিশেষ উল্লেখের দ্বারা বিশেষভাবে কর্তব্য প্রতিপাদন করার রীতি ধর্মশাস্ত্রে বহুল ব্যবহৃত। এর দ্বারা উল্লেখিত ব্যক্তিদের প্রতি কর্তব্যে অধিক গুরুত্ব দেয়াকে উপস্থাপন করা হয়। নিশ্চয়ই ভগবান মনু প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণ এই বেদোক্ত রীতিই ধর্মশাস্ত্রে প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি এই কর্মের প্রতিপাদন করার পর আবার আলাদাভাবে ঐশ্বর্যবান ব্যক্তি ও রাজাকে

উল্লেখের মাধ্যমে পরমাত্মা তাদের প্রতি উক্ত কর্তব্যকে সামষ্টিক ও জাতীয় পর্যায়ে পালন করার বিশেষ নির্দেশনাই দিয়েছেন।

✅ এই সেবার দ্বারা গোজাতির উপকার কীরূপ হবে তা বর্ণনা করে পরমাত্মা বলছেন-

[৩] গো প্রভৃতি পশুগণ! সকলে (প্রজাবতীঃ) প্রজা, বৎস, পূত্র প্রভৃতি সহ (অনমীবাঃ) রোগমুক্ত, (অযক্ষ্মাঃ) রাজযক্ষ্মা থেকে মুক্ত থাকুক।

✒️ মন্তব্য = পরমাত্মা পুনরায় বলছেন, হে আমার মানবপুত্রগণ শোনো, গোজাতি ও অন্য পশুদের প্রতি এই ব্যক্তিগত, সামষ্টিক এবং জাতীয় উদ্যোগের মাধ্যমে গো প্রভৃতি পশুগণ! সকলে প্রজা, বৎস, পূত্র প্রভৃতি সহ রোগমুক্ত, রাজযক্ষ্মা প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকুক। এই আমার ইচ্ছা! পিতার আজ্ঞা কোন সুপূত্র লংঘন করে?

অর্থাৎ তাদের জন্য সেবাকেন্দ্র, পশু চিকিৎসালয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের পর্যাপ্ত আহার-বিহারের জন্য যথাযথ পশুশালা, উদ্যান প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। সম্ভবত বেদের এই নির্দেশনা অনুসারেই আয়ুর্বেদজ্ঞগণ পশুচিকিৎসা শাস্ত্রের নির্মাণ করেছিলেন। এই কাজ ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্ভব না হলেও ঐশ্বর্যবান ব্যক্তিদের দ্বারা সামষ্টিকভাবে এবং রাজার দ্বারা জাতীয় পর্যায়ে সম্পন্ন করা অসম্ভব নয়। শুধু সদিচ্ছার প্রয়োজন। ধন্য বিশ্ব মানবতার মহান আচার্য ঋষি দয়ানন্দ যিনি হাজার বছরের অবসরে উপলব্ধি করেছিলেন, বেদ সমস্ত বিদ্যার আকর, কিন্তু বেদ বীজরূপে বা মূল সূত্ররূপে সমস্ত বিদ্যা প্রদান করে। এমন শিক্ষা বিশ্বের আর কোন সভ্যতা উপলব্ধি করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে?

✅ এতক্ষণ পরমাত্মা গোজাতি প্রভৃতি পশুদের প্রতি আমাদের কর্তব্য এবং কারা এদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিতে পারবে তা জানালেন। এবার তিনি আমাদের জানাচ্ছেন কারা এ কাজে অনধিকারী। কাদের থেকে পশুদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য-

[৪] (বঃ) তাদের উপরে [যেন] (স্তেনঃ) চোর, ডাকাত প্রভৃতি দুষ্ট পুরুষ (মা ঈশত) প্রভুত্ব লাভ করতে না পারে।

[৫] (অঘঃ-শংসঃ) নিজে পাপ-চর্চাকারী, অন্যকে পাপ, হিংসা প্রভৃতি করতে প্রেরণাদানকারী নীচ ব্যক্তিও (বঃ মা ইশত) [যেন] তাদের স্বামী না হয়।

✒️ মন্তব্য = পরমাত্মা এখানে বলছেন, হে আমার মানব সন্তানগণ! মন দিয়ে শোনো! চোর, ডাকাত প্রভৃতি দুষ্ট পুরুষ, নিজে পাপ-চর্চাকারী, অন্যকে পাপ, হিংসা প্রভৃতি করতে প্রেরণাদানকারী নীচ ব্যক্তিও যেন কখনো গো প্রভৃতি পশুদের স্বামী না হয়, তাদের উপরে প্রভুত্ব করতে না পারে, এ বিষয়ে তোমরা সর্বদা সতর্ক থাকবে এবং যথাযথ পদক্ষেপ নিবে।

এ আজ্ঞার অন্তর্নিহিত ভাব আমরা মনু মহারাজের নিম্নোক্ত শ্লোকে [মনুস্মৃতি ৫।৫১] পাই - "অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী। সংস্কর্ত্তা চোপহর্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥" অর্থাৎ, কোন প্রাণীকে হত্যার জন্য অনুমতিদাতা, মাংস কর্তনকারী, পশু হত্যাকারী, হত্যার জন্য পশু ক্রেতা ও বিক্রেতা তথা মাংসের ক্রয় বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, রাধুনী, পরিবেশনকারী এবং ভোজনকারী এরা সবাই ঘাতক = পশু হত্যাকারী ও পাপী অর্থাৎ হত্যা ও হত্যায় ভাগীদার হওয়ার কারণে পাপী। উপরোক্ত মন্ত্রে এই ব্যক্তিদের থেকেই পশুসম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রেরণা দিয়েছেন ঈশ্বর।

বর্তমানে পশুসম্পদ বিনষ্টের এক অন্যতম কারণ এই চোর, ডাকাত বা চোরাচালানকারীগণ। প্রায়ই দেখা যায় এরা বিভিন্ন পশু সম্পদ অবৈধভাবে বিক্রি বা পাচার করে যা পরবর্তীতে মাংস উৎপাদন প্রভৃতি অপকর্মে ব্যবহৃত হয়। পরমাত্মার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের সকলকে এই চোরাচালান রোধ ও চোরাচালানকারীদের যথাযথ শাস্তি প্রদানের বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। এ কাজে নিয়োজিত রাজশক্তিকে যথাযথভাবে সহায়তা করতে হবে।

এরপর পশুসম্পদ বিনষ্টের কারণ হিসেবে আমাদের মাংসলোলুপতাকে উল্লেখ করা যায়। এর জন্য পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রচুর পরিমানে গোজাতি প্রভৃতি বিভিন্ন পশু-পাখি হত্যা করা হচ্ছে। তাদের সাথে অবিচার করা হচ্ছে। সুতরাং ঈশ্বরীয় আজ্ঞা মানতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই মাছ, মাংস, ডিম বর্জন করতে হবে। আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য বিকল্প উদ্ভিজ্জ প্রোটিন এবং বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণে মনোনিবেশ করতে হবে। নিজে ভালো হলেই জগতের উন্নতি হবে, নশ্চেৎ নয়।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় বানিজ্যিকভাবে ডিম ও মাছ-মাংস উৎপাদনের জন্য আমরা অনেকেই বিভিন্ন খামার তৈরি করি বা সেগুলোতে নিজেদের অর্জিত অর্থ বিনিয়োগ করি। অনেকক্ষেত্রে পশুকে হত্যার উদেশ্যে উচ্চমূল্যে বিক্রির জন্য লালন-পালন করি এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে উক্ত কাজগুলোও পাপ। উক্ত কাজ করার মাধ্যমেও আপনি ঈশ্বরের বেদাজ্ঞা লংঘনকারী নাস্তিক হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন। সুতরাং হত্যার উদ্দেশ্যে বিক্রি করার জন্য এবং কশাই প্রভৃতি কাজ থেকে আমাদের দূরে আসতেই হবে।

এজন্য সামষ্টিক ও রাজশক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে এই জাতীয় কাজ নিষিদ্ধ করা ও উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিদের থেকে গো প্রভৃতি পশুসম্পদকে রক্ষা করার জন্য পরমাত্মা বলছেন- নিজে পাপ-চর্চাকারী, অন্যকে পাপ, হিংসা প্রভৃতি করতে প্রেরণাদানকারী নীচ ব্যক্তিও যেন তাদের স্বামী না হয়। মনে রাখবেন - "পাপ যে করে আর পাপ যে সহে দুজনেই সমান পাপী এই ভব সংসারে।"

✅ এই কাজে রাজশক্তির হস্তক্ষেপ ও সাংগঠনিক উদ্যোগের গুরুত্ব আমাদের উপলব্ধি করাতে পরমাত্মা উপদেশ দিয়েছেন -

[৬] তারা সকলে (গোপতৌ) গৌ অর্থাৎ গোজাতি ও ভূমির পালক রাজা এবং রক্ষক পুরুষের অধীনে (ধ্রুবাঃ) স্থিররূপে (বহ্বীঃ) বহু সংখ্যায় (স্যাত) বৃদ্ধি পেতে থাকুক।

✏️ মন্তব্য = গোপতৌ অর্থাৎ গোজাতির রক্ষক সংঘ বা সংস্থা আমাদের তৈরি করতে হবে। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বিশ্বমানবতার ধর্মগুরু এবং সনাতন ধর্মের সর্বোচ্চ ধর্মগুরু মহর্ষি দয়ানন্দ স্বামীজী সহস্র বর্ষ পরে ব্রিটিশ ভারতে প্রথম গোজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য নির্দেশ করতে 'গোকরুণানিধি' নামক তাঁর অমর গ্রন্থরত্ন প্রণয়ন করেন এবং সেখানে গ্রামে-গ্রামে, নগরে-নগরে "গো-কৃষ্যাদি রক্ষিণী সভা" স্থাপনের মাধ্যমে গো প্রভৃতি পশু ও কৃষি প্রভৃতি কর্মের রক্ষা ও উন্নতিতে সকল আর্য পুরুষকে প্রেরণা দিয়েছেন। অর্থাৎ বলা যায় প্রতিষ্ঠার পূর্ব থেকেই আর্যসমাজ ও ঋষি দয়ানন্দের অনুগামী বৈদিকগণ ঈশ্বরীয় বেদাজ্ঞা প্রতিপালনে সদা তৎপর। কিন্তু এই কাজ শুধু আর্যসমাজ বা বৈদিকদের নয় বরং সমগ্র ভূমণ্ডলে যারা নিজেদেরকে বেদ মান্যকারী সনাতন ধর্মাবলম্বী দাবী করেন সকলেরই এ এক পরম কর্তব্য। এর পাশাপাশি এ কাজে চাই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তাই পরমাত্মা এই উভয়বিধ উপায়ে আমাদেরকে গোজাতির রক্ষায় আমাদের সচেষ্ট হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এরূপ সভার অন্তর্নিহিত ভাব হিসেবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় আমরা বলতে পারি- "... আমরা মুখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গোরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি। আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। আমাদের সভা থেকে যদি এর কোনো প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে।..." [প্রজাপতির নির্বন্ধ/চিরকুমার-সভা - চতুর্থ অঙ্ক - প্রথম দৃশ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

✅ সর্বশেষে পরমাত্মা আমাদের আদেশ করছেন-

[৭] হে বিদ্বান মানব! তুমিও (যজমানস্য) যজ্ঞকারী, দানশীল আত্মা ও যজ্ঞকর্তা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির (পশুন্ পাহি) পশুদের লালন-পালন করো।

✏️ মন্তব্য = এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে প্রথমে পশুদের হত্যায় প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করে তাদের রক্ষায় গুরুত্ব আরোপ করে পরমাত্মা আমাদের বিশেষভাবে জানাচ্ছেন- যজ্ঞকারী, দানশীল আত্মা ও যজ্ঞকর্তা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পশুদের লালন-পালন করো। যারা কুতর্ক করতে ইচ্ছুক তারা ভালোভাবে খেয়াল করুন এখানে 'পশু' শব্দটি আছে যা দ্বারা সকল প্রাণিসম্পদকে বোঝাচ্ছে। এই উক্তিটি সেইসব তথাকথিত বিদ্বান, ধার্মিক, শাস্ত্রজ্ঞদের বিবেচনা করা উচিত যারা যজমানের বা যজমানের অর্থে ক্রয়কৃত পশুসম্পদকে যজ্ঞে বা কোন পূজার নামে তথাকথিত আহুতি বা বলি দেয়ার বিধান সমর্থন করে এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে মাছ-মাংস-ডিম প্রভৃতি খাওয়াকে তথাকথিত শাস্ত্রের নামে সমর্থন করে নাস্তিকতার বৃদ্ধি করছেন। ভালো করে বিচার করুন তো পরমাত্মা এখানে "যজমানস্য পশুন্ পাহি" বলে যখন যজমানের সকল প্রাণিসম্পদের পালন করার বিধি দিলেন সেখানে আপনি তাদের হত্যার সমর্থন করে বেদাজ্ঞা লংঘন করে নাস্তিকের পরিচয় দিচ্ছেন না? আমাদের মধ্যে বিদ্বান, ধার্মিক সমাজপতি ও রাষ্ট্রের কর্তা সকলের উচিত এই ধরণের নাস্তিকদের মনু মহারাজের সিদ্ধান্ত "স সাধুভির্বহিষ্কার্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ [মনুস্মৃতি ২।১১]" মেনে নিজেদের সমাজ থেকে বেদনিন্দক নাস্তিক হিসেবে বহিস্কার করে দেয়া। কারণ এরা শুধু নিজেদেরই পাপ বাড়াচ্ছে না বরং আপনাদেরও অধার্মিক ও নাস্তিকে পরিণত করছেন।

✅ কেউ যদি এটা ভাবেন যে অনেক সময় অনেক পশুপাখি, মানুষসহ অন্য পশুপাখি ও ফসলের ক্ষতি করে সেক্ষেত্রে তাঁদের কী করব?

এর উত্তর বেদমন্ত্রে দেয়ার আগে আমরা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বর্তমানে কোন মানুষ অন্য মানুষের বা সম্পদের ক্ষতি করলে তাঁর প্রতিকার করার দায় যেমন রাষ্ট্রের তেমনি উক্ত পশুদের ক্ষেত্রেও সেই একই বিধান। আপনি তাদেরকে রাষ্ট্রকে সমর্পন করতে পারেন বা উক্ত কাজে রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে পারেন এর বেশি কিছু নয়। তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রের, আপনার নয়। যেমন বেদ ভগবান বলছেন-

"কোন মনুষ্য সকলের উপকারী পশুপাখিদেরকে কখনও হত্যা করবে না কিন্তু ইহাদের সঠিকভাবে রক্ষা করবে এবং তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করে সকল মনুষ্যকে আনন্দ দান করবে। যে বন্য পশুপাখিগুলির দ্বারা গ্রামের পশু, কৃষি ও মনুষ্যের ক্ষতি হয়, শুধুমাত্র তাদেরকে রাজপুরুষগণ বধ করবে বা বন্দী করে রাখবে।" - [যজুর্বেদ ১৩। ৪৭] (ঋষি দয়ানন্দ-ভাষ্যানুসারে)

✅ এখন যারা বলতে চান, মানুষই বাঁচেনা তারপর আবার পশুপাখি বাঁচাতে যাব? তাদের উদ্দেশ্যে বঙ্গজননীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সন্তানদের মধ্যে অন্যতম আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ভাষায় আমরা তাদের বলতে চাই, গোজাতি বাঁচলেই আপনি বাঁচবেন। কেন?

"... ৫০/৬০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে গোয়াল-পোনা গরু থাকিত। গোচারণেরও অনেক মাঠ ছিল এবং বর্ষাকালে গরুর খাদ্যোপযোগী যথেষ্ট পল, বিচালী সংগ্রহ থাকিত। এখন পাটের চাষ বাহুল্য হওয়ায় এবং সকল শ্রেণীর একমাত্র উপজীব্য কৃষি হওয়ায় সমস্ত গোচারণের মাঠ ঘেরাও হইয়াছে। এখন আর ধর্ম্মের ষাঁড় দেখা যায় না। উপযুক্ত বৃষের অভাবে গোজাতি দিন দিন অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। গোজাতি যেমন আকারে খর্ব্ব, তেমনই অস্তিকঙ্কালসার। খুলনা শহরে বর্ষাকালে টাকায় দেড় সের দুই সের দুধ, তাহাও মিলা ভার। পাড়াগাঁয়ে অনেক সময় টাকায় ৩/৪ সের দুধ, তাহাও আবার দুষ্প্রাপ্য। ফল কথা, দুধের অভাবে শিশু সন্তান পুষ্টিলাভ করিতে পারে না এবং বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃই হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে।..."

[আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী, পৃ. ৩৮২]

তাই আসুন সকলে বেদের ভাষায় উচ্চকণ্ঠে বলি-

মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসাদিত্যানামমৃতস্য নাভিঃ। প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট॥

[ঋগ্বেদ ৮। ১০১। ১৫; ভাষ্যকার - পূর্বোক্ত]

সরলানুবাদ - দুষ্টদের দমনকারী বীর পুরুষদের দুগ্ধ পান করিয়ে পুষ্টি জোগানো, রোগনাশক ঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি উৎপাদনকারী জননী হল এই গাভী; আর বীরদের উৎপাদনকারী ও রোগনাশক ঔষধ উৎপন্নকারী জননী এই গোমাতা হলো ভূমি। দুষ্টদের বিনাশকারী বীরদের এবং প্রাণযুক্ত জীবের মা এই কন্যারূপ মাতৃশক্তি হলো গাভী। সে রাষ্ট্রে বা জগতে বসবাসকারী সকল জীবকে সমস্ত সুখ দান করে, আদান-প্রদানে নিয়োজিত ব্যবসায়ী বৈশ্য সম্প্রদায়ের জন্য সে সমস্ত সুখদানকারী, ভগিনীর সমান এবং অমৃতসম দীর্ঘজীবনের উৎস যেন এক আশ্রয়স্থল। আমি এই সমস্ত তথ্যজ্ঞানীদেরকে নিশ্চিতভাবে ও বলপূর্বক বলছি যে, এমন নিষ্পাপ গোজাতিকে এবং ভূমিবৎ, মাতা-পিতাবৎ, পুত্র-পুত্রিবৎ গোজাতিকে কখনও হত্যা করো না।

টীকা: বেদের এই প্রবল অহিংসা প্রতিপাদক আহ্বান শ্রবণ করে ঘোর হিংসক ব্যক্তিও গোজাতির প্রতি তোলা হাত ফিরিয়ে নিন। [এই হলো বেদাজ্ঞা, এর অবমাননাই নাস্তিকতা।] পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের সকলকে বেদাজ্ঞা যথাযথভাবে পালনের প্রেরণা দান করুন।

বিশেষ - সম্পূর্ণ মন্ত্রটির আচার্য প. জয়দেব শর্মা, বিদ্যালঙ্কার, মীমাংসাতীর্থ কৃত সম্পূর্ণ ভাষাভাষ্যানুবাদ-

[বিষয়ঃ- পরমেশ্বরের কাছে অন্ন, বলের প্রার্থনা। রোগরহিত পশুসম্পদের কামনা। দুষ্ট মনুষ্যদের বিনাশ।]

হে পরমেশ্বর! আমরা (ইষে) অন্ন, উত্তম বৃষ্টি প্রভৃতি পদার্থসমূহের প্রাপ্তি এবং (ঊর্জে) সর্বোত্তম, পুষ্টিকারক রস লাভ করার জন্য (ভাগং) সর্বোপাস্য (ত্বা ত্বা) তোমার উপাসনা করি, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি। হে প্রাণ এবং প্রাণিগণ! তোমরা (বায়বঃ স্থ) সকলে বায়ুরূপ, বায়ু দ্বারা প্রাণ ধারণ করো। (বঃ) সেই সকলের (সবিতা) উৎপাদক পরমেশ্বরই (দেবঃ) পরম দেব, সকল সুখ ও পদার্থের প্রকাশক এবং প্রদানকারী। তিনি (শ্রেষ্টতমায়) অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম (কর্মণে) কর্ম, নিঃশ্রেয়স, মোক্ষ লাভের জন্য (প্র অর্পয়তু) প্রেরণা দেন এবং (অঘ্ন্যাঃ) সর্বদা বধের অযোগ্য, ইন্দ্রিয়স্থ প্রাণগণ এবং যজ্ঞযোগ্য [= ভূতযজ্ঞের উপর্যুক্ত] গোজাতিসকল ও পৃথিবী প্রভৃতি লোক! সকলে

(আপ্যায়ধ্বম্) অত্যন্ত পরিপুষ্ট হোক। তারা (ইন্দ্রায়) ঐশ্বর্যবান পুরুষ অথবা রাজার জন্য বা পরমৈশ্বর্য প্রাপ্তির জন্য (ভাগম্) সেবার যোগ্য অথবা লাভ করার যোগ্য ভাগ হবে। প্রজাসমূহ অথবা গো প্রভৃতি পশুগণ! সকলে (প্রজাবতীঃ) প্রজা, বৎস, সন্তান প্রভৃতি সহ (অনমীবাঃ) রোগমুক্ত, (অযক্ষ্মাঃ) রাজযক্ষ্মা থেকে মুক্ত থাকুক। (বঃ) তাদের উপরে [যেন] (স্তেনঃ) চোর, ডাকাত প্রভৃতি দুষ্ট পুরুষ (মা ঈশত) প্রভুত্ব লাভ করতে না পারে। (অঘঃ-শংসঃ) নিজে পাপ-চর্চাকারী, অন্যকে পাপ, হিংসা প্রভৃতি করতে প্রেরণাদানকারী নীচ ব্যক্তিও (বঃ মা ইশত) [যেন] তাদের স্বামী না হয়। তারা সকলে (গোপতৌ) গৌ অর্থাৎ গোজাতি ও ভূমির পালক রাজা এবং রক্ষক পুরুষের অধীনে (ধ্রুবাঃ) স্থিররূপে (বহ্বীঃ) বহু সংখ্যায় (স্যাত) বৃদ্ধি পেতে থাকুক। হে বিদ্বান মানব! তুমিও (যজমানস্য) যজ্ঞকারী, দানশীল আত্মা ও যজ্ঞকর্তা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির (পশুন্ পাহি) পশুদের লালন-পালন করো।

ইত্যোম্ শম্॥

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

মূর্খ কে? কি বলছে মহাভারত?

অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ

অর্থাশ্চাকর্মণা প্রেপ্সুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ

স্বমর্থ যঃ পরিত্যজ্য পরার্থমনুতিষ্ঠতি

মিথ্যা চরতি মিত্রার্থে যশ্চ মূঢ় স উচ্যতে

[মহাভারত, উদ্যোগপর্ব ।৩০-৩১]

যারা না পড়েই গর্ব করে, দরিদ্র হয়েও বড় বড় অভিলাষ করে এবং কোন কাজ না করে অর্থ উপার্জনের আশা করে , এমন মানুষদের পণ্ডিতেরা 'মূর্খ' বলেন।

যে নিজের কর্তব্য বাদ দিয়ে অন্যের কর্তব্য পালন করে এবং বন্ধুর সাথে দুর্ব্যবহার করে, তাকে 'মূর্খ' বলা হয়।

বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যে দুইটি নিয়ম মেনে চললে যেকোন ব্যক্তির সাথে ভালো সম্পর্ক রাখতে পারবেন

মা-বাবা, ভাই-বোন, কাকা, মামা, মাসি-পিশি এবং বন্ধু ইত্যাদি লোকজনের সাথে সাধারণত সবার সম্পর্ক থাকে। এই সম্পর্কগুলো দীর্ঘস্থায়ী হয় তখনই, যখন আমরা তা রক্ষা করি। কিন্তু রক্ষা করার উপায়গুলো কী?

সম্পর্ক রক্ষার জন্য মূলত দুইটি বিষয় জরুরি –

- যাদের সঙ্গে আপনি সম্পর্ক রাখতে চান, তাদের সময় দেওয়া
- তাদের অনুভূতি, ভাষা এবং আচরণ বোঝার চেষ্টা করা

যে ব্যক্তি এই দুইটি বিষয়কে সবসময় মেনে চলে, তার সম্পর্কগুলো নিরাপদ থাকে।

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কেউ অন্যকে সময় তো দেয়, কিন্তু তাদের অনুভূতি, ভাষা বা আচরণ ঠিকভাবে বুঝতে পারে না। যদি কারো বুদ্ধি কম থাকে, তাহলে তারা অন্যকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

অথবা, যদি কারো মনে কুটিলতা, প্রতারণা, ধোঁকা, চালাকি ইত্যাদি দোষ থাকে, তবে তারা অন্যের সাথে সঠিক ব্যবহার করে না। এমন অবস্থায় সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

অতএব, আপনি যদি অন্যদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সম্পর্ক মধুর ও নিরাপদ রাখতে চান, তাহলে তাদের সময় দিন এবং তাদের অনুভূতি ও আচরণকে বোঝার চেষ্টা করুন। তারপর তাদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক ব্যবহার করুন। তবেই আপনার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখময় হবে, না হলে হবে না।

— স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক

পরিচালক, দর্শন যোগ মহাবিদ্যালয়, রোড়, গুজরাট।

ঋগ্বেদ ৬.১৭.১১-তে কি ৩০০ মহিষ রান্নার কথা আছে ?

আলোচ্য মন্ত্রটি হলো -

বর্ধান্যং বিশ্বে মরুতঃ সজোষাঃ পচচ্ছতং মহিষাং ইন্দ্র তুভ্যম্ ।

পূষা বিষ্ণুস্ত্রীণি সরাংসি ধাবন্বৃত্রহণং মদিরমংশুমস্মৈ ॥

ঋগ্বেদ ৬।১৭।১১

সায়ণভাষ্যনুযায়ী অনুবাদ: হে ইন্দ্র । অখিল মরুৎগণ সম্প্রীতিভাজন হইয়া তোমাকে স্তোত্র দ্বারা বর্দ্ধিত করে, তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন এবং মদকর শত্রুনাশক সোমপুর্ণ তিনটা নদী প্রাবাহিত হউক।

সায়ণভাষ্য:...হে ইন্দ্র তস্মৈ তুভ্যং পূষা এতন্নামকো দেবঃ বিষ্ণুঃ এতন্নামকশ্চ শতং শতসঙ্খ্যাকান্ মহিষান্ পুম্পশূন্ পচৎ পচেৎ...

অর্থাৎ শ্রী সায়ণাচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী ইন্দ্রের জন্য পূষা ও বিষ্ণু ১০০ মহিষ রান্না করে। খুবই আশ্চর্যজনক ভাষ্য। কেননা, পূষা ও বিষ্ণু নিশ্চয়ই রন্ধনকর্মে নিযুক্ত কর্মচারী নন যে ইন্দ্রের জন্য ১০০ মহিষ রান্না করবেন। পাশাপাশি, সায়ণাচার্যের ভাষ্যে শত শব্দ দিয়ে ১০০ই বুঝিয়ে কেন ইন্দ্র ১০০ মহিষই খাবেন এবং এটা ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কীভাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি ? সায়ণাচার্য স্পষ্ট করে লিখেছেন এখানে 'মহিষাং' অর্থ হলো পুরুষ পশু মানে পুরুষ মহিষ। স্মার্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে গাভী ব্যতীত অন্য পশু সম্প্রদায় বিশেষে বলিদান ও তৎপূর্বক উদরসাৎকরণে আগ্রহ দর্শনীয়। উক্ত চিন্তার বশবর্তী হয়ে সায়ণাচার্য যে ইন্দ্রের জন্য ১০০ মহিষ রান্নার ভাষ্য করেননি কে বা বলতে পারে।

মন্ত্রের ৩টি শব্দ বিশেষ ভাবে আলোচনা করা দরকার- শতং, মহিষাং, পচৎ।

১। শতং = শত শব্দটি দিয়ে ১০০ লেখা বা বোঝানো হলেও প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হলো 'বহু'। নিঘণ্টুতে [৩।১] স্পষ্টভাবেই আছে 'শতম্ বহুনাম'।

২। মহিষাং = এই পুংলিঙ্গ-বাচক বহুবচন হিসেবে মন্ত্রে উল্লেখিত। মহিষ শব্দের পশু ছাড়াও অনেক অর্থ আছে। যেমন উণাদিসূত্র [১।৪৫] অনুযায়ী মহিষ অর্থ পূজ্য বা সৎকার, সম্মানযোগ্য বোঝায়। নিরুক্ত [৭।২৬] ও নিঘণ্টু

[৩।৩] অনুযায়ী মহান, মহৎ, বৃহৎ এমন কিছুকেও মহিষ বলা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে অগ্নিকে [৭।৩।১।২৩], প্রাণকে [৬।৭।৪।৫], ঋত্বিককেও [১২।৮।১।২] মহিষ বলা হয়েছে।

৩। পচৎ = পরিকল্ক করা। ভ্বাদিগণে পঠিত।

আধিভৌতিক তাৎপর্যে প্রতিটি পদের অর্থ ভগবৎপাদ মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী করেছেন,

হে (ইন্দ্র) সূর্যতুল্য রাজা ! (সজোষাঃ) সমভাবসম্পন্ন (বিশ্বে) সর্ব (মরুতঃ) মানবগণ (যম্) যে আপনার (বর্ধান্) বৃদ্ধি কর ও যে (পূষা) পুষ্টিকর (ধাবন্) ধাবমান (বিষ্ণুঃ) ব্যাপক বিদ্যুতরূপ (ত্রীণি) ৩ (সরাংসি) চলমান তাদের মধ্যে অন্তরিক্ষে প্রভৃতিতে ব্যাপ্ত, সেভাবে ধাবমান হয়ে (অস্মৈ) এর জন্য (মদিরম্) আনন্দকর (অংশুম্) বিভক্ত (বৃত্রহণম্) মেঘকে যেভাবে সূর্য হনন করে সেভাবে শত্রুদের হনন করে এবং যে (তুভ্যম্) আপনার জন্য (শতম্) শত (মহিষান্) বৃহৎ পদার্থ দান করে ও পরোপকারের জন্য (পচৎ) পক্ক করে তা সম্পর্কে জানুন।

[ভাষ্য: মহর্ষি স্বামী শ্রীমৎ দয়ানন্দ সরস্বতী]

অর্থাৎ,

হে রাজন!

তুমি সূর্যের মতো জ্যোতির্ময়। তোমার রাজ্যে সকল মানুষ যেন পরস্পরকে ভালবাসে, একে অপরের সেবা করে, এবং তোমার শক্তি বৃদ্ধি করে।

তুমি সে বিদ্যুৎকে চিনে রেখো যা পুষ্টিদাত্রী, সর্বব্যাপ্ত। সে বিদ্যুৎ পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক এই ত্রিলোকেই বিস্তৃত, যখন তা গমনশীল বা গতিশীল হয়।

তুমিও যেন সদা সচল ও কর্মঠ থেকে তোমার শত্রুকে বিনাশ করো, যেমন সূর্য মেঘকে বিদীর্ণ করে।

আর সেই ব্যক্তিকে তুমি চিনে রেখো ও কৃতজ্ঞ হও যে তোমায় শত অর্থাৎ প্রচুর মহার্ঘ বস্তু দান করে, অন্যের কল্যাণে আহার প্রস্তুত করে এবং হর্ষদায়ক ও শত্রুনাশক তত্ত্ব দান করে।

অধ্যাত্মে,

[১] (যম্) = যে পরমাত্মাকে (সজোষাঃ) = পরস্পর প্রীতিযুক্ত হয়ে (মরুতঃ) = মানবগণ(বর্ধান্) = গুণকীর্তন করে তাঁএ মহিমা বর্ধন করে । হে পরমৈশ্বর্যশালী প্রভু! (তুভ্যম্) = তোমাকে লাভ করার জন্যই ভক্ত (শতম্) = শতবর্ষ পর্যন্ত, অর্থাৎ আজীবন (মহিষান্) = প্রাণসমূহকে (অপচৎ) = পরিপক্ক করে, প্রাণায়ামের মাধ্যমে প্রাণকে আরাধনার উপযোগী করে তোলে ।

[২] (পূষা) = নিজেকে সঠিকভাবে পোষণকারী অর্থাৎ পরিপুষ্টকারী ব্যক্তি, (বিষ্ণুঃ) = ব্যাপক মনোবৃত্তিযুক্ত হয়ে অর্থাৎ সর্বভূতে ভগবৎ দর্শনের মাধ্যমে (ত্রীণি সরাংসি) = ৩ জ্ঞান সরোবর অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রকৃতি-জীবাত্মার জ্ঞানকে (ধাবন্) = [ধাবু গতিশুদ্ধয়োঃ] শুদ্ধ করার মাধ্যমে (অস্মৈ) = এই ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য (অংশুম্) = শারীরিক ও মানসিক বল বা শক্তি [শত০ ব্রা০ ১১।৫।৯।২] (ধাবন্) = লাভ করে, যে বল (বৃত্রহণম্) = কামনাবাসনা বিনষ্ট করে ও (মদিরম্) = উল্লাসজনক।

অর্থাৎ এই মন্ত্রে গোমাংস রান্নার কথার যে দাবি করা হয় তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ধর্মান্তর রোধে সচেতনতা: সনাতন ধর্মের সৌন্দর্য ও বিশ্ব কল্যাণময়তা

বর্তমান সময়ে ধর্মান্তর একটি গভীর সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে। বিশেষত যাদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান নেই, অথবা যারা বিভিন্ন প্রলোভন ও কুসংস্কারে প্রভাবিত, তাদের মাঝে এই সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে; আমরা কি নিজের ধর্মকে যথার্থভাবে জানিনবা প্রচার করি? আমরা কি উপলব্ধি করি, কতটা গভীর, সুসংহত, বিজ্ঞানসম্মত ও কল্যাণমুখী আমাদের সনাতন ধর্ম?

🔺 সনাতন ধর্ম : চিরন্তন ও অবিনশ্বর

'সনাতন' শব্দের অর্থ - চিরন্তন, যার কোনো শুরু নেই, শেষ নেই। এটি কোনো মানুষের প্রতিষ্ঠিত মত নয়, বরং ঈশ্বর থেকে উৎসারিত এক প্রাকৃতিক ও নৈতিক জীবনব্যবস্থা। এই ধর্ম হাজার-হাজার বছর ধরে ঋষিদের উপলব্ধি ও তপস্যার ফলস্বরূপ সংহত হয়েছে। এ ধর্মে মানুষের চিন্তা, চরিত্র, কর্ম, ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরলাভের পথ দেখানো হয়েছে।

"যে অতি উত্তম গুণযুক্ত সনাতন [নিত্য স্থায়ী] দেব [স্তুতিযোগ্য পরমেশ্বর] আছেন, তাঁকে যে মানব উপাসনা করবে; সে [সুখ দ্বারা] অনুভবযোগ্য হবে এবং আরো বিবিধ অন্ন [জীবনসাধন] ভোগ করবে।" ~ অথর্ববেদ ১০/৮/২২

অর্থাৎ সেই সনাতন পরমেশ্বরকে স্মরণকারী ব্যক্তি উত্তম ভোক্তা হন ও সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বিভিন্ন জীবনসাধন প্রাপ্ত হয়ে উন্নতি লাভ করতে থাকে।

"এই [সর্বব্যাপক] সনাতন [নিত্য স্থায়ী পরমাত্মা] এবং তিনি আজ [প্রতিদিন] নিত্য নবীন হয়ে থাকেন। দিন ও রাত্রি উভয়ে একে অপরের দ্বিবিধ রুপ দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে।" ~ অথর্ববেদ ১০/৮/২৩

অর্থাৎ রাত-দিনের এই চক্র সেই সৃষ্টির আদি হতেই চলছে। তারপরেও প্রতিটি দিন, প্রতিটি রাত আমাদের কাছে নতুনের মতো লাগে। ঠিক তেমনি অনাদি অনন্ত সনাতন হয়েও ঈশ্বর সবসময় নবীন।

এই ধর্ম আমাদের শেখায় যে ধর্ম কোনো কায়িক পরিচয় নয়, এটি আত্মার উন্নতি, প্রকৃতির যথাযথ উপযোগ গ্রহণ এবং সমন্বয়ের পথ।

🔺 সনাতন ধর্ম শান্তির ও সহিষ্ণুতার ধর্ম

সনাতন ধর্ম কখনোই জোরপূর্বক ধর্মপ্রচার, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা অর্থের লোভ দেখিয়ে কাউকে দীক্ষিত করার পন্থায় বিশ্বাস করে না। এটি মুক্ত চিন্তা, যুক্তি ও আত্মোপলব্ধিকে গুরুত্ব দেয়। বেদে বলা হয়েছে_

"বিশ্বের সকলকে আর্য অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ করো।" ~ ঋগ্বেদ ৯/৬৩/৫

"প্রকৃত মননশীল মানুষ হও এবং অন্যকেও মানুষ হিসেবে গড়ে তোল।" ~ ঋগ্বেদ ১০/৫৩/৬

"সর্বভূতের কল্যাণের মহৎ চিন্তায় নিজের মনস্থির করো।" ~ যজুর্বেদ ৩৪/১

এই কয়েকটি প্রেরণাই প্রমাণ করে; সনাতন ধর্ম গোঁড়ামি নয়, বরং সহনশীলতা ও উদারতার সর্বোচ্চ শিখর। এই ধর্ম অন্যকে তুচ্ছ না করে, নিজেকে ও অন্যকেও শুদ্ধ করে আত্মোন্নতির সাধনা শেখায়।

🔺 সংস্কৃতি ও আচার : শুদ্ধ জীবনযাপনের নির্যাস

সনাতন ধর্মের প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠান কেবল ধর্মীয় নয়, বরং মানবমাত্রের উপকার ও শৃঙ্খলার অংশ। যেমন: মানবমাত্রের কল্যাণ ও সুখ-শান্তির জন্য উপযুক্ত, তার সাধারণ কিছু বিষয় তুলে ধরা হলো।

এই ধর্মে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে এক সূত্রে গাঁথার জন্য এমন একটি শৃঙ্খলা রচিত হয়েছে, যা যুগে যুগে মানবসভ্যতার স্থিতি ও শুদ্ধতার জন্য অনন্য উদাহরণ।

🔺 বিশ্বকল্যাণময় দর্শন

সনাতন ধর্ম শুধু আত্মমুক্তির লক্ষ্য স্থির করেনি, বরং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ চেয়েছে। এখানে আত্মার মুক্তি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অন্যের কল্যাণও ততটাই প্রয়োজনীয়। বেদ-উপনিষদে বারবার বলা হয়েছে_

"হে মনুষ্য! উপরে ওঠাই হবে তোমার একমাত্র লক্ষ্য । পতিত হওয়া তোমার স্বভাবজাত নয় । দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন যাপনের শক্তি এবং দক্ষতা তোমাকে দেওয়া হয়েছে । এসো এবং পরমানন্দের এই শারীরিক রথে আরোহন করো এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করো । অন্যের কল্যাণের জন্য জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রচার করো।" ~ অথর্ববেদ ৮/১/৬

"হে মনুষ্য! তোমরা এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে মিলিয়া আলোচনা কর। তোমাদের মন উত্তম সংস্কার যুক্ত হউক। পূর্বকালীন জ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ উত্তম কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করিয়াছে, তোমরাও সেইরূপ কর।" ~ ঋগ্বেদ ১০/১৯১/২

"তোমাদের সকলের মত এক হউক, মিলন ভূমি এক হউক, মন এক হউক, সকলের চিত্ত সম্মিলিত হউক, তোমাদের সকলকে একই মন্ত্রে সংযুক্ত করিয়াছি, তোমাদের সকলের জন্য অন্ন ও উপভোগ একই প্রকারের দিয়াছি।" ~ ঋগ্বেদ ১০/১৯১/৩

"তোমাদের সকলের লক্ষ্য সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক। এই ভাবে তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।" ~ ঋগ্বেদ ১০/১৯১/৪

এই প্রার্থনায় কেবল সনাতনী নয়, সকল মনুষ্য তথা জীবের শান্তি ও মঙ্গলের আহ্বান জানানো হয়েছে। এটি একমাত্র সনাতন ধর্মেই সম্ভব, যেখানে জীবজগৎকে ‘পর’ নয়, ‘পরম’ জ্ঞানে দেখা হয়।

🔺 একজন সনাতনী ধর্মান্তরের ফলে কী হারায়?

সনাতন ধর্ম (হিন্দুধর্ম) কেবল একটি বিশ্বাস নয়; এটি একটি সভ্যতা, একটি জীবনচক্র, এবং একটি অনাদি সত্যের উত্তরাধিকার। কেউ যখন সনাতন থেকে ধর্মান্তরিত হয়, তখন সে কেবল উপাসনার রীতিনীতিই বদলায় না; বরং সে হারায় নিজের মূল, পরিচয়, বোধ এবং ভবিষ্যতের পথ। নিচে যুক্তিসম্মতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো, একজন সনাতনী ধর্মান্তরের মাধ্যমে কী হারায়:

১ . ঐতিহ্যগত আত্মপরিচয় ও বংশগত উত্তরাধিকার

সনাতন ধর্মের মূল শিকড় চলে গেছে বেদ তথা ঋগ্বেদীয় ঋষিদের পর্যন্ত; যারা "আত্মা", "ঋত", "ধর্ম", "যজ্ঞ" ও "তপস্যা"র মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধান করেছেন। ধর্মান্তরের মাধ্যমে ব্যক্তি তার এই মহাকালের উত্তরাধিকার বিসর্জন দেয়। সে আর সেই ঋষিসন্তান থাকে না, বরং নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয় শাশ্বত ঐতিহ্যের প্রবাহ থেকে।

২. যুক্তির স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশের পথ

সনাতন ধর্ম একমাত্র বিশ্বাসব্যবস্থা যেখানে ঈশ্বরকে প্রশ্ন করা, বিভিন্ন দর্শন অনুসন্ধান করা, এমনকি ঈশ্বরে অনাস্থাও প্রকাশ করা বৈধ। এখানে চার্বাক থেকে শুরু করে উপনিষদের আত্মজ্ঞান পর্যন্ত রয়েছে যুক্তির বৈচিত্র্য। ধর্মান্তরের ফলে ব্যক্তি এক কঠোর, একমাত্রিক ও 'অবৈধ প্রশ্ন নিষিদ্ধ' ব্যবস্থায় প্রবেশ করে, যেখানে যুক্তি নয়; অন্ধ আনুগত্যই ধর্ম।

৩. আত্মার অমরত্ব ও পুনর্জন্মের গূঢ় সত্য

সনাতন ধর্ম অনুযায়ী, আত্মা অজন্মা, অবিনাশী এবং বিভিন্ন জীবনে নিজের কর্মফলের মাধ্যমে উন্নতি করে মোক্ষলাভ করে। এই ধারাটি মহাজাগতিক ন্যায়বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ধর্মান্তরের পর এই দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যক্ত হয়, আর ব্যক্তি এক সংকীর্ণ ধারণায় বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় "এক জীবন, এক বিচার, একবারেই চিরস্থায়ী পুরস্কার বা শাস্তি"।

৪. বর্ণ ও আশ্রম - একটি পরিপূর্ণ জীবনচক্র

সনাতন ধর্মে জীবন একটি চক্র, যেখানে ব্যক্তি ব্রহ্মচার্য, গার্হস্থ্য, বনপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম পার করে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। এই ধারাটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা ও বয়সভিত্তিক মনোবিজ্ঞানকে সম্মান করে। ধর্মান্তরে ব্যক্তি হারায় এই জীবনের স্বাভাবিক উন্নয়নরূপকে, এবং ঢুকে পড়ে একরৈখিক, দমনমূলক ধারণার জালে।

৫. প্রকৃতি, উৎসব ও সংস্কৃতির বন্ধন

সনাতন ধর্মের প্রতিটি রীতি প্রকৃতি ও জীবনের সঙ্গে যুক্ত: প্রকৃতি শ্রদ্ধা / পূজা, বৃক্ষারোপণ, অন্নপ্রাশন, রথযাত্রা, দীপাবলি, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি। ধর্মান্তরের ফলে ব্যক্তি এইসব ঋতুবৈচিত্র্যভিত্তিক উৎসব ও জীবনের প্রাকৃতিক উদযাপনকে হারায় এবং গ্রহণ করে এককেন্দ্রিক, ইতিহাসবিচ্ছিন্ন ও সংস্কারহীন উপাসনা-সংস্কৃতি।

৬. যোগ, তপস্যা ও স্ব-উন্নয়নের ঐতিহ্য

সনাতন ধর্মে আত্মোন্নতি একমাত্র নিজ সাধনার ফল। যোগ, ধ্যান, ব্রত, উপবাস ও স্বচিন্তনের মাধ্যমে অর্জনই মোক্ষের পথ। ধর্মান্তরের পর ব্যক্তি নিজ সত্তার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং একটি বাইরের 'উদ্ধারকর্তা' বা 'বিশেষ বার্তাবাহকের' ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৭. জ্ঞান ও দর্শনের বিশাল ভাণ্ডার

বেদ, উপনিষদ, আচরণ্যক, মহাভারত, রামায়ণ, ভগবদ্গীতা, দর্শনসমূহ, সূত্রসমূহ ও সংহিতা ইত্যাদি - সব মিলিয়ে সনাতন ধর্ম এক অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। ধর্মান্তরের ফলে ব্যক্তি এই চিরন্তন মনীষার প্রবাহ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত করে এবং নিজ জ্ঞানের শিকড় হারিয়ে ফেলে।

৮. পূর্বপুরুষ ও পারিবারিক আত্মগৌরব

ধর্মান্তরের ফলে ব্যক্তির পারিবারিক সংস্কার ভেঙে যায়। সে নিজ ধর্মীয় উপভোগ্য ইত্যাদি সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলে।

৯. জাতি ও সভ্যতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

সনাতন ধর্মান্তর মানে কেবল আত্মপরিচয়ের বিলুপ্তি নয়, বরং হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আত্মত্যাগের প্রতি অবজ্ঞা। এক কালে যারা ঔপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়েছিলেন ধর্ম বাঁচাতে, ধর্মান্তরের ফলে তাদের আত্মোৎসর্গকেও অস্বীকার করা হয়।

১০. ভয়ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ ও মুক্তির মিথ্যে প্রতিশ্রুতি

সনাতন ধর্মে মুক্তি আসে জ্ঞান, সদাচরণ ও আত্মজয়ের মাধ্যমে। ধর্মান্তরের ফলে ব্যক্তিকে বলা হয় "তুমি পাপী", "তোমার পাপ মোচনের জন্য নির্দিষ্ট পথ ছাড়া মুক্তি নেই"। এটি ব্যক্তি-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অপমান এবং মানসিক পরাধীনতার এক রূপ।

🔺 ধর্মান্তরিত রোধের কার্যকর ধাপ সমূহ

এ-ই "ধর্মান্তর" ভয়াবহ বাস্তবতা থেকে আমাদের পরিবার, সমাজ ও প্রজন্মকে রক্ষা করতে হলে দরকার গভীর চেতনা, ধর্মীয় অনুশীলন ও সঠিক দিকনির্দেশনা। বাংলাদেশ অগ্নিবীর এই উদ্দেশ্যে যেসব কার্যকর নীতির কথা বলে, তা সত্যিকার অর্থেই একটি রক্ষাকবচরূপে কাজ করবে। যদি শিশু থেকেই একজন সন্তানের উপর এ-ই কার্যক্রম গুলো পূরণ করা হয়।

অগ্নিবীরের পঞ্চনীতি- যা প্রতিটি সনাতন অনুসারীর জানা ও পালন করা জরুরি:

১. বেদ ও বৈদিক শাস্ত্র পড়া ও পড়ানো

সনাতন ধর্মের মূল ভিত্তি হলো বেদ। বেদ মানে জ্ঞান; এই জ্ঞানই মানবজীবনের প্রকৃত লক্ষ্য নির্দেশ করে। অথচ অধিকাংশ সনাতনীই জানেন না তাঁদের ধর্মের শাশ্বত মূলভিত্তি কী, কেন তা শ্রেষ্ঠ। বেদ ও উপনিষদে এমন গভীর আত্মজ্ঞান, চেতনা, বৈজ্ঞানিক বোধ ও সর্বজনীন মানবিকতা রয়েছে, যা জানলে কেবল ধর্ম নয়; নিজেকে হারানোও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই পরিবার থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আশ্রম থেকে সমাজ; সবখানে নিয়মিত বেদাদি পাঠ, আলোচনা ও তার যথাযথ ব্যাখ্যা প্রচলন করতেই হবে।

২. সনাতন ধর্মের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরা

একটি জাতির আত্মপরিচয়ের মূলে থাকে তার ইতিহাস। সনাতন ধর্মের ইতিহাস কেবল আধ্যাত্মিকতাই নয়, ত্যাগ, জ্ঞান, শাসন, শিল্প ও মানবতার গৌরবগাথা। শ্রী রাম, শ্রী কৃষ্ণ, বিদুর, চাণক্য, মনু মহারাজ থেকে মহর্ষি দয়ানন্দ ও স্বামী বিবেকানন্দ; এনাদের সবাই আত্মমর্যাদা ও ধর্মনিষ্ঠার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। যখন একটি সমাজ তার ইতিহাস জানে না, তখন সে শিকড়হীন গাছের মতো; যা সামান্য বাতাসেই ভেঙে পড়ে। এই শিকড়হীনতাই বাইরের শক্তিকে ঢুকতে দেয়, ধর্মান্তরের সুযোগ তৈরি করে। তাই সনাতনের ইতিহাস পাঠ আবশ্যিক।

৩. ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে পার্থক্য জানানো

ধর্ম (Sanatan Dharma) কোনো মত নয়; এটি শাশ্বত, কারণ এটি প্রকৃতি ও চেতনার সাথে একাত্ম। এটি আত্মার, কর্মফলের ও মোক্ষের বিজ্ঞানসম্মত পথ। পক্ষান্তরে মতবাদ বা "ইজম" (ism) কেবল কোনো এক সময় বা সমাজে উদ্ভূত একটি বিশ্বাসের কাঠামো, যা পরিবর্তনশীল ও সংকীর্ণ। যখন সনাতন ধর্মকে অন্যান্য মতবাদের সমতুল্য ভাবা হয়, তখনই এর মৌলিক শ্রেষ্ঠত্ব ভেঙে পড়ে। তাই নতুন প্রজন্মকে শেখাতে হবে; সনাতন ধর্ম কোনো ধর্মীয় মত নয়, এটি জীবন ও ব্রহ্মাণ্ডের মৌলিক সত্য। এই পার্থক্য বোঝা মানেই আত্মরক্ষা।

৪. বৈশ্বিক ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা জানানো

বর্তমানে ধর্মান্তর কোনো সাধারণ ঘটনা নয়; এটি পরিকল্পিত, সংগঠিত ও বহুমাত্রিক একটি আগ্রাসন। একে শুধু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে হবে না। প্রেম, বন্ধুত্ব, উপহার, অর্থ, সাহায্য, মোহ; সব কিছুই এখন ব্যবহৃত হয় ধর্মান্তরের হাতিয়ার হিসেবে। শুধু কূপমণ্ডুক ভাবনায় আটকে থাকলে এই ফাঁদ বোঝা যাবে না। যুবসমাজকে

স্থানীয় ও বৈশ্বিক কৌশল, সিনেমা-সিরিজে স্নায়ুযুদ্ধ এসব বিষয়ে সচেতন করতেই হবে, নইলে তারা প্রেমের ছলে বা দয়ার ছলনায় সর্বস্ব হারাবে।

৫. সনাতন ধর্ম কেন শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মত্যাগের পরিণতি জানানো

সনাতন ধর্ম শ্রেষ্ঠ, কারণ এটি কেবল বিশ্বাস নয়; এটি একাধারে বিজ্ঞান, চেতনা ও কর্মনীতির পথ। এখানে ভক্তির সাথে যুক্ত আছে শক্তির সাধনা, কর্মের সাথে যুক্ত আছে আত্মউন্নয়ন, ও জ্ঞানের সাথে যুক্ত আছে মুক্তির দিশা। এই ধর্ম পরিত্যাগ মানে শুধু একটি পথ নয়; নিজেকেই হারানো। ধর্মত্যাগের পর একজন ব্যক্তি আত্মপরিচয়, সামাজিক স্বীকৃতি, ও নিজস্ব শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সে পড়ে অন্ধ অনুকরণে ও অপরিচিত ব্যবস্থায়। এটা এক ধরনের আত্মঘাতী বিকৃতি, যা ব্যক্তিকে ভেঙে দেয় এবং জাতিকে দুর্বল করে তোলে।

সনাতন ধর্ম কোনো কুসংস্কার নয়; এটি আত্মোপলব্ধি, শাশ্বত সত্য ও ন্যায়ের পথ। যারা জ্ঞানের আলোকে আন্তরিকভাবে ধর্মের গভীর অর্থ বোঝেন, তারা কখনোই নিজেদের ধর্মবোধ পরিত্যাগ করেন না। কারণ ধর্ম তাদের কাছে কেবল একটি বিশ্বাস নয়, বরং তা জীবনের মূল স্তম্ভ, আদর্শ, আচরণ, আত্মশুদ্ধি ও পরমার্থের পথ। সুতরাং আমাদের কর্তব্য; প্রথমে নিজে জানুন, তারপর বুঝুন, হৃদয়ে ধারণ করুন, চর্চা করুন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই আলো দেখান। একজন প্রকৃত সনাতনী কখনোই প্রলোভন, ভ্রান্ত প্রচার বা চাপে পড়ে ধর্মচ্যুত হন না; যদি তার মধ্যে থাকে আত্মবিশ্বাস, ধর্মজ্ঞান এবং নিজের শিকড়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

🔺 পরিশেষে, বিশ্ব কল্যাণের প্রর্থনা:

"অসত্য থেকে আমাকে সত্যে নিয়ে যাও, অন্ধকার থেকে আমাকে আলোতে নিয়ে যাও, মৃত্যু থেকে আমাকে অমৃতে নিয়ে যাও।" ~ বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ১।৩।২৮

"জগতের সবাই যেন সুখী হয়, সকলে যেন নিরাময় হয়, সকল মানুষ পরম শান্তি লাভ করুক, কশ্মিনকালেও যেন কেহ দুঃখ বোধ না করেন। ঈশ্বর আমাদেরকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার দুঃখ হতে শান্তি প্রদান করুন।" ~ উপনিষদ হতে অনুপ্রাণিত

"দ্যুলোক, অন্তরিক্ষলোক ও পৃথিবীলোক শান্তিময় হউক। জল, ঔষধি ও বনস্পতি শান্তিময় হউক। সব বিদ্বান, বেদপাঠ এবং যাহা কিছু, সবই শান্তিময় হউক। সর্বত্র শান্তিময় হউক। সেই শান্তি আমি যেন প্রাপ্ত হই।" ~ যজুর্বেদ ৩৬/১৭

ওঁ৩ম্ শান্তি। নমস্কার।

পিতা - মাতা - আচার্য ভুল করলে আমাদেরও কি করা উচিত ?

দেখ, মনু মহারাজ কী বলেছেন—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।

তেন যাযাৎসতাং মার্গং তেন গছন্ন রিষ্যতে ॥ মনু০ [৪।১২৮]

অর্থ - যে পথে পিতা এবং পিতামহ গমন করেছেন সেইপথে সন্তানও গমন করবে। কিন্তু 'সতাম্'= যদি পিতা এবং পিতামহ সৎপুরুষ হন তবে তাদের পথে চলবে এবং যদি পিতা, পিতামহ দুষ্ট হয় তবে তাদের পথে কখনও চলবে না । কারণ সৎপুরুষ ও ধর্মাত্মা পুরুষদের পথে চললে কখনও দুঃখ হয় না ।

- সত্যার্থ প্রকাশ, ৪র্থ সমুল্লাস

'যান্যস্মাকং সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি নো ইতরাণি।' এটি তৈত্তিরীয়োপনিষদের [১।১১] বচন ।

এর অভিপ্রায়, মাতা, পিতা ও আচার্য নিজ সন্তান ও শিষ্যদেরকে সর্বদা সত্য উপদেশ দিবেন এবং এও বলবেন -আমাদের যা যা ধর্মসঙ্গত কৰ্ম আছে সেগুলি গ্রহণ করবে এবং যা যা দুষ্ট কর্ম সেগুলো পরিত্যাগ করবে। যা সত্য বলে জানবে তা প্রকাশ ও প্রচার করবে, কোন পাষণ্ড ও দুষ্টাচারী মানুষকে বিশ্বাস করবে না।

- সত্যার্থ প্রকাশ , ২য় সমুল্লাস

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

সারাজীবন কি শিশু হয়ে থাকবেন ?

■শৈশব থেকে আত্মনির্ভরশীলতার পথে

ছোট শিশুদের জীবনে সুখ-দুঃখ স্বাভাবিকভাবেই আসে। যখন তারা সুখে থাকে, তখন আনন্দিত হয়। কিন্তু দুঃখ এলে তারা ঘাবড়ে যায় এবং অস্থির হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় শিশুরা তাদের বাবা-মা, বড় ভাইবোন বা পরিবারের অন্য সদস্যদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা ভাবে, "কেউ যদি আমার দিকে তাকায়, আমার দুঃখ বোঝে এবং আমাকে সাহায্য করে!" তখন তারা কাঁদতে শুরু করে। যদি তখন তাদের বাবা-মা বা বড় ভাইবোনরা তাদের সাহায্য করে, শান্ত করে এবং চোখের জল মুছে দেয়, তবে তারা একটু ভালো বোধ করে। কিন্তু এটা তো শিশুদের জন্য স্বাভাবিক।

■পরাধীনতা নয়, আত্মনির্ভরশীলতাই সুখের চাবিকাঠি

যদি আপনি সারাজীবন শিশুর মতোই শুধু অন্যদের দিকেই তাকিয়ে থাকেন, নিজের সমস্যা নিজে সমাধান করতে না শেখেন, তাহলে আপনি সারাজীবনই শিশু রয়ে যাবেন। শৈশবে অন্যের সাহায্য নেওয়া উচিত, কিন্তু সারাজীবন নয়। কারণ এটি আত্মনির্ভরতার নয়, বরং পরাধীনতার লক্ষণ। আর পরাধীন অবস্থায় কখনো প্রকৃত সুখ পাওয়া যায় না। তাই এটি সুখের অবস্থাও নয়।

তাহলে আপনি কতদিন শিশু সেজে থাকবেন? কতদিন অন্যের সাহায্যের জন্য মুখ চেয়ে থাকবেন? আপনি কি কখনো আত্মনির্ভরশীল হতে চাইবেন না?

যদি আপনি সত্যিই সুখী হতে চান, তাহলে যখনই জীবনে কোনো সমস্যা আসবে, তখন অন্যের দিকে না তাকিয়ে—নিজের যোগ্যতা বাড়িয়ে, নিজের ক্ষমতায় সমস্যার সমাধান করুন। যেদিন আপনি এতটা যোগ্য ও সক্ষম হবেন যে জীবনে সমস্যা এলেও আপনি কাঁদবেন না, আর যদি কখনো কাঁদতেও হয়, তাহলে নিজের অশ্রু নিজেই মুছে নিতে পারবেন—অর্থাৎ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারবেন, সেদিন বুঝে নেবেন—আপনি এখন বড় হয়েছেন।

যতদিন না এমনটা হচ্ছে, ততদিন ধরে নিন—"আমি এখনো শিশু, এখনো পরাধীন, এখনো স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি।" এই অবস্থা শৈশবে ঠিক আছে, কিন্তু সারাজীবন এরকম থাকাটা উচিত নয়, সুখকরও নয়।

■নিজের যোগ্যতায় সুখী হন

অতএব, আপনার বাবা-মা, গুরুজনদের উপদেশ ও নির্দেশ মেনে চলুন, তাদের সাহায্যে নিজের যোগ্যতা বাড়ান। জীবনের সমস্যাগুলো নিজে সমাধান করতে শিখুন। যোগ্য মানুষ হয়ে নিজের সমস্যাগুলোর সমাধান নিজেই করে সর্বদা সুখে থাকুন। প্রয়োজনে মাঝে মাঝে অন্যের সাহায্য নেওয়া নিষিদ্ধ নয়, তবে আমি শুধু এটুকুই বলছি—সর্বদা পরাধীন থাকবেন না। কারণ এই অবস্থা সুখের নয়।

— স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক

পরিচালক, দর্শন যোগ মহাবিদ্যালয়, রোজড়, গুজরাট

পৌরাণিক বিধি অনুযায়ী সতী নারীর বৈশিষ্ট্য কী কী ?

সতী নারীর সিঁদুরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ হিসেবে স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের [ধর্মারণ্যখণ্ড ৭।২৮] উদ্ধৃতি অনেকেই দিয়ে থাকে। যদিও সেখানে হলুদ, কুঙ্কুম, পানের উল্লেখও আছে যদিও তা অনুসৃত হয় না।

হরিদ্রাং কুকুমং চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা।

কূর্পাসকং চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভম্ ॥

পুরাণে যেখানে নারীর বা সতী নারীর প্রশংসা আছে, তার প্রতি ভালো কথা আছে সেখানে এসব নারীর জন্যই ভালো বলা। স্বাভাবিক সব নারীর জন্য নয়। অর্থাৎ যদি নিচের বৈশিষ্ট্য ঐ নারীর মধ্যে না থাকে তবে তার প্রতি এসব প্রযোজ্য না। তবে ঐ অধ্যায়েই বেদব্যাসের কথায় সতী নারীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে, শিবপুরাণের রুদ্রসংহিতাতেও পার্বতীখণ্ডের ৫৪তম অধ্যায়ে বিদ্যমান। যা নিম্নরূপ-

১। স্বামী খাওয়ার পর স্ত্রী খাবে, স্বামী দাঁড়ালে স্ত্রীও পেছেন পেছনে দাঁড়িয়ে যাবে। স্বামী যখন জাগবেন স্ত্রী যখন ঘুমাবে, আর স্ত্রী স্বামী যখন ঘুমাবেন স্ত্রী তখন জেগে থাকবে। স্বামী যদি বিদেশে থাকে বা কোথাও কোনো কাজে তবে স্ত্রী কোনো গয়না পড়বে না।

২। স্বামীর নাম স্ত্রী উচ্চারণ করবে না, পরপুরুষ তো দূরের কথা। স্বামী যদি স্ত্রীকে মারেও তবুও স্ত্রী খুশি থাকবে। স্বামী যা বলবে তাই করবে। যদি পালটা আঘাত করতে যায় স্ত্রী তবে পরজন্মে বাঘিনী হয়।

ভুঙ্ক্তে ভুক্তে স্বামিনি চ তিষ্ঠ তি ত্বনুতিষ্ঠতি ॥

বিনিদ্রিতে যা নিদ্রাতি প্রথমং পরিবুধ্যতি ॥

অনলঙ্কৃতমাত্মানং দেশান্তে ভর্তরি স্থিতে ॥
কার্যার্থং প্রোষিতে ক্বাপি সর্ব্বমণ্ড নবর্জিতা ॥
ভর্তুর্নাম ন গৃহ্ণাতি হ্যায়ুষোঽস্য হি বৃদ্ধয়ে ॥
পুরুষান্তরনামাপি ন গৃহ্ণতি কদাচন ॥
আকৃষ্টাপি চ নাক্রোশেত্তাড়িতাপি প্রসীদতি ॥
তাড়িতা তাড়য়েচ্চেত্তং সা ব্যাঘ্রী বৃষদংশিকা ॥

৩। খাদ্য যা পাবেন তা আগে স্বামীকে খাইয়ে তারপর তার উচ্ছিষ্ট স্ত্রী নিজে খাবেন।

সেবতে ভর্ত্তুরুচ্ছিষ্টমিষ্টমন্নং ফলাদিকম্ ॥

শিবপুরাণ রুদ্রসংহিতা পার্বতীখণ্ড ৫৪।২৬ অনুযায়ী উক্ত উচ্ছিষ্টকে মহাপ্রসাদ ভাবতে হবে।

মহাপ্রসাদ ইত্যুক্ত্বা পতিদত্তম্পতিব্রতা।

৪। সামাজিক উৎসব দেখবেন না, তীর্থে যাবেন না। যদি তীর্থে যেতে ইচ্ছা হয় তবে স্বামীর পা ধুয়ে জল পান করবেন।

দূরতো বর্জ্জয়েদেষা সমাজোৎসবদর্শনম্ ।
ন গচ্ছেত্তীর্থয়াত্রাদিবিবাহপ্রেক্ষণা দিষু ॥
তীর্থস্নানার্থিনী চৈব পতিপাদোদকং পিবেৎ ॥

৫। শিব ও বিষ্ণুর থেকেও স্বামী স্ত্রীর কাছে পূজ্য। যে নারী স্বামীর কথায় রাগ করে পালটা উত্তর দেয় সে পরের জন্মে কুকুর বা শিয়াল হয়।

শঙ্করাদপি বা বিষ্ণোঃ পতিরেবাধি কঃ স্ত্রিয়ঃ ॥
উক্তা প্রত্যুত্তরং দদ্যান্নারী যা ক্রোধতৎপরা ॥
সরমা জায়তে গ্রামে শৃগালী নির্জনে বনে ॥

৬। নারীদের একমাত্র পরমধর্ম হলো স্বামীর চরণযুগল পূজা করে আহার গ্রহণ করা।

স্ত্রীণাং হি পরমশ্চৈকো নিয়মঃ সমুদাহৃতঃ।
অভ্যর্চ্য চরণৌ ভতুর্ভো ক্তব্যং কৃতনিশ্চয়া ॥

৭। যে নারী স্বামীকে নিবেদন না করে মিষ্টি জাতীয় খাবার খায় সে পরজন্মে বিষ্ঠা খাওয়া গ্রাম্যশূকরী হয়।

যা ভর্তারং পরিত্যজ্য মিষ্টমশ্নাতি কেবলম্ ।
গ্রামে সা সূকরী ভূয়াদ্বল্গুলী বাথ বিঙ্ভুজা ॥

৮। যে নারী নিজের সতীনকে হিংসা করে সে দুর্ভাগা হয়ে থাকে।

যা সপত্নীং সদৈর্য্যেত দুর্ভগা সা পুনঃপুনঃ ॥

৯। যে নারী স্বামী মারা গেলে চিতায় তার সাথে সহমরণে যায় সেই নারী নিজের শরীরের লোমসংখ্যার সমান কোটি বছর স্বামীর সাথে স্বর্গসুখ ভোগ করে।

অনুব্রজন্তী ভর্তারং গৃহাৎপিতৃবনং মুদা ।
পদেপদেশ্বমেধস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥

যাবৎস্বলোমসঙ্খ্যাস্তি তাবৎকোট্যযুতানি চ ।

ভর্ত্রা স্বর্গসুখং ভুঙ্ক্তে রমমাণা পতিব্রতা ॥

১০। স্ত্রী বারান্দায় বা চৌকাঠে বসবে না।

নোলূখলে ন মুষলে ন বর্দ্ধন্যাং দৃষদ্যপি ।

ন যন্ত্রকে ন দেহল্যাং সতী চোপবিশেৎ ক্বচিৎ ॥

১১। সাধ্বী স্ত্রীরা উঁচু আসনে বসবে না, পরের বাড়ি বেড়াতে যাবেন না।

উচ্চাসনং ন সেবেত ন ব্রজেৎপরবেশ্মসু।

আর এসব বিধি কি পতি ভালো হলেই পালনীয় নাকি পতি খারাপ হলেও পালনীয় ? ব্যাসবচনে -

ক্লীবং বা দুরবস্থং বা ব্যাধিতং বৃদ্ধমেব বা ।

সুস্থিরং দুঃস্থিরং বাপি পতিমেকং ন লঙ্ঘয়েৎ ॥

অর্থাৎ, পতি ক্লীব, বৃদ্ধ, দুরবস্থা, সুস্থির, দুঃস্থির যেমনই হোক না কেন কখনোই পতিকে অতিক্রম করে কোনো কাজ করা যাবে না।

© বৈদিক সন্দেশ

কল্পসূত্রের বেদবিরুদ্ধ অরূপসমৃদ্ধ বিনিয়োগ ও বৈদিক সিদ্ধান্ত

৬টি বেদাঙ্গের মধ্যে কল্পসূত্র একটি শ্রেণি। বেদাঙ্গ বলতে বেদের সরাসরি অঙ্গ বুঝায় না, বুঝিয়ে থাকে যেভাবে অঙ্গ দেহের কার্যে সহায়ক সেভাবে বেদাঙ্গ বেদে বর্ণিত যজ্ঞাদি ও বিধিসমূহের সুবিন্যস্ত ঋষি প্রণীত বিধিমালা। বেদে যজ্ঞ, তার অঙ্গীভূত উপাদান ও ফল বর্ণনা করা হয়েছে, তার প্রয়োগ ঋষিগণ বেদাঙ্গের মধ্যে এই কল্পে তথা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ বিধায় সংজ্ঞায়িত উক্ত কল্পসূত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন। কল্পসূত্র ৪ প্রকার। যথা:

১। গৃহ্যসূত্র - গার্হস্থ্য ১৬ সংস্কার, ৫ মহাযজ্ঞ, ৭ পাকযজ্ঞ, গৃহনির্মাণ, গৃহপ্রবেশ, পশুপালন, কৃষিকর্ম, পার্বণ প্রভৃতি।

২। শ্রৌতসূত্র - বৃহৎ যজ্ঞ-যাগ-ইষ্টি যেমন দর্শপৌর্ণমাস, সোমযাগ, বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, সৌত্রামণী ইত্যাদি।

৩। শূল্বসূত্র - যাজ্ঞিক পরিমিতি ও জ্যামিতি।

৪। ধর্মসূত্র - পারিবারিক - সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কিত বিধিবিধান সূত্র।

কল্পসূত্র ঋষি বা আচার্য বা বিদ্বানদের লিখিত। অনেক কল্পসূত্র সাক্ষাৎ ঋষি প্রণীত না হয়ে উক্ত পরম্পরার কারো লিখিত প্রতিভাত হয়। অনেক কল্পসূত্রে সুস্পষ্টভাবে পরস্পরবিরোধীতা, বেদ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত বিদ্যমান। কল্পসূত্রে প্রক্ষেপণ কিংবা কালক্রমে সংযোজন সুধীমাত্রেই স্বীকার্য। এজন্য পূর্বমীমাংসাতেও কল্পসূত্রের স্বতঃপ্রমাণিকতা খণ্ডিত হয়েছে। আচার্য জৈমিনি বলেছেন,

সর্বত্র চ প্রয়োগাৎসন্নিধানশাস্ত্রাচ্চ

পূর্বমীমাংসা ১।৩।১৪

অর্থাৎ, কল্পসূত্রসমূহে অর্থ দ্বারা পরম সন্নিহিত বেদরূপ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ অর্থ প্রয়োগ পাওয়া যাওয়াতে তা বেদের ন্যায় স্বতঃপ্রমাণ নয়।

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী এজন্য কল্পসূত্রের যেভাবে উপযোগিতা স্বীকার করেছেন, তার বিধান মেনেছেন তেমনই বেদবিরোধী সূত্র ও বিধানকে অপ্রামাণ্য বলেছেন। যথা:

১। যে ব্রাহ্মণ বা সূত্র বেদবিরুদ্ধ হিংসাযুক্ত, তা প্রমাণ মনে করবে না। [সংস্কারবিধিঃ, বেদারম্ভপ্রকরণম্]

২। চারবেদের ব্রাহ্মণ, ছয়টি অঙ্গ, ছয়টি উপাঙ্গ, চার উপবেদ এবং বেদের ১১২৭ (এগারশত সাতাশটি) শাখা রয়েছে যেসব কিনা বেদের ব্যাখ্যানরূপে ব্রহ্মাদি মহর্ষি রচিত সেসব পরতঃপ্রমাণ অর্থাৎ বেদানুকূল হলে প্রমাণ এবং তন্মধ্যে বেদবিরুদ্ধ বচনসমূহকে অপ্রমাণ স্বীকার করি। [অথ স্বমন্তব্যামন্তব্যপ্রকাশঃ, সত্যার্থ প্রকাশ]

অর্থাৎ, কল্পসূত্রাদি আর্ষ ও স্বীকার্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কালক্রমে বেদের বিরুদ্ধে গিয়ে যেসব প্রক্ষিপ্ততা কিংবা দুর্বচন সংযুক্ত হয়েছে তা কখনোই স্বীকার্য নয়। এমতাবস্থায় বৈদিক সিদ্ধান্তকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে কল্পসূত্রের প্রামাণিকতা গৃহীত হবে। সেই যুক্তিবলেই আর্যগণ কল্পসূত্রকে যেমন গ্রহণ করেন তেমনই যুক্তিপূর্বক সমালোচনা ও খণ্ডন করে বেদ বিরুদ্ধ বক্তব্য নির্দ্বিধায় নিশঙ্কচিত্তে পরিত্যাগ করতে পিছুপা হন না। কল্পসূত্রের বিষয়ে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সময়ে-সময়ে বেদবিরোধী মতবাদীগণ স্বীয় স্বার্থে কিংবা অজ্ঞানতাবশত আর্ষ গ্রন্থে প্রক্ষেপ করে এই গ্রন্থসমূহকে কলুষিত করেছে। উক্ত বেদ বিরোধী গোষ্ঠী এখনো বিদ্যমান। যেভাবে তাদের পূর্বসূরীরা নিজের হীনস্বার্থ চরিতার্থের জন্য মহান আর্ষগ্রন্থকে দূষিত করেছে নানা স্থানে তেমনই তারাও এখনো আর্ষসিদ্ধান্তকে কলুষিত করছে সমাজে ও বিশ্বে সেই প্রক্ষিপ্ত বচনসমূহের দ্বারা। কিন্তু ভগবৎপাদ বেদার্থসূর্য শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর দর্শিত অখণ্ডনীয় বেদসিদ্ধান্তে তা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের স্বাধ্যায়হীনতার সুযোগে দুর্বচনের খণ্ডিতাংশ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে তারা অবিদ্যার অন্ধকারে রাখতে চায়। তাই আজ আমরা কল্পসূত্রের সেই বিধিগুলো দেখবো যা বেদবিরুদ্ধ, অপ্রামাণ্য কিন্তু যারা কল্পসূত্রকে অখণ্ডনীয় দেখিয়ে সনাতনকে কলুষিত করতে চায় তাদের মতে 'প্রামাণিক' হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য। আর যদি অস্বীকার করে তবে ভগবৎপাদের সিদ্ধান্তই জয়ী হয়। উদাহরণসমূহ-

১। অশ্বমেধ যজ্ঞে রাজার স্ত্রী বলি দেওয়া ঘোড়ার শিশ্ন=লিঙ্গ নিজের যোনিতে প্রবেশ করিয়ে যৌনসমাগম করবে

উৎসক্থ্যোর্গৃদং ধেহীতি প্রজননেন প্রজননং সংধায়াস্বে অস্বাল্যস্বিক ইতি মহিষ্যশ্বং গর্হতে ।

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২০।১৮।৪, বারাহ শ্রৌতসূত্র ৩।৪।৪।১৫

অর্থাৎ মহিষী স্বীয় প্রজনন অঙ্গে অশ্বের প্রজনন অঙ্গ গ্রহণ করবে। তথা, রাজার স্ত্রী ঘোড়ার লিঙ্গকে নিজের যোনিতে ঢোকাবে।

মহিষ্যুপস্থে শেফমাধত্ত আহমজানি গর্ভধমা ত্বমজাসি গর্ভধম্।

বৌধায়ন শ্রৌতসূত্র ১৫।২৯

অর্থাৎ , মহিষী স্বীয় উপস্থে অশ্বের শেফ [শিশ্ন] ধারণ করে গর্ভ কামনা করবে।

সংজ্ঞপ্রায় মহিষীমুপনিপাতয়ন্তি। তাবধীবাসেন সংপ্রোর্ণুবতে। তৌ যজমানোঽভিমেথতি। উৎসক্থ্যোরব গুদং ধেহ্যর্বাঞ্চমঞ্জিমা ভর। যঃ স্ত্রীণাং জীবভোজনঃ।

শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৬।৩।৩৩-৩৬

অর্থাৎ 'অভিমেথনমশ্লীলভাষণেন মর্মযুক্তঃ পরীহাসঃ....প্রজননং শিশ্নং আভরাভিমুখেনানয়োঃ ঊর্বাঃ ' এখানে অশ্লীলভাষণ করতে হবে... প্রজনন অঙ্গ তথা অশ্বের শিশ্ন এগিয়ে আনতে হবে।

অশ্বশিশ্নমুপস্থে কুরুতে বৃষা বাজীতি।

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ২০।৬।১৬

অর্থাৎ, যজমানের স্ত্রী ঘোড়ার লিঙ্গকে যোনীতে প্রবেশ করিয়ে 'বৃষা বাজী' ইত্যাদি [যজুর্বেদ ২৩।২০] মন্ত্র পাঠ করবেন ।

২। আ তে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্বাণ ইবেষুধিম্, আ বীরো অত্র জায়তাং পুত্রস্তে দশমাস্যঃ।

শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্র ১.১৯.৬

অর্থাৎ, অন্য নারীতে কন্যা সন্তান যেন হয় এটা বলে নিজের জন্য পুত্র কামনা করা হচ্ছে।

৩। অথ হাঽস্য বেদমুপশৃণ্বতস্ ত্রপুজতুভ্যাং শ্রোত্রপ্রতিপূরণমুদাহরণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীরভেদঃ ॥

গৌতম ধর্মসূত্র ২।৩।৪ [১২।৪]

অর্থাৎ, শূদ্র বেদ শ্রবণ করলে কানে সীসা, উচ্চারণ করলে জিহ্বা চ্ছেদন ও ধারণ করলে শরীর কেটে ফেলতে হবে।

৪। আরট্টান্ কারস্করান্ পুণ্ড্রান্ সৌবীরান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ প্রানূনান্ ইতি চ গত্বা পুনস্তোমেন যজেত সর্বপৃষ্ঠয়া বা ॥

বৌধায়ন ধর্মসূত্র ১।১।২।১৪,১৫

অর্থাৎ, বঙ্গদেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

৫। উপবহায়োদকং পিবেত্তৃণানি চাচ্ছিন্দ্যাৎ উপ মাতরমিয়াদুপ স্বসারমুপ সগোত্রাম্ ॥

আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র ২২.১৩.২

অর্থাৎ, গোসব নামক যজ্ঞে ১ বছর ধরে মা ও বোনের সাথে যৌন সমাগম করতে হবে।

৫। অনুস্তরণ্যাবপামুৎখিদ্য শিরোমুখং প্রচ্ছাদয়েদগ্নের্বর্মপরিগোভির্ব্যযস্বেতি। বৃক্কা উদ্ধৃত্য পাণ্যোরাদধ্যাদতিদ্রবসারমেয়ৌ শ্বানাবিতি দক্ষিণে দক্ষিণং সব্যে সব্যম্। হৃদয়ে হৃদয়ং। পিণ্ডৌ চৈকে। বৃক্কাপচার ইত্যেকে। সর্বাং যথাঙ্গং বিনিক্ষিপ্য চর্মণা প্রচ্ছাদ্যেমমগ্নে চমসং মা বি জিহ্বর ইতি প্রণীতাপ্রণয়নমনুমন্ত্রয়তে।

আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ৪।৩।১৯-২৪

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় মৃতদেহের আয়াথে যে গাভী বা স্ত্রী-ছাগকে সঙ্গে আনা হয়েছে তাকে বধ করে বপা (মেদ) উৎপাটন করা হয়। সেই বপা দিয়ে মৃতের মস্তক ও মুখ আচ্ছাদিত করবেন। পশুর দুই বৃক্ক ও দুই অন্নপিণ্ড মৃতের দুই হাতে এবং হৃৎপিণ্ডটি হৃৎপিণ্ডের উপরে রাখতে হয়। পশুর চর্মটি বিছিয়ে দেওয়া হয় মৃতের শরীরে।

৬। তৈষ্যা ঊর্ধ্বমষ্টম্যাং গৌঃ। অথৈনামুদগুৎসৃপ্য সংজ্ঞপয়ন্তি। প্রাক্শিরসমুদক্পদীং দেবদেবত্যে। দক্ষিণাশিরসং প্রত্যক্পদীং পিতৃদেবত্যে। সংজ্ঞপ্তায়াং জুহুয়াদ্যৎপশুর্মায়ুমকৃতেতি।

গোভিল গৃহ্যসূত্র ৩।৯।১৪,২১-২৪

পৌষমাসের পূর্ণিমার পরের অষ্টমীতে গোরুর মাংস নিয়ে মাংসাষ্টকা করবে। ঋত্বিকরা গাভীকে অগ্নির উত্তর দিকে নিয়ে কেটে ফেলবে। গাভী কাটা শেষ হলে অগ্নিতে হোম করবে।

৭। মধ্যেঽগ্নিমুপসমাধায় কৃষ্ণয়া গবা যজেতাজেন বা শ্বেতেন সপায়সাভ্যাম্ পায়সেন বা।

গোভিল গৃহ্যসূত্র ৪।৭।১৬-১৯

অর্থাৎ, বাস্তুভূমির মধ্যে অগ্নি জ্বালিয়ে কালো গাভীর মাংস কিংবা সাদা ছাগলের মাংস দিয়ে যাগ করবে। যদি সাথে পায়েস থাকে আরো ভালো। নাহলে কেবল পায়েস দিয়েই যজ্ঞ করবে।

৮। আচান্তোদকায় গৌরিতি নাপিতস্ত্রির্ব্রূয়াৎ। কুরুতেত্যধিযজ্ঞম্।

গোভিল গৃহ্যসূত্র ৪।১০।১৭,২১

অর্থাৎ, নাপিত এসে ৩ বার জিজ্ঞাসা করবে গাভীকে কাটতে হবে কি না। এরপর তাকে 'কর' বলে আজ্ঞা দিলে গাভীকে মেরে ফেলবে।

৯। মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকর্ম্মণি ।

অত্রেব চ পশুং হিংস্যান্নান্যথেত্যব্রবীন্মনুঃ ॥

অথাপি ব্রাহ্মণায় রাজন্যায় বা অভ্যাগতায় বা মহরেক্ষং বা মহাজং বা পচেদেবমস্যাতিথ্যং কুর্বন্তীতি ।

বাসিষ্ঠধর্মসূত্র ৪।৬,৮

অর্থাৎ, পিতৃকার্য, দেবপূজা ও অতিথিসৎকারে পশুহিংসা করতে পারবে। মনুবাক্যে, মধুপর্ক, যজ্ঞ, পিতৃকার্য ও দেবকার্য এসবেই পশুহিংসা করবে। অন্যথা পশুহিংসা করবে না। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অতিথি হয়ে এলে তার জন্য বড় ষাঁড় বা বড় ছাগল রান্না করবে; এভাবে আতিথ্য করা নিয়ম। [পূর্বে ৬ষ্ঠ সূত্রে হিংসার উল্লেখ থাকায়, ৮ম সূত্রে পচৎ অর্থ ভিন্ন করা সম্ভব নয়]।

ষণ্ণাং চেদর্ঘ্যাণামন্যতম আগচ্ছেদ্গোপশুমজমন্নং বা যৎসামান্যতমং মন্যেত তৎকুর্যান্। নামাঁসোঽর্ঘঃ স্যাদ্।

শাঙ্খ্যায়ন গৃহ্যসূত্র ২।১৫।১-২

অর্থাৎ, অর্ঘ্য লাভের জন্য ৬ জন ব্যক্তির কাছে গোরু, ছাগল বা যে খাদ্য উপযুক্ত মনে করেন তা প্রস্তুত করবেন। অর্ঘ্য মাংস ছাড়া হবে না।

১১। দদ্যাদ্গুণবতে কন্যাং নগ্নিকাং ব্রহ্মচারিণে ।

অপি বা গুণহীনায় নোপরুন্ধ্যাদ্রজস্বলাম্ ॥

বৌধায়ন ধর্মসূত্র ৪র্থ প্রশ্নে ১০ম অধ্যায় ১২ সূত্র, হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র ১।৬।১৯।২

অর্থাৎ, কন্যাকে নগ্নিকা বয়সকালেই ব্রহ্মচারীর সাথে বিয়ে দিতে হবে, বর গুণবান হোক বা না হোক। রজস্বলা হওয়ার পর পিতার ঘরে রাখা উচিত নয়।

১২। গৌরস্যপহতপাপ্মাপ....উৎসর্গেন্যেন মাংসেনান্নং সংস্কৃত্যাথাস্মৈ...ব্রাহ্মণানেভাজয়ত

হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্র ১।৪।১৪।১২-১৫

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণকে গোরু উৎসর্গ করে তার মাংস অন্নের সাথে ভোজন করাবে।

১৩। শ্বোভূতে দর্ভেণ গামুপাকরোতি পিতৃভ্যস্ত্বা জুষ্টামুপাকরোমীতি ৩

তূষ্ণীং পঞ্চাজ্যাহুতীর্হুত্বা তস্যৈ বপাং শ্রপয়িত্বোপস্তীর্ণাভিঘারিতাং মধ্যমেনান্তমেন বা পলাশপর্ণেনোত্তরয়া জুহোতি ৪

মাংসোদনমুত্তরাভিঃ ৫

আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র ৮।২২।৩-৫

অর্থাৎ, গোরুকে দর্ভ দ্বারা স্পর্শ করে তাকে হত্যা করতে হবে। এরপর তার পেটের চর্বি আহুতি দেন। তারপর ভাত ও গোরুর মাংস একত্রে আহুতি দেন।

এভাবে প্রতিটি কল্পসূত্রে আমরা বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ, অশ্লীলতা যা কিনা পরবর্তী যুগে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে তা প্রদর্শন করা যায়। আমরা খুবই সামান্য দেখালাম। আমরা প্রবন্ধের প্রথমেই বলেছি প্রক্ষিপ্ত তথা বেদ বিরুদ্ধ শ্লোক ব্যতীত সার্বিক সিদ্ধান্ত বেদানুকূলতা সাপেক্ষে মান্য । তাই কল্পসূত্র মাত্রেই যারা আর্য সিদ্ধান্তকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে উদ্যত হন তাদের প্রতি সতর্কতা প্রদর্শন করা হলো।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

রজঃস্বলা মীমাংসা

নমস্কার,

বর্তমান সময়ে সনাতন ধর্মে নারীদের অধিকার বা তাঁদের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে কথা বললেই একদল নামধারী পণ্ডিত বলে উঠে, "নারীরা নরকের দ্বার", একথা আমার নয়, একথা বলেছেন শঙ্করাচার্য নিজেই; [রেঃ প্রশ্নোত্তরী ৩]। শুধু তাই নয় সেই পণ্ডিতদের চোখের মণি শ্রীমদ্ভাগবতে বলা রয়েছে "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" [রেঃ ভাগবত-১/৪/২৫] অর্থাৎ, স্ত্রী, শূদ্র, পতিত দ্বিজাতি—এরা তিন শ্রেণীই বেদ শ্রবণে অনধিকারী। তাই তারা নারীদের সর্বদা অবহেলার নজরে দেখে। আর তাদের মুখেই যদি শোনেন যে, নারীর রজঃস্বলা অবস্থায় যজ্ঞাদি কর্মের অধিকার নেই। তো এ আর এমন কি? যারা সাধারণ ভাবেই এতটা নারী বিরোধী, তারা তো রজঃস্বলা অবস্থায় নারীদের অপবিত্র বলবেই।

তবে এখানে বেশ মজার বিষয় হচ্ছে, সেইসব নামধারী কিছু পণ্ডিত বেশকিছু শাস্ত্রীয় রেফারেন্স দিয়ে "নারীরা রজঃস্বলা অবস্থায় যজ্ঞাদি কর্মে অনধিকারী" প্রমাণের চেষ্টা চালাচ্ছে। আজকের এই পর্বে, সেগুলোর খণ্ডন ও বেদাদি শাস্ত্রের বিবিধ রেফারেন্স দিয়ে নারীর রজঃস্বলা বিষয়ে বিস্তারিত লিখবো।

ভাগবত পুরাণেই বলা রয়েছে যে, "বেদপ্রণিহিতো ধর্মো হ্যধর্মস্তদ্বিপর্যয়" [রেঃ শ্রীমদ্ভাগবত- ৬/১/৪০] অর্থাৎ, একমাত্র বেদে যা বলা আছে তাই ধর্ম; পক্ষান্তরে যা বেদনিষিদ্ধ তা সকলই অধর্ম এবং বিপর্যয়ের পথ।

কেন এইরকমটা বলা হলো জানেন কি? কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য অকার্য ব্যবস্থিতৌ" [গীতা ১৬/২৪] অর্থাৎ, হে অর্জুন কোনটা তোমার কর্তব্য ও কোনটা তোমার অকর্তব্য; উভয়ের নির্ণয়ে বেদ হলো প্রমাণ। এখন আপনারা বলতেই পারেন যে, উক্ত শ্লোকে তো "শাস্ত্র" শব্দ রয়েছে, তাহলে আপনি বেদ পেলেন কোথায়? দেখুন ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত দর্শনের [রেঃ ১/১/৩] মধ্যে শাঙ্করভাষ্যে শঙ্করাচার্য নিজেই শাস্ত্র শব্দের অর্থ বেদ করেছেন। এখন তবুও আপনার সংশয় নিবারন হলো না, এবার তাহলে আমরা দেখে নেই মহর্ষি আপস্তম্ব কী বলেছেন বেদ সম্পর্কে - "বেদাশ্চ" = 'বেদ এব মূলং প্রমাণম্ ধর্ম অধর্মঃ' [রেঃ আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১/১/১/৩] অর্থাৎ, ধর্ম-অধর্ম নির্ণয়ে মূল প্রমাণ হচ্ছে পবিত্র বেদ। শুধু এতটুকুই নয়, এই বিষয়ে মহর্ষি মনু বলেছেন "বেদোঽখিলো ধর্মমূলং" [রেঃ মনুস্মৃতি ২/৬] অর্থাৎ, বেদ হলো সনাতন ধর্মের মূল। মহর্ষি মনু আরও বলেছেন "ধর্ম জিজ্ঞাস মানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ" [রেঃ মনুস্মৃতি ২/১৩] অর্থাৎ, কেউ যদি ধর্ম-

অধর্ম সম্পর্কে জানতে চায় তাঁর জন্য পরম প্রমাণ হচ্ছে পবিত্র বেদ। এছাড়াও মীমাংসা দর্শনে মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন 'বেদ হচ্ছে স্বতঃ প্রমাণ' [রেঃ মীমাংসা দর্শন ১/১/৫]।

এখন একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করুন —

য়া বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো য়াশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।

সর্বাত্মা নিষ্ফলা প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতা॥

[মনুস্মৃতি ১২/৯৫]

অর্থঃ (য়া বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ঃ) সংসারে যে বেদোক্ত ধর্মের প্রতিকূল স্মৃতি তৈরি হবে বা রয়েছে (চ) এবং (য়া কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ) যে সমস্ত বেদবিরোধী বিচার রয়েছে বা তৈরি হবে (তাঃ সর্বাঃ নিষ্ফলাঃ) সেই সব নিষ্ফল। (তাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠাঃ হি স্মৃতাঃ) সেগুলো পরলোকে নিশ্চিত রূপে তমোগুণী দুঃখময় জন্মকে প্রাপ্ত করায়।

পরবর্তী শ্লোকের সরলার্থে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী বলেছেন – "যে সমস্ত গ্রন্থ এই বেদের সহিত বিরুদ্ধ হবে বা রয়েছে, সেগুলো আধুনিক হওয়ায়; সেগুলোর মান্যতা নিষ্ফল ও মিথ্যা।" [মনুস্মৃতি ১২/৯৬]

এবার আসি সেই নামধারী পণ্ডিতদের দাবিতে ~~

★ আপস্তম্ব সংহিতা ৭/৩ মধ্যে নারীদের রজঃস্বলা কালে নারীকে অপবিত্র বা অসূচী বলা হয়েছে।

মীমাংসা – তাদের এই উল্লেখিত সূত্রটি [আপস্তম্ব ধর্মসূত্র ১/১/১/৩] এর সহিত সাংঘর্ষিক; কারণ এখানে ধর্মের মূখ্য প্রমাণ হচ্ছে বেদ, আর বেদমন্ত্রে বলা রয়েছে যে, নারীরা সর্বদা পবিত্র বা শুভ্রময়ী। [রেঃ অথর্ববেদ ১১/১/১৭]।

☞ এই দাবিটি মনুস্মৃতি [১২/৯৫] তথা আপস্তম্ব ধর্মসূত্র [১/১/১/৩] এর আলোকে বেদমন্ত্রের সহিত সাংঘর্ষিক হওয়ায় পরিত্যাজ্য।

★ অঙ্গিরঃ সংহিতা ১/৩৫ ও ১/৩৭ মধ্যে বলা হয়েছে যে, "যে পর্যন্ত রজঃপ্রবৃত্তি হয়, (অর্থাৎ তিন দিন) তাবৎ (ততদিন) স্ত্রীলোক সদাচার (পবিত্র) নহে।"

এই সূত্রে বর্ণিত বিষয় [যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি ১/৭১] এর সহিত সাংঘর্ষিক। সেখানে বলা রয়েছে, "নারীজাতি সোম থেকে শুদ্ধতাপ্রাপ্ত, গন্ধর্বদের থেকে সুমিষ্ট বাক্য প্রাপ্ত, অগ্নির কাছ থেকে শুদ্ধতাপ্রাপ্ত; তাই নারীরা [সর্বদা] শুদ্ধ।"

☞ এখানে তাদের উল্লেখিত স্মৃতিবাক্য অন্য স্মৃতির সহিত মিলছে না। এরূপ অবস্থায় একটিকেই মান্যতা প্রদান করতে হবে, এবং যেই স্মৃতিবাক্য বেদমন্ত্রের অনুরূপ বা বেদের অনুকূল হবে, তাই গ্রহণযোগ্য। অথর্ববেদ [১৪/২/২৮] এ বলা রয়েছে "এই বধু মঙ্গলময়ী, সকলে মিলিয়া ইহাকে দেখো, ইহাকে সৌভাগ্য দান করিয়া দূর্ভাগ্য বিদারিত করো।" যেখানে বেদমন্ত্রে নারীকে মঙ্গলময়ী বলা হয়েছে, সেখানে স্মৃতিতে নারীকে অপবিত্র বলা হলে তা আদৌ গ্রহণযোগ্য হবে না।

★ তাদের অপযুক্তি তৈত্তিরীয় সংহিতা (কৃষ্ণ যজুর্বেদ) [২/৫/১/৫-৬] মধ্যে, "নারীরা রজঃস্বলা কালীন অপবিত্র, এবং তাঁদের স্পর্শ করা অন্ন কারোর গ্রহণ করা উচিত নয়"। প্রথমত, এই কৃষ্ণ যজুর্বেদ প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ নয়। তাই এর কোনো প্রমাণ আমরা মান্য করবো না।

★ তাদের দাবী মীমাংসা দর্শন [৩/৪/১৮] তে স্ত্রীদের রজঃস্বলা অবস্থায় তাঁদের সহিত কথাবার্তা নিষেধ।

আদৌ কি তাই লেখা রয়েছে,,,? চলুন দেখে নেই—

"প্রাগপরোধান্মলবদ্বাসসঃ॥"

অর্থ- (প্রাক্) দর্শ-পূর্ণমাস কর্মানুষ্ঠান প্রারম্ভ করার পূর্বে উপবাসের দিন (মলবদ্বাসসঃ) রজঃস্বলা স্ত্রীর (অপরোধাৎ) অপরোধ-অবরোধ হওয়ায়। ঔপবসথ্য বা দীক্ষার দিনেই যদি যজমান-পত্নী রজঃস্বলা হয়ে যায়, তো যজ্ঞে তাঁর উপস্থিতি বর্জিত করা হয়েছে। তখন দর্শ-পূর্ণমাস কর্মানুষ্ঠানের সময়ে রজঃস্বলা স্ত্রীর অনুপস্থিত হওয়ায় তাঁর সাথে সংবাদ আদির সম্ভাবনাই নেই।

☞ পাঠকগণ, এখানে ভালোভাবে লক্ষ্য করুন। প্রথমত দর্শ-পূর্ণমাস কোনো নৈমিত্তিক যজ্ঞকর্ম নয়। এটি বিশেষ সময়ে পালনীয়। তো এই কর্মের কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে যে, এই কর্মের পূর্বে ঔপবসথ্য [এর একটি অংশ উপবাস] থাকতে হয়। এখন উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে যদি ঔপবসথ্য না করা হয়, তো তাঁকে সেই যজ্ঞ কর্ম থেকে বিশ্রাম প্রদান করা হয় এবং সে যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত থাকে না [অন্যান্য নৈমিত্তিক যজ্ঞ, তাঁরা করতে পারে]। আর স্বভাবতই যেখানে উক্ত ব্যক্তি উপস্থিতই থাকে না, সেখানে তাঁর সাথে সংবাদ (বার্তালাপ) হওয়া অসম্ভব কিছুই নয়। এখানে আরেকটি শঙ্কা উঠতে পারে যে, রজঃস্বলা হলে ঔপবসথ্য কেন হয় না? দেখুন ঔপবসথ্যের একটি অংশ হলো উপবাস। যেহেতু রজঃস্বলা অবস্থায় নারীদের শরীর দুর্বল হয়ে থাকে, তাই তৎকালে তাঁদের ঔপবসথ্য করার সামর্থ বা শারীরিক শক্তি থাকে না।

[আর এইসব বিষয়ে বিস্তারিত না জেনেই নামধারী পণ্ডিতগণ বলে বেড়ায়, রজঃস্বলা অবস্থায় নারীদের যজ্ঞে অধিকার নেই]

★ তাদের আরও একটি যুক্তি হলো যে, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর অমর গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের একাদশ সমুল্লাসে "রজঃস্বলা নারীদের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ" বলেছে।

তো চলুন আমরা সত্যার্থ প্রকাশ থেকেই দেখে নেই—

"এই সকল গণ্ডমূর্খ পোপের লীলা দেখ! এই বামমার্গীগণ বেদবিরুদ্ধ মহাপাপজনক কার্যগুলোকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করলো। তারা মদ্য, মাংস, মীন অর্থাৎ মৎস, মুদ্রা, পুরী, কচুরী, বৃহৎ রুটি প্রভৃতি চর্বণ; যোনি, পাত্রাধার মুদ্রা এবং পঞ্চম মৈথুন অর্থাৎ সকল পুরুষ শিব এবং সকল স্ত্রীকে পার্বতী তুল্য মনে করে-

"অহং ভৈরবস্ত্বং ভৈরবী হ্যাবয়োরস্তু সঙ্গমঃ॥" কু০ ত০

যে কোনো স্ত্রী বা পুরুষ হোক না কেন, এই নিরর্থক অকথ্য বচন পাঠ করে সমাগম করা বামমার্গীগণ দোষজনক মনে করে না। অর্থ্যাৎ যে সকল হীনচরিত্রা স্ত্রীলোককে স্পর্শ করতে নাই, তাহাদিগকে ইহারা অতি পবিত্র মনে করে। শাস্ত্রে রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের স্পর্শ নিষিদ্ধ। বামমার্গীগণ তাকেও অতি পবিত্র মনে করে।**"** [সত্যার্থ প্রকাশ, একাদশ সমুল্লাস]

☞ বিশেষ রূপে বিশ্লেষণ — কতবড় কাণ্ডজ্ঞানহীন হলে তারা মহর্ষির কথাকে ভুলভাবে প্রচার করে, দেখুন। মহর্ষিজী এখানে প্রথমে বলেছেন যে বামমার্গীগণ সকল নর-নারীকে শিব-পার্বতী ভেবে উপরোক্ত মন্ত্র জপ করে সমাগম করাকে উচিত মনে করে, এমনকি সেই নারী যদি চরিত্র হীনও হয় তবুও তারা তাকে পবিত্র মনে করে। তৎপশ্চাৎ তিনি বলেছেন "শাস্ত্রে রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের স্পর্শ নিষিদ্ধ" কেন বলেছেন? কারণ তাঁরা সেই সময় দুর্বল হয়ে থাকে, তো সেই সময় তাঁরা সাধারণ কার্য থেকেই দূরে থাকবে। তো, তাঁদের সহিত শারীরিক সম্পর্কের কথা তো বাদই। কিন্তু বামমার্গীগণ তাঁদেরকেও অতি পবিত্র মনে করে সম্ভোগের জন্য। এইজন্যই মহর্ষি জী

বলেছেন যে, রজঃস্বলা নারীগণ স্পর্শের যোগ্য নয়, তা কোন উদ্দেশ্যে? কামে (যৌনতার) এর উদ্দেশ্যে। কেন তিনি এই প্রকরণে এই কথা বললেন? কারণ বামমার্গীগণ সর্বদা নারীদের ভোগ্য বস্তু মনে করে। তাই মহর্ষি উপরোক্ত কথাটি বলেছেন। কিন্তু বর্তমানে তার উল্টো অর্থ বের করে অনেকেই প্রচার করতেছে যে, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী রজঃস্বলা স্ত্রীদের স্পর্শ যোগ্য মনে করেন নি। যা অত্যন্ত ধিক্কার জনক কার্য।

★তাদের আরেকটি দাবি হলো মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তার নিজ গ্রন্থ "সংস্কার বিধিতে" রজঃস্বলা নারীদের অপবিত্র মনে করেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের সাইটে বহু পূর্বেই লেখা রয়েছে।

ইতিপূর্বে আমরা নামধারী পণ্ডিতদের যারা রজঃস্বলা অবস্থায় নারীদের অপবিত্র মনে করতো এবং তাঁদের যজ্ঞে অধিকার নাই, এরূপ মানতো; তাদের সমস্ত যুক্তি বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে খণ্ডন করেছি। এখন আমরা জানবো আমাদের আর্য পরম্পরার সিদ্ধান্ত।

"রজঃস্বলা বিষয়ের উপর আর্য পরম্পরার সিদ্ধান্ত"

এই সময়ে আমাদের মা-বোনেদের শরীরের একপ্রকার দুর্বলতা অনুভব হয়। আর এই শারীরিক ব্যবস্থা ঈশ্বর প্রদত্ত প্রকৃতির নিয়ম। এই সময়ে তাঁদের অন্যান্য পরিশ্রমযুক্ত কাজও করা উচিত নয়, কারণ তাঁদের শরীর তখন কাজ সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত থাকে না, তখন তাঁদের উচিত বিশ্রাম করা। সেই সময় তাঁরা আত্ম চিন্তন, উত্তম পুস্তকের অধ্যয়ন, জ্ঞান আহরন করবে। এখন আসি যজ্ঞ তথা অগ্নিহোত্র এবং নিত্যকর্ম আদি বিষয়ে।

মনুস্মৃতিতে প্রতিদিন গায়ত্রী জপের বিধান রয়েছে, অর্থাৎ একদিনও গায়ত্রী পাঠ ব্যাতিত থাকা উচিত নয়। দেখুন-

अपां समीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः । सावित्रीमप्यधीयीत गत्वारण्यं समाहितः ॥

[মনুস্মৃতি ২/১০৪]

অর্থ- (নৈত্যকং বিধিম্ + আস্থিতঃ) সন্ধ্যোপাসনার অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি (অরণ্যং গত্বা) বন প্রবেশ অথবা একান্ত শান্ত প্রদেশে গিয়ে (অপাং সমীপে নিয়তঃ) জলস্থানের নিকট উপবেশন করে (সমাহিতঃ) ধ্যানমগ্ন হয়ে (সাবিত্রীম্ + অপি + অধীয়ীত) সাবিত্রী অর্থাৎ গায়ত্রী মন্ত্রের অর্থ সহিত জপ-চিন্তন করবে এবং তদানুসারে আচরণ করবে।

☞ এখানে গায়ত্রী মন্ত্র দ্বারা নিত্য সন্ধ্যা উপাসনার বিধি কথিত হয়েছে। একই সিদ্ধান্ত মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর অমর গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের তৃতীয় সমুল্লাসে দিয়েছেন। এই একই বিষয়ে [ঋগ্বেদ ৮/৬/২৮] মধ্যে বলা রয়েছে।

এখন বেদ ও অগ্নিহোত্র আদিতে অনধ্যায় অর্থাৎ এগুলো কখনো ত্যাগ করা উচিত নয় —

वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके ।
नानुरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चैव हि ॥

[মনুস্মৃতি ২/১০৫]

অর্থ- (বেদোপকরণে চৈব) বেদের পঠনপাঠনে (চ) এবং (নৈত্যকে স্বাধ্যায়ে) নিত্যকর্মে বিহিত গায়ত্রী জপ বা সন্ধ্যোপাসনায় (হোম-মন্ত্রেষু চৈব) অনধ্যায় অর্থাৎ না করার ভূল করবে না। ভাব এই যে, এই অনুষ্ঠান সমূহের প্রত্যেক স্থিতিতে করা আবশ্যক।

☞ এখানে আমরা স্পষ্টরূপে জানতে পারলাম যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ প্রত্যেক স্থিতিতে করা আবশ্যক। কোনো নির্দিষ্ট সময় তথা রজঃস্বলা স্ত্রীদের জন্য এখানে ব্যাতিরেক নিয়ম বর্ণিত হয় নি; বরং সর্বজনীন রূপে এগুলোর ত্যাগ যেকোনো পরিস্থিতিতে নিষিদ্ধ করেছে।

এবার দেখুন যজ্ঞ আদির ত্যাগ কখনো সম্ভব হয় না –

नैत्यके नास्त्यनध्यायो ब्रह्मसत्रं हि तत्स्मृतम् ।
ब्रह्माहुतिहुतं पुण्यमनध्यायवषट्कृतम् ॥

[মনুস্মৃতি ২/১০৬]

অর্থ- (নৈত্যকে অনধ্যায়ঃ ন + অস্তি) সন্ধ্যা-যজ্ঞ আদি নিত্যচর্চার অনুষ্ঠানের ত্যাগ অথবা সেগুলো থেকে বিশ্রাম হয় না (হি) কেননা (তৎ ব্রহ্মসত্রং স্মৃতম্) সেগুলোকে পরমাত্মার উপাসনার অনুষ্ঠান মানা হয়। (অনধ্যায়বষট্কৃতম্) বিশ্রামকালেও সম্পাদিত যজ্ঞ-সদৃশ উত্তম কর্ম এবং (ব্রহ্ম-আহুতি-হুত্তম্) ব্রহ্মকে করা সমর্পণ অর্থাৎ সন্ধ্যোপাসনা (পুণ্যম্) সর্বদা পূণ্যদায়ক হয়।

☞ তাহলে সেই নামধারী পণ্ডিতগণ কোন যুক্তিতে বলতে পারে যে, রজঃস্বলা নারীগণ অপবিত্র তথা যজ্ঞ তথা অগ্নিহোত্রে তাঁদের অধিকার নেই। এটি হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই না।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, স্বাধ্যায় কখনোই ত্যাগ করা উচিত নয়, সেটা যেকোনো পরিস্থিতিতে। এখন স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করছি- 'স্বাধ্যায়' শব্দ দ্বারা মনুর অভিপ্রায়, বেদের নিরন্তর সাঙ্গোপাঙ্গ অধ্যয়ন, সন্ধ্যোপাসনা এবং অগ্নিহোত্র। এগুলো তিনি স্বয়ং [মনুস্মৃতি ২/১০৪, ১০৫, ১০৬] মধ্যে বলেছেন। এর অতিরিক্ত নিম্ন শ্লোকেও স্পষ্টত বলেছেন যে বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র আদিকে স্বাধ্যায় বলে। [মনুস্মৃতি ২/১৬৫-১৬৮; ৩/৭৫; ৪/১৭-২০; ৪/১৪৭-১৪৯; ১১/২৪৫]।

অপবাদকারীদের নিকট রজঃস্বলা স্ত্রীগণ অপবিত্র হওয়ায় স্বাধ্যায় আদিও করা নিষেধ। কিন্তু যেখানে স্বয়ং বেদ বলছে যে- "বেদের পাঠে আত্মসন্তুষ্টি হয়, পবিত্রতা আসে" তো আমরা কোনটি মান্য করবো? বেদের বচন নাকি হঠকারী সেইসব ব্যক্তিদের বচন?

पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः सम्भृतं रसम्।
तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिः मधूदकम्॥

[ঋগ্বেদ ৯/৬৭/৩২]

অর্থ- বেদবিদ্যা অধ্যয়নকারীকে পবিত্র করে, তাঁর মধ্যে সত্য বিদ্যার সার পরিপূর্ণ থাকে, সেই বেদবিদ্যা অধ্যয়নকারীর জন্য দুধ, ঘী, মধু এবং জল বর্ষণকারী অর্থাৎ আত্মসন্তুষ্টি, বল, মধুরতা এবং শান্তি প্রদান করে।

☞ এখন বলুন, যেখানে বেদ পাঠের মাধ্যমেই মনুষ্য [স্ত্রী/পুরুষ] পবিত্র হয়, তো সেই বেদ পাঠে নিষেধ করা হয় কোন যুক্তিতে? যদি মেনেও নেওয়া যায় যে তাঁরা মানসিক ভাবে অশুদ্ধ, তো বেদ স্বয়ং বলছে যে, বেদের পাঠের মাধ্যমে শুদ্ধতা আসে। অতএব অশুদ্ধ হোক বা অপবিত্র হোক, বেদের পাঠ তথা নিত্যকর্ম যজ্ঞ অবশ্য করা উচিত।

এবার একটি প্রশ্ন আসতেই পারে যে, নারীরা তো সেই সময় শারীরিক, মানসিক ভাবে অশুদ্ধ থাকে। তো শুনুন, আমরা এটা কখনোই মান্যতা প্রদান করি না যে নারীরা অশুদ্ধ হয়। কেননা পবিত্র বেদেই নারীকে বলা হয়েছে "শুভ্রময়ী"। তবুও যদি এই অশুদ্ধতার বিষয়ে কারোর খটকা লেগে থাকে তবে তাদের জন্য —

अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्धयति ॥

[মনুস্মৃতি ৫/১০৯]

অর্থ- (গাত্রাণি অদ্ভিঃ শুদ্ধয়ন্তি) শরীর এবং শরীরের অঙ্গ জল দ্বারা শুদ্ধ-নির্মল হয়, (মনঃ সত্যেন শুদ্ধ্যতি) মন সত্য সংঙ্কল্প, সত্যভাষণ এবং সত্যাচারণ দ্বারা শুদ্ধ হয়, (ভূতাত্মা বিদ্যা-তপোভ্যাং) জীবাত্মা বিদ্যাপ্রাপ্তি এবং ধর্মপালন রূপ তপ দ্বারা তথা (বুদ্ধিঃ + জ্ঞানেন শুদ্ধ্যতি) বুদ্ধি অধিকাধিক সত্যজ্ঞানের অর্জন দ্বারা শুদ্ধ হয়।

এখন এখানে যে বিষয়গুলো আসলো তা হলো, প্রথমত অশুদ্ধির বিষয় যা জল দ্বারাই শুদ্ধ হয়। আর দ্বিতীয়ত বিষয় যা স্বাধ্যায় আদি নিত্যকর্ম, এগিয়ে আবশ্যিক রূপে নিত্যদিন করতেই হবে। কারণ যজ্ঞের দ্বারাই মনুষ্য শুদ্ধ হয়, তো অশুদ্ধতা দূর করার জন্যই যজ্ঞ করা হয়। "यज्ञ वै शुद्धतम कर्मः" অর্থাৎ যজ্ঞ হলো শুদ্ধতম কর্ম। তাহলে শুদ্ধতা প্রাপ্তির জন্য এই যজ্ঞই করা উচিত, আর সেখানে এক শ্রেণীর লোকেরা নারীদের একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য [রজঃস্বলা কালীন] যজ্ঞ থেকে বহিষ্কৃত করতে উদ্যত। যা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

এত এত শাস্ত্র প্রমাণের পরেও যারা বলবে রজঃস্বলা অবস্থায় নারীরা অপবিত্র তথা যজ্ঞে অধিকার নেই, তারা নারীদের পূজা [সন্মান] করতেই জানে না। আর মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে,

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥

=[মনুস্মৃতি ৩/৫৬]=

অর্থ- যে সমাজে নারীদের যথাযথ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় সেই সমাজ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করে। আর যারা নারীদের যোগ্য সম্মান করে না, তারা যতই মহৎ কর্ম করুক না কেন, তার সবই নিষ্ফল হয়ে যায়। সর্বোপরি নারীরা সর্বাবস্থায় শুদ্ধ ও যজ্ঞ কর্মে অধিকারিণী। তাই নারীদের সর্বদা শুভ কর্মের প্রেরিত করতে উৎসাহিত করুন, তথা নারীদের শ্রদ্ধা করুন। ঈশ্বরের নির্মিত এই সৃষ্টিতে নারীদেরও ততটুকুই অধিকার রয়েছে, যতটুকু অধিকার রয়েছে একজন পুরুষের। কেননা আমরা সকলেই সেই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান "অমৃতস্য পুত্রাঃ"।

কত বড় আমাদের এই মহাবিশ্ব? মহাবিশ্বের আকার কী পরিমাপ করা যায়? মহাবিশ্বের পরিসীমা নিয়ে কী বলে বেদ?

এই সুবিশাল মহাবিশ্বের আকার সম্পর্কে ধারণা করতে চাইলছ আমাদের কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। কারণ আমাদের চোখ এই মহাবিশ্বের খুব সামান্য অংশই দেখতে পায়। কারণ আমরা ঈশ্বরের সৃষ্টি এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে বসবাস করি।

এই মহাবিশ্বে প্রায় ২০০ বিলিয়ন থেকে ২ ট্রিলিয়ন ছায়াপথ আছে। তার মধ্যে একটি হলো আমাদের আকাশগঙ্গা ছায়াপথ। আর আকাশগঙ্গা ছায়াপথের ৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্র আছে। তার মধ্যে একটি হলো সূর্য। আর সেই সূর্যের ৮টি গ্রহের মধ্যে একটি পৃথিবী। আর এই পৃথিবী নামক গ্রহের প্রায় ৮০০ কোটি মানুষের মধ্যে আমি বা আপনি একজন মাত্র!

ভাবা যায় যেই পৃথিবী নিয়ে আমাদের এত হিংসা-দ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সেই পৃথিবী তো আমাদের ছায়াপথের তুলনায় কিছুই না! কিন্তু আমাদের ছায়াপথ কত বড়?

পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত একটা রাস্তা কল্পনা করুন। সেই রাস্তায় ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে চলছে একটা গাড়ি। সেখানে পৌঁছাতে আমাদের সময় লাগবে ১৭০ বছর।

এটা কী বেশি মনে হচ্ছে? তাহলে আমরা হিসাবটা আলোর বেগে করে নিতে পারি।

এখন যদি একই গাড়িতে আপনি আলোর বেগে পৃথিবী থেকে সূর্যে পৌঁছাতে চান, তাহলে এবার আপনার সময় লাগবে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড। কারণ এখন আপনার গতি দাঁড়িয়েছে সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার।

আর ছায়াপথে আছে সূর্যের মতো প্রায় ৪০ হাজার কোটি নক্ষত্র। এর মধ্যে খালি চোখে হাজার দশেক নক্ষত্র আমাদের চোখে পড়ে। ছায়াপথের এপার থেকে ওপারে যেতে আলোর সময় লাগে ১ লাখ ২০ হাজার বছর। এতক্ষণ আমরা আলোর বেগে চিন্তা করেছি। এখন যদি আমরা আবারও ১০০ কিলোমিটার বেগে ঘন্টায় হিসাব করি, তাহলে কোনো যান আমাদের ছায়াপথের এক পাশ থেকে অন্য পাশে যেতে সময় লাগবে ১ লাখ ৮ হাজার কোটি (১.০৮ ট্রিলিয়ন) বছর।

আশা করি এতক্ষণে আমাদের ছায়াপথ কত বড় তা আমরা বুঝে গিয়েছি। এবার চিন্তা করুন তো এমন আরো ২০০ বিলিয়ন ছায়াপথও যদি মহাবিশ্বে থাকে তাহলে এই মহাবিশ্ব কত বিশাল হওয়া উচিত! হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ভেবেছেন। মহাবিশ্বের ব্যাপ্তি আপনার কল্পনারও অতীত। চলুন এখন দেখে নেয়া যাক আমাদের পবিত্র বেদ মহাবিশ্বের আকার নিয়ে কী বলছে :

সহোভির্বিশ্বং পরি চক্রসু রজঃ পূর্বা ধামান্যমিতা...

(ঋগ্বেদ ১০.৫৬.৫)

অর্থাৎ, আত্মাসমূহের পরিক্রমণীয় এই বিশ্বধাম অমিত (ধামানি অমিত) যার পরিমাপ করা যায় না এতই সুবিশাল।

©প্রবাল দেবনাথ

একো হি রুদ্রো - সৃষ্টিকর্তা একজনই

একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।

প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চুকোচান্তকালে সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ৩।২

সরলার্থঃ নিশ্চয়ই পরমাত্মা এক, অদ্বিতীয়; পরমাত্মা দুই অথবা তারও অধিক— এরূপ যারা বলে, তারা সঠিক নয়। যিনি এই লোকসমূহকে নিজের মহান শাসন-শক্তি দ্বারা যথাযথ নিয়মে চালনা করেন, তিনি প্রত্যেক জীবের অন্তরে স্থিত। তিনিই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড রচনা করে, এই সৃষ্টির রক্ষক হন অর্থাৎ স্থিতি প্রদান করেন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন।

যিনি দুষ্কর্মকারী পাপীদের দণ্ড দিয়ে রোদন করান, সেই পরমেশ্বরের নাম 'রুদ্র'। পরমেশ্বর স্বীয় অনন্ত সামর্থ্য দ্বারা সূর্যাদি লোকসমূহকে শাসন করেন। জগৎকে নিয়ন্ত্রণের এই মহাশক্তি একমাত্র তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান। কেননা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করতে অন্য কেউ সমর্থ নয়। সেই পরমাত্মা এক, অদ্বিতীয়; যারা ঈশ্বরকে অনেক রূপে বিভক্ত মনে করেন, তাদের এই ভাবনা ভ্রমপূর্ণ। সুতরাং পরমাত্মাকে এক, অদ্বিতীয় জেনে এবং এই সৃষ্টিতে তাঁর অনন্ত শক্তির মহিমা দর্শন করে, তাঁর উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

'রুদির্ অশ্রুবিমোচনে' এই ধাতুর সঙ্গে 'ণিচ্' প্রত্যয়ান্ত 'রক্' প্রত্যয় হওয়ায় 'রোদের্ণিলুক্ চ' (উণাদি০ ২।২২) সূত্র অনুযায়ী 'রুদ্র' শব্দ সিদ্ধ হয়। "য়ো রোদয়তি-অন্যায়কারিণো জনান্ স রুদ্রঃ" যিনি দুষ্টকর্মকারীদের রোদন করান, সেই পরমেশ্বরকে 'রুদ্র' বলা হয়। অথর্ববেদে ঈশ্বরের একত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। যথা— "ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয়শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে। ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে। নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে। য় এতং দেবম্ একবৃতং বেদ॥ (অথর্ব০ ১৩।৪।১৬-১৮)" অর্থাৎ পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়; তিনি ছাড়া কেউই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দশম ঈশ্বর বলে অভিহিত হয় না। যিনি তাঁকে শুধু এক বলে জানেন, তিনিই তাঁকে প্রাপ্ত হন।

সূত্র: উপনিষদ্ সংগ্রহ, বাংলাদেশ অগ্নিবীর

ধর্ষণে অপরাধ কার ? নির্যাতিতার নাকি ধর্ষকের ?

মহাভারতে [১২।২৬৬।৩৬] বলা হয়েছে, যদা যাস্যন্তি পুরুষাঃ স্ত্রিয়ো নার্হন্তি বাচ্যতাম্ = পুরুষ ধর্ষণ করলে স্ত্রীকে সে কারণে দোষী বলা যায় না।

এবং স্ত্রী নাপরাধ্নোতি নর এবাপরাধ্যতি ।

ব্যুচ্চরংশ্চ মহাদোষং নর এবাপরাধ্যতি ॥

মহাভারত ১২।২৬৬।৩৮

অর্থাৎ, নারী ধর্ষিত হলে সেখানে তার অপরাধ হয় না, পুরুষই সেই অপরাধ করে। ব্যভিচারের মহাপাপ পুরুষই করে, তাই সে-ই অপরাধী।

তাই আসুন নির্যাতিতাকে দোষারোপ (Victim blaming) বন্ধ করি, অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করি।

মহাভারতে জোয়ার-ভাটা বিজ্ঞান

মহাভারতে বৈশম্পায়ন জোয়ার-ভাটার উদাহরণ দিয়ে বলেছেন,

যথা চন্দ্রোদয়ে রাজন্ বর্ধমানো মহোদধিঃ

মহাভারত ১২।৩৮।২

অর্থাৎ, চাঁদ উঠলে যেমন মহাসাগরের জল উত্থিত হতে থাকে।

পৃথিবীপৃষ্ঠের যে অংশ বরাবর আকাশে চাঁদ থাকে, সেই অংশের সমুদ্রের জল চাঁদের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কিছুটা ফুলে ওঠে। এটাই জোয়ার। আবার একই সঙ্গে চাঁদের টানে পৃথিবীও কিছুটা এগিয়ে যায়। তখন পৃথিবীর ঠিক বিপরীত পাশের সমুদ্রের জল কিছুটা ফুলে ওঠে। তাই সেখানেই জোয়ার হয়। এই সময় অপর দুই পাশের সমুদ্রের জলে ভাটার সৃষ্টি হয়। জলের তল নেমে যায়।

বিয়েতে জয়া হোমের ১৩টি আহুতি কেন দেওয়া হয় ?

প্রশ্ন: বিয়েতে জয়া হোমের ১৩টি আহুতি কেন দেওয়া হয় ?

উত্তর: বিবাহ সংস্কারে প্রধান হোমে ১২টি রাষ্ট্রভৃৎ আজ্যাহুতির পরে ১৩টি আহুতি দেওয়া হয়। পারস্কর গৃহ্যসূত্র ১.৫.৯-এ এই বাক্যসমূহের উদ্ধৃতি ও বিধান দেওয়া হয়েছে। এই বাক্যসমূহ সামান্য পাঠভেদসহ তৈত্তিরীয় সংহিতা ৩.৪.৪-তেও বিদ্যমান। 'প্রজাপতির্জয়ানিন্দ্রায়...' তথা ১৩তম বাক্যে বিদ্যমান জয়া পদের জন্য এই সম্পূর্ণ আহুতিকে জয়াহোম বলা হয়।

কর্ক, জয়রাম, হরিহর, গদাধর প্রভৃতি টীকা-ভাষ্যকারদের মতে এগুলো দেবতাবাচক পদ নয় তাই এর চতুর্থ্যন্ত প্রয়োগ হবে না। যদিও বিশ্বনাথ 'চিত্তায়' আদি চতুর্থ্যন্ত রূপে প্রয়োগ করেছেন। গদাধরের ভাষ্যে দেখা যায়, 'ইমানি শাখান্তরোপদিষ্টানি দেবতাপদানি এষাং প্রয়োগকালে সম্প্রদানলক্ষণেন সম্প্রয়োগশ্চিত্তায় স্বাহেত্যাদীতি ভর্তৃযজ্ঞঃ নেতি কর্কাদয়ঃ। ন চেমানি দেবতাপদানি কিং তর্হি মন্ত্রাশ্চৈতে তে চ যথাম্নাতা এব প্রযোক্তব্যা' অর্থাৎ সর্বোচ্চ প্রাচীন ও অনুপলব্ধ পারস্কর গৃহ্যসূত্র বৃত্তিকার ভর্তৃযজ্ঞও এই প্রয়োগ মানতেন। কিন্তু কর্কাদির মতই এখানে দেবতবিচারে অধিক যুক্তিযুক্ত।

প্রতিটি আহুতির মন্ত্রের শুরুতে 'ওঁম্' পদ দ্বারা প্রার্থনা করা হচ্ছে,

হে সর্বরক্ষক পরমেশ্বর! হে সচ্চিদানন্দ- হে অনন্তস্বরূপ! হে নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব! হে কৃপানিধে! হে ন্যায়কারী! হে অজ নিরঞ্জন নির্বিকার! হে সর্বান্তর্যামী! হে সর্বাধার জগৎপিতা জগদুৎপাদক! হে অনাদি বিশ্বম্ভর সর্বব্যাপী! হে করুণামৃতবারিধে!

আমরা আজ পতি-পত্নী হিসেবে সমগ্র জীবনের জন্য পরস্পরের প্রেমবন্ধনে আপদ্ধ হচ্ছি। এই শুভকর্মে আমরা আপনার কৃপাপ্রার্থী। আপনি আমাদের এই বিবাহ সংস্কারে কৃপাপূর্বক দান করুন - কী দান করবেন ? আমরা আহুতির মাধ্যমে আপনার কাছেই চাই, কেননা আপনিই একমাত্র দাতা-

১. ওঁম্ চিত্তং চ স্বাহা। ইদং চিত্তায় ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, চিত্তে জ্ঞান দিন। আমরা যেন এই চিত্ত জয়ী হই।

২. ওঁ৩ম্ চিত্তিশ্চ স্বাহা। ইদং চিত্ত্যৈ ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, হৃদয়ে চেতনা দিন। আমরা যেন চেতনার বলে বলীয়ান হই।

৩. ওঁ৩ম্ আকূতঞ্চ স্বাহা। ইদমাকূতায় ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, সংকল্পের প্রেরণা দিন, আমরা যেন যা সংকল্প করবো তাতে সফল হই।

৪. ওঁ৩ম্ আকূতিশ্চ স্বাহা। ইদমাকূত্যৈ ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, কর্মে সংকল্প শক্তি দিন, অর্থাৎ কোনো কাজে যেন স্পৃহা না হারাই।

৫. ওঁ৩ম্ বিজ্ঞাতং চ স্বাহা। ইদং বিজ্ঞাতায় ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, বিবিধ জ্ঞান দিন, যেন জ্ঞাত সমস্ত বস্তু অর্জন করতে পারি।

৬. ওঁ৩ম্ বিজ্ঞাতিশ্চ স্বাহা। ইদং বিজ্ঞাত্যৈ ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, বিজ্ঞানের শক্তি দিন, ব্রহ্মবিদ্যাই সর্বোত্তম বিজ্ঞান।

৭. ওঁ৩ম্ মনশ্চ স্বাহা। ইদং মনসে ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, সুখ-দুঃখের চিন্তার সাধন মন= অন্তঃকরণ ও মানসিক শক্তি দিন

৮. ওঁ৩ম্ শক্করীশ্চ স্বাহা। ইদং শক্করীভ্যঃ ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, কর্মেন্দ্রিয়ে বল দিন; হাত, পা, বাক, পায়ু, উপস্থ এসব কর্মেন্দ্রিয় যেন শক্তিশালী হয়

৯. ওঁ৩ম্ দর্শশ্চ স্বাহা। ইদং দর্শায় ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, অমাবস্যার যজ্ঞ তথা দর্শেষ্টি করার সুযোগ দিন

১০. ওঁ৩ম্ পৌর্ণমাসঞ্চ স্বাহা। ইদং পৌর্ণমাসায় ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, পূর্ণিমার যজ্ঞ তথা পৌর্ণমাসী করার সুযোগ দিন

১১. ওঁ৩ম্ বৃহচ্চ স্বাহা। ইদং বৃহতে ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, উদার চিন্তার অধিকারী করুন

১২. ওঁ৩ম্ রথন্তরঞ্চ স্বাহা। ইদং রথন্তরায় ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, সামবেদীয় রথন্তর সাম তথা বেদপাঠের সুযোগ দিন

১৩. ওঁ৩ম্ প্রজাপতির্জয়ানিন্দ্রায় বৃষ্ণে প্রায়চ্ছদুগ্রঃ পৃতনা জয়েষু । তস্মৈ বিশঃ সমনমন্ত সর্বাঃ স উগ্রঃ স ইহব্যো বভূব স্বাহা । ইদং প্রজাপতয়ে জয়ানিন্দ্রায় ইদন্ন মম॥

অর্থাৎ, যজ্ঞফল তথা ইষ্টসিদ্ধির কৃপাবর্ষক পরমাত্মা জীবাত্মার জন্য এই জয় দানকারী মন্ত্র উত্তমভাবে আগেই দিয়েছেন। এই জয় মন্ত্রের প্রভাবেই জীবাত্মা শক্তিশালী হয়ে মানসিক-বাহ্যিক শত্রুদের জয় করতে সক্ষম হয়। এই কারণেই বাকি সব জীব তাকে প্রণিপাত করে। যে জয় লাভ করে সেই শক্তিশালী হয়। আর সেই জীবাত্মাই সকলের দ্বারা গৃহীত তথা বরণীয় হয়। এই ইষ্টসাধন যজ্ঞে সকলই পরমপ্রেমময় ভগবানেরই দান, আমার কিছুই নয়।

জয়া হোমের ১৩টি আহুতি কেবলমাত্র একটি বৈদিক বৈবাহিক সংস্কারগত আচার নয়, বরং এটি বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধনের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক, মানসিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধের প্রতিফলন। এই আহুতিগুলির মাধ্যমে নবদম্পতি ঈশ্বরের কাছে জীবনের বিভিন্ন স্তরে জ্ঞান, শক্তি, সঙ্কল্প, ও সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করে। বিশেষ করে

১৩তম 'জয়া' আহুতি বিজয়ের প্রতীক, যা নবদম্পতির সম্মিলিত জীবনের পথচলায় সমস্ত বাধা অতিক্রম করে জয়ী হবার আশীর্বাদ নিয়ে আসে। অতএব, জয়া হোম বিবাহ সংস্কারের একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ অংশ, যা দাম্পত্য জীবনের শুদ্ধতা, স্থায়িত্ব ও ঈশ্বরচিন্তায় নিবিষ্ট থাকার দিক নির্দেশ করে।

জীবনের এক নবদিগন্তে, পতি-পত্নীর মিলনের পবিত্র লগ্নে জয়া হোম পরমাত্মার থেকে আশীর্বাদের আহ্বান। অগ্নিতে আহুতির পাশাপাশি এড়ি জীবনের মানসপটেও এক একটি অক্ষয় প্রার্থনা—চিত্তের জাগরণ, জ্ঞানের দীপ্তি, সংকল্পের দৃঢ়তা, কর্মের বল, এবং আত্মিক বিজয়ের পথরেখা।

এই ১৩টি মন্ত্রের ধ্বনি যেন নবদম্পতির জীবনে এক আধ্যাত্মিক সংগীতের মতো বেজে ওঠে—যেখানে প্রেম, কর্তব্য, ও ধার্মিকতার মেলবন্ধনে বোনা হয় একটি শাশ্বত যাত্রার সূচনা। জয়া হোমের অন্তিম আহুতি, যেখানে প্রজাপতির পরমাত্মার শাশ্বত আশীর্বাদ বলে—"হে নবযাত্রীদ্বয়, জয়ী হও সংসারের মহাযুদ্ধে, থাকো ধৈর্যে, থাকো সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ।"

এইভাবে, জয়া হোম শুধু একটি বৈদিক আচার নয়, বরং এক শুভাশিসময় সোপান, যার উপর দাঁড়িয়ে নবদম্পতি জীবনের বিরাট অভিযানে প্রবেশ করে, ঈশ্বরচিন্তা ও পরস্পরের প্রতি অটুট আস্থা নিয়ে। এটি এক শুভ সূচনা, যা যুগল প্রাণকে এগিয়ে নিয়ে যায় মিলনের পবিত্র পথে, বিজয়ের অমল আলোকে।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

যজ্ঞপ্রার্থনা (পূজনীয় প্রভু হামারে এর বাংলা সংস্করণ)

পূজনীয় প্রভু হামারে বা যজ্ঞরূপ প্রভু হামারে খুবই জনপ্রিয় একটি ভজন যা যজ্ঞ সমাপ্তে গাওয়া হয়ে থাকে। মনোমুগ্ধকর এই সঙ্গীতে মূলত প্রকাশ পেয়েছে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ এর মাহাত্ম্য যেগুলো গায়ন ও শ্রবণ করলে যজ্ঞের প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

সকলের সুবিধার্থে এই অসাধারণ ভজনটির বাংলা গীতিকবিতা প্রকাশ করছি। আশা করি যজ্ঞানুরাগী প্রত্যেক সনাতনীদের একটু হলেও পিপাসা মিটবে

যজ্ঞরূপ প্রভু আমাদের
ভাব উজ্জ্বল দাও করে।
ছল কপটকে দাও ছাড়িয়ে
মানসিক বল দাও ভরে।।
বলছে বেদের ঋচাগুলি
সত্যকে ধারণ করি।
সুখ আনন্দে মগ্ন থাকি
দুঃখ শোক হর শ্রীহরি।।
পঞ্চযজ্ঞের করি অনুষ্ঠান

বিশ্ব উপকার হোক্ সবার।
ধর্ম মর্যাদা চালিয়ে
পালন করি প্রাণী ধরার।।
নিত্যশ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে
যজ্ঞ সব করতে থাকি।
রোগ পীড়িত বিশ্বমানবের
বেদনা হরতে থাকি।।
শেষ হয়ে যাক্ চিন্তা-ভাবনা
পাপ আর অত্যাচারের।
পূর্ণ হোক্ কামনাগুলি
যজ্ঞ থেকে নরনারীদের।।
হবন হোক্ লাভকারী
সবপ্রানীদের হোক্ শুভ।
বায়ু জল সর্বত্র হোক্ শুভ
গন্ধ হোক্ দিগ্ দিগন্ত।।
স্বার্থভাব হোক্ সমাপ্ত
প্রেমপথের বিস্তার হোক্।
'ইদন্ন মম' এই বেদবাক্য
জীবনে সার্থক হোক্।।
হাতজোড় ঝুঁকিয়ে মস্তক
বন্দনা মোরা করি।
নাথ করুণা রূপ করুণা
পার কর ভব শ্রীহরি।।
যজ্ঞরূপ প্রভু আমাদের
ভাব উজ্জ্বল দাও করে।
ছল-কপটকে দাও ছাড়িয়ে
মানসিক বল দাও ভরে,
প্রভু আত্মিক বল দাও ভরে।।
প্রচারে: বাংলাদেশ অগ্নিবীর

শিশু, যুবক নাকি বৃদ্ধ- সুখী হবেন কীভাবে?

আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রায়ই ছোট ছোট শিশুদের মন খুবই পবিত্র ও নির্মল হয়। দুই-তিন-চার-পাঁচ বছরের শিশুরা সাধারণত মিথ্যা বলে না, প্রতারণা বা কৌশল করে না। তারা খুব সরল ও নিষ্পাপভাবে আচরণ করে। এই নির্মল আচরণের কারণেই তারা আনন্দে থাকে, সুখী থাকে। তাদের জীবনে দুশ্চিন্তা, টেনশন বা মানসিক চাপের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

ঠিক একইভাবে, যখন ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সে যৌবন শুরু হয় এবং প্রায় ৪০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী থাকে, তখন দেখা যায় এই বয়সে যুবকদের মধ্যে প্রবল শক্তি থাকে। সেই শক্তির মাধ্যমে তারা প্রচুর কাজ করতে পারে। তারা দৌড়াদৌড়ি, ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা, চাকরি, দূরভ্রমণ, ভারী জিনিস তোলা কিংবা যুদ্ধ—সবই সহজে করতে পারে। যুবা অবস্থায় শক্তি বেশি থাকায় এসব কাজ সহজ হয়ে যায়।

৪০ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পর বয়স যত বাড়ে, ৫০, ৬০ কিংবা ৭০ বছরে পৌঁছালে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ অবস্থায় মানুষের জ্ঞান অনেক গভীর হয়। জীবনের বহু অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে তারা আরও সচেতনভাবে ও সংযতভাবে জীবন যাপন করে এবং অধিক শান্তি অনুভব করে। তাদের এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শিশু ও যুবকরাও উপকৃত হতে পারে। এইভাবে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরাও তাঁদের প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সুখী জীবন যাপন করতে পারেন।

যদি কেউ এই তিনটি পর্যায় থেকে কিছু কিছু শিক্ষা নিয়ে নিজেকে গড়ে তোলে— যেমন শিশুর মতো মনকে নির্মল রাখে, যুবকের মতো কর্মে উদ্যমী থাকে, আর বৃদ্ধের মতো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করে, তাহলে সে একজন সত্যিকারের সুখী ও সফল মানুষ হতে পারে। তখন তার বয়স ৩৫/৪০ হোক বা ৫০/৬০— কোনো বাধাই তাকে থামাতে পারবে না।

-স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক

নির্দেশক, দর্শনযোগ মহাবিদ্যালয়।

চরৈবেতি চরৈবেতি

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের উপাখ্যানে (৭।৩।১৩-১৭) একটি সুন্দর বৈদিক গীত দেওয়া আছে। এই গীতের অন্তরা হলো— 'চরৈবেতি চরৈবেতি', অর্থাৎ চলতে থাকো, চলতে থাকো। এই কাহিনীটি এরূপ—

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কোনো পুত্র ছিল না। তিনি পর্বত ও নারদ নামক ঋষিদের কাছে উপায় জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন— তুমি বরুণকে প্রার্থনা করো। তিনি বরুণের কাছে গিয়ে বললেন— আমাকে পুত্র দাও, তদ্দ্বারা আমি তোমার যাগ করব। বরুণ বললেন— তথাস্তু। এরপর হরিশ্চন্দ্রের একটি পুত্র উৎপন্ন হলো, তার নাম রাখা হলো রোহিত।

-বরুণ বললেন— তোমার পুত্র তো হয়েছে, এতদ্দ্বারা আমার যাগ করো।

-হরিশ্চন্দ্র বললেন— দশদিন না হলে পশু যাগযোগ্য হয় না, দশদিন হয়ে যাক, তখন যাগ করবো।

-বরুণ বললেন— ঠিক আছে।

পুত্র দশদিনের হলো, বরুণ এসে বললেন— এখন তো দশদিন হয়ে গেছে, এখন যাগ করো।

-হরিশ্চন্দ্র বললেন— এখনো দাঁত ওঠেনি। দাঁত বের হলে তবে মেধ্য হবে। দাঁত উঠুক, তারপর যাগ করবো।

-বরুণ বললেন— ঠিক আছে।

পরে তার দাঁত উঠলে বরুণ বললেন— দাঁত তো উঠেছে, এবার যাগ করো।

-হরিশ্চন্দ্র বললেন— যখন দুধের দাঁত পড়ে যাবে, তখন সে মেধ্য (যাগযোগ্য) হবে। দাঁত পড়ে যাক, তারপর যাগ করবো।

-বরুণ বললেন— ঠিক আছে।

তার দুধের দাঁতও পড়ে গেল। বরুণ আবার এলেন— এখন তো দুধের দাঁতও পড়ে গেছে, এবার যাগ করো।

-হরিশ্চন্দ্র বললেন— যখন নতুন দাঁত উঠে যাবে, তখন সে মেধ্য হবে। নতুন দাঁত উঠতে দাও, তারপর যাগ করবো।

-বরুণ বললেন— ঠিক আছে।

তার নতুন দাঁতও উঠে গেল। বরুণ আবার এলেন— নতুন দাঁতও তো উঠেছে, এবার যাগ করো।

-হরিশ্চন্দ্র বললেন— সে ক্ষত্রিয় বালক। ক্ষত্রিয় পুত্র যখন কবচধারণ করে, তখনই কোনো কার্যের যোগ্য (মেধ্য বা যজ্ঞীয়) হয়। কবচধারণ করে নিলে, তখন যাগ করবো।

-বরুণ বললেন— ঠিক আছে।

সে কবচধারণও করল। বরুণ আবার এসে বললেন— এখন তো কবচও ধারণ করেছে, এখন যাগ করো।

-হরিশ্চন্দ্র বললেন— ঠিক আছে, কাল এসো। তিনি রাতে পুত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন যখন বরুণ এলেন, তখন বললেন— সে তো কোথাও পালিয়ে গেছে।

তখন বরুণের কঠোর নিয়মে হরিশ্চন্দ্রের উদরী রোগ উৎপন্ন হলো। রোহিত জঙ্গলে পিতার কষ্টের সংবাদ শুনল, সে তখন জনপদের দিকে ফিরে চলল। তখন ইন্দ্র পুরুষ রূপ ধা"রণ করে তার সামনে এলেন এবং নিম্নলিখিত গীতের এক-একটি শ্লোক এক বছর পর পর শোনাতে লাগলেন। এভাবে পাঁচ বছরে সঞ্চরণ গীত সম্পূর্ণ হলো এবং রোহিত পাঁচ বছর ধরে অরণ্যে ঘুরে বেড়াল। গীতটি এরূপ—

১।

নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।

পাপো নৃপদ্বরো জন ইন্দ্র ইঞ্চরতঃ সখা॥

চরৈবেতি, চরৈবেতি।

-হে রোহিত, শোনা যায়—পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়া পুরুষের কাছে লক্ষ্মী আসে না। বসে থাকা মানুষের ঘরে পাপ এসে বাসা বাঁধে। ইন্দ্র তারই বন্ধু, যে নিরন্তর চলতে থাকে। তাই চলতে থাকো, চলতে থাকো।

২।

পুষ্ণিণ্যৌ চরতি জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।

শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে ইতাঃ॥

চরৈবেতি, চরৈবেতি।

-যে পুরুষ চলতে থাকে, তার উরুতে ফুল ফোটে, তার আত্মা অলংকৃত হয়ে ফল লাভ করে। চলমান মানুষের পাপ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। তাই চলতে থাকো, চলতে থাকো।

৩।

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।

শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ॥

চরৈবেতি, চরৈবেতি।

-যে বসে থাকে, তার সৌভাগ্যও বসে থাকে; যে দাঁড়ায়, তার সৌভাগ্যও দাঁড়ায়; যে শুয়ে থাকে, তার সৌভাগ্যও নিদ্রিত হয়; আর যে উঠে চলে, তার সৌভাগ্য চলতে শুরু করে। তাই চলতে থাকো, চলতে থাকো।

৪।

কলিঃ শয়ানো ভবতি সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ।

উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্॥

চরৈবেতি, চরৈবেতি।

-যে ঘুমিয়ে থাকে, তার নাম কলি; যে হাই তোলে, সে দ্বাপর; যে উঠে দাঁড়ায়, সে ত্রেতা; আর যে চলে, সে সত্যযুগী। তাই চলতে থাকো, চলতে থাকো।

৫।

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্।

সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন্॥

চরৈবেতি, চরৈবেতি।

-চলমান মানুষই মধু পায়, চলমান মানুষই সুস্বাদু ফলের আস্বাদ গ্রহণ করে। সূর্যের পরিশ্রম দেখো, সে নিত্য চলে, কখনও অলস হয় না। তাই চলতে থাকো, চলতে থাকো।

এই সুন্দর গীতে ইন্দ্র রোহিতকে সর্বদা চলতে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। ইন্দ্র এই শিক্ষা কোনো ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এই গীতের প্রকৃত অভিপ্রায় আধ্যাত্মিক। চলতে থাকো, চলতে থাকো—কারণ চলার নামই জীবন। স্থির জল পঁচে যায়, বসে থাকা মানুষ পাপী হয়ে ওঠে। প্রবাহমান জলের মধ্যেই জীবন থাকে, সেই-ই বায়ু ও সূর্যের প্রাণ-ভাণ্ডার থেকে প্রাণ গ্রহণ করে। কোথাও থেমে পড়ার নাম জীবন নয়। জীবনের পথে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া, কিংবা অলস হয়ে ডেরা গেড়ে বসা—এ সবই মূর্ছনা। জাগরণের নামইই জীবন, জাগরণই গতি। নিদ্রাই মৃত্যু। আধ্যাত্ম মার্গের দিকে সদা অগ্রসর হতে হবে, সদা কানে ধ্বনিত হতে থাকুক— "চলতে থাকো, চলতে থাকো"। চলতে থাকো, হে মানুষ! চলতে থাকো। প্রবাহই জীবন, স্থবিরতা মৃত্যু। ঘুরছে পৃথিবী বনবনিয়ে, হাঁটছে সময় হনহনিয়ে। জীবনের যাত্রাপথে এক দরজা বন্ধ হলে অন্য দরজা অবশ্যই খুলবে। বন্ধ দরজাতে মাথা ঠুকে সারাজীবন যদি কাঁদবে, তো খোলা দরজা খুঁজবে কখন? তাই, চলতে থাকো, চলতে থাকো। ইন্দ্র তো চলমানদেরই বন্ধু (ইন্দ্র ইঞ্চরতঃ সখা)। আত্মা তাদেরই নির্বাচন করে, যারা পথে চলতে থাকে, যারা এক পা ফেলার পরই দ্রুত আরেক পা ফেলে আধ্যাত্মের অসীম পথ চিরে এগিয়ে চলে। উপনিষদেও বলা হয়েছে—

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।২।৫)

অথবা—

ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। (মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।২।৪)

যার সংকল্প দুর্বল, যে প্রমাদী ও মিথ্যাচারী, সে কখনো আত্মদর্শন করতে পারে না। ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন, যারা স্বয়ং নিজের সাহায্য করে। কোমর বেঁধে যারা দাঁড়িয়ে পড়ে, ইন্দ্র তাদেরই বন্ধু। যারা গতিশীল হয়ে পথ অতিক্রম করে চলে যায়, যারা পা বাড়িয়ে পশ্চাৎপদ হয় না, যারা জাগ্রত ও সচেতন থাকে—তারাই সত্যিকারের পথিক। তারা বুঝে নিয়েছে সংসারের আতিথ্যধর্মকে। আত্মা এই দেহে এক অতিথি মাত্র—"অততি সন্তনং গচ্ছতি ইতি অতিথিঃ"। 'অত সাতত্যগমনে' ধাতু থেকে 'ইথিন্' প্রত্যয়ে 'অতিথি' শব্দ গঠিত। "অততি সন্তনং গচ্ছতি ইতি আত্মা" সেই 'অত সাতত্যগমনে' ধাতু থেকেই 'মনিন্' প্রত্যয়ে গঠিত 'আত্মা' শব্দ। এই সূত্র সর্বদা স্মরণীয়—অতিথিরাত্মা।

আত্মাই ক্ষেত্রপতি শম্ভু। এই শরীরের নাম ক্ষেত্র, আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষেত্রপতি। প্রতিদিনের শান্তিপাঠে আমরা বলি—

শন্নঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শম্ভুঃ। (ঋগ্বেদ ৭।৩৫।১০)

আমাদের ক্ষেত্রপতি আত্মার অহরহ কল্যাণ হোক, সে সর্বদা শুভ হোক। এই আত্মাকে সম্বোধন করেই বলা হয়েছে—

সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্বোধয়তাতিথিম্। (যজুর্বেদ ৩।১)

সমিধা দ্বারা এই অগ্নির উপাসনা করো, ঘৃতের ধারা দিয়ে সেই অতিথিকে জাগাও। ব্রহ্মচর্যকাল বা জীবনের বসন্তকালই ঘৃতধারা—এই সময়ই রসের পরিপাক ঘটে। যৌবন বা গ্রীষ্মই হল সমিধা বা ইন্ধন। বলা হয়েছে—

বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্ম শরদ্ধবিঃ। (যজুর্বেদ ৩১।১৪)

অতিথি আত্মার মঙ্গল সর্বদা চলতে থাকার মধ্যেই। ঘর বানিয়ে থেমে পড়া তার স্বভাবের প্রতিকূল। ভোগ ও বিষয় দুর্গন্ধে ভরা। যারা সেগুলোর মধ্যে তৃপ্তি খুঁজে নেয়, তারা সত্যিকারের সৌন্দর্যের মাধুর্য জানে না। সকল বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মধুবিদ্যা। আত্মজ্ঞান বা অধ্যাত্মবিদ্যার নামই মধুবিদ্যা, যা ইন্দ্র দধ্যঙ্ অথর্বকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এটাই পরম মধু। এই রসের সমান অন্য কোনো রসে মাধুর্য্য নেই। আত্মা রসস্বরূপই—রসো বৈ সঃ। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২।৭)

একবার কেউ যদি এই মধুর স্বাদ পেয়ে যায়, সে আর অন্য কোনো মাধুর্য চায় না। এই মধু কেবল চলতে থাকলেই পাওয়া যায়—চরন্ বৈ মধু বিন্দতি। (গীত, ৪)

আধ্যাত্মিক পথে দৃঢ়ভাবে চলতে থাকা পথিকেরাই এই মধুর স্বাদ পান, তারাই সেই সুবর্ণ, যারা সংসাররূপী অশ্বত্থ বৃক্ষের স্বাদু বা মধুর ফল ভক্ষণের যোগ্য হন।

১৩ কি অশুভ সংখ্যা বা Unlucky number ?

প্রশ্ন: ১৩ কি অশুভ সংখ্যা বা Unlucky number ?

উত্তর: এর অর্থ তো এই হলো যে, নং ১৩-কে গণিত থেকে বের করে দেওয়া উচিত! অথবা ১৩-এর পরে গণনা করাই ভুল!

১৩ না মানলে তো ১৪-১৫-১৬ সংখ্যা কীভাবে হতে পারে? এত ভবন নির্মাণ হয় যা ১০০ তলাও হয়। তাহলে ১৩ তালা বা 12th floor না থাকলে অবশিষ্ট ভবনের ভিত্তি কীসের উপর থাকবে?

সংসারে ১১৩ তলা ভবনও রয়েছে। তার মধ্যে তো ১৩ ও ১১৩ পুনরায় গণনায় এসেছে আর সেই সমস্ত ভবন সঠিকভাবে স্থিত রয়েছে এবং সুরক্ষিত রয়েছে।

শিশু যখন গর্ভাবস্থায় ১৩ দিনের অথবা জন্মানোর পর ১৩ মাসের অথবা ১৩ বছরের হয় তবে সেই দিনকে অশুভ মনে করা হয়? এই শিশুর জন্মদিন কি পালন করা হয় না?

১৩ এর ঊর্ধ্বে যতগুলি সংখ্যা রয়েছে, সমস্ত ১৩র উপরেই স্থিত রয়েছে। একে অশুভ মনে করায় কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই। ১৩ তলায় কি কেউ থাকে না? প্রত্যেক মাসে ১৩ তারিখ আসে, সেটা কী অশুভ? সেই দিন কী শিশুরা জন্মগ্রহণ করে না? অথবা যত শিশুর জন্ম হয় তারা সবাই অশুভ? ১৩ তারিখে জন্মানো বহু ব্যক্তি ধনবান এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারীও হয়। এর মাধ্যমে প্রমাণ হলো যে, ১৩ তারিখ অশুভ হয় না। সেই দিনে আমরা পান-আহার করি না? ১৩ তারিখে কি কোথাও যাত্রা করা হয় না? এই সমস্ত প্রশ্ন যার উত্তর কেবল হ্যাঁ-ই হতে পারে।

হতে পারে কিছু লোক ১৩ নং কে অশুভ বলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করে নিয়েছে। অথবা হতে পারে এই পাশ্চাত্যদের কিছু মতবাদীদের ব্যবসায় লোকসান দেখা দিয়েছিল এবং ১৩ তারিখকে অশুভ বলে দান-অর্থ আদায় করে তাকে শুভ করার কৌশল বলে ব্যবসা বৃদ্ধি করেছে। কিংবা কোথাও ত্রয়োদশ তলায় কোন দেশদ্রোহী অথবা কোন বেআইনি কাজ হয়, অতএব সেই স্থানে কেউ যাতায়াত করবে না এমন ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে যে, এই স্থানে যে যায় তার মৃত্যু হয় অথবা ভূত-প্রেতের ছায়া লাগে। সাদাসিধে কোন ব্যক্তির হত্যা করা হয়েছে হয়তো অথবা সেই সমস্ত লোকদের মুখোশ উন্মোচন হবার ভয়ে সেই ব্যক্তির হত্যা করে দেওয়া হয়েছে হয়তো! নাম খারাপ হয়েছে ত্রয়োদশ তলার!

ভ্রাতা ও ভগিনীগণ! কোনো নম্বর, কোনো দিন অথবা কোনো স্থান খারাপ হয় না। সেখানে বসবাসকারী লোকরা মন্দ হতে পারে। ১৩ নম্বরে কোন মন্দ-অশুভ নেই। এই ধরনের প্রলাপ, ভ্রান্তি মন থেকে বের করে দেওয়া উচিত। বরং হ্যাঁ যদি এমন হয় মানসিক অবস্থা বা সামাজিক অবস্থা ভালো নয় তবে যে কোনো দিন বা সংখ্যাতেই আমরা কোনো কাজ স্থগিত করতে পারি। এখানে সংখ্যার বিশেষ কোনো মাহাত্ম্য নেই।

১৩ নং ঘর, ১৩ নং দোকান, রোড নং ১৩, বিল্ডিং নং ১৩, ওয়ার্ড না ১৩, প্রত্যেক ক্ষেত্রে ১৩ নং থাকবেই। পণ্ডিতগণ নির্ণয় করুন যে, ১৩ নং কী অশুভ? অধিক জানার জন্য বিদ্বানদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ভণ্ডদের পাল্লায় পড়বেন না।

শুভ-অশুভ তো মানুষের কর্ম। যে যেমন করে সে তেমনই ফল পায়; না বেশী না কম। ১৩ নং যদি অশুভ হয় তবে ২৬ অর্থাৎ ১৩×২ এর থেকেও বেশী ভয়ানক হবে এবং এভাবে যত অগ্রসর হতে থাকবেন অশুভই অশুভ

হবে। এভাবে কী সম্ভব আদৌ ? ১৩×১৩ তো সর্বাধিক অশুভ। এমন কখনও বিশ্বাস করবেন না। ১৩ নং কে দেশ-বিদেশে অশুভ মানে এমন লোক কম নেই। যদিও এখন লোকরা ধীরে-ধীরে বুঝতে পারছে। সত্য সর্বদা সত্যই হয়।

'ধনতেরস'এর দিন ধন বৃদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ যা দীপাবলীর দুইদিন আগে পালিত হয়। লোক সোনা-রূপার বস্তু ক্রয় করে কারণ তাদের মতে এই দিন শুভ, ধনের বৃদ্ধি হয়। এটিও ত্রয়োদশী তিথি অর্থাৎ ১৩তম, তখন কেন একে শুভ মনে করেন ? সমস্ত দিনের নির্মাণ করেছেন ঈশ্বর, তাই সমস্ত দিনই শুভ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর

পুণ্য ও পাপের সংজ্ঞা

‘পুণ্য’ অর্থ:

"পুণ্য" হলো সেই কাজ, যা থেকে **নিজেরও সুখ বৃদ্ধি পায় এবং অপরেরও**। যেমন:

- যজ্ঞ করা
- পিতা-মাতার সেবা করা
- প্রাণীদের রক্ষা করা ও তাদের খাদ্য দেওয়া
- ঈশ্বরের ধ্যান করা
- সত্য কথা বলা
- ন্যায়বিচার করা
- সততার সঙ্গে ব্যবসা করা
- বেদ প্রচারে সাহায্য করা
- বৈদিক গুরুকুল, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী প্রভৃতি যোগ্য ব্যক্তিদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করা

‘পাপ’ অর্থ:

"পাপ" হলো সেই কাজ, যা থেকে **নিজেরও দুঃখ বাড়ে এবং অন্যেরও**। যেমন:

- চুরি করা
- মিথ্যা বলা
- প্রতারণা করা
- অন্যায় করা
- অন্যের উপর শোষণ করা
- কারও অধিকার বা সম্পত্তি ছিনিয়ে নেওয়া

- ব্যভিচার করা
- মদ, তামাক, গুটকা-মসলা, গাঁজা ইত্যাদি নেশাজাত দ্রব্য সেবন করা

বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে পাপ ও পুণ্যের এই সংজ্ঞাই দেওয়া হয়েছে।

যারা উপরে বর্ণিত উত্তম গুণ ও কর্মকে গ্রহণ করে এবং তাদের গৃহীত সংকল্প পূর্ণ শক্তি দিয়ে পালন করে, তারা **পুণ্য আত্মা**। আর যারা উপরোক্ত পাপকর্মে লিপ্ত থাকে, তারা **পাপ আত্মা** নামে পরিচিত।

আপনারা সবাই নিজ নিজ আত্মপরীক্ষা করুন এবং নিজেকে চিনুন —

আপনি কি পুণ্য আত্মা, না পাপ আত্মা?

যদি আপনি পুণ্য আত্মা হয়ে থাকেন, তবে তা খুবই প্রশংসনীয়।

আর যদি না হন, তাহলে **পুণ্য আত্মা হওয়ার চেষ্টা করুন।**

অন্য মানুষদেরও বিচার করুন।

যারা পুণ্য আত্মা, তাদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকুন — তারা আপনাকে সুখ দেবে এবং আপনিও তাদের সুখ দেবেন।

আর যারা পাপ আত্মা, তাদের সঙ্গে ঝগড়া নয়, সম্পর্কও নয় — তাদের থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়।

কারণ তারা নিজেরাও দুঃখে থাকে এবং আপনাকেও কষ্ট দেবে।

অতএব, উত্তম গুণ ও কর্মকে হৃদয়ে ধারণ করুন, পূর্ণ শক্তি দিয়ে তা পালন করুন এবং পুণ্য আত্মা হয়ে উঠুন।

— স্বামী বিবেকানন্দ পরিব্রাজক

পরিচালক – দর্শন যোগ মহাবিদ্যালয়, রোজড়, গুজরাট

ডান বা বাম হাতে কাজ করা নিয়ে সনাতন ধর্ম কী বলে ?

প্রশ্ন: ডান বা বাম হাতে কাজ করা নিয়ে সনাতন ধর্ম কী বলে ?

উত্তর: নিজের দক্ষিণ হস্ত অর্থাৎ সোজা হাতকে ডান এবং বাম হস্ত অর্থাৎ উল্টো হাতকে বাম হাত বলা হয়। মূলত পূর্বমুখী হয়ে দাঁড়ালে দক্ষিণ ও উত্তরই যথাক্রমে ডান ও বাম হাত। অধিকাংশ লোক ডান হাত দিয়েই নিজের প্রমুখ কার্য করে। আমাদের দুই হাতই আমাদের দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যার দ্বারা আমরা সমস্ত কাজ করতে সক্ষম হই। এক হাত ডান অথবা বাম না থাকলে কতটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, একথা সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন যার এক হাত নেই। ডান হাত হোক বা বাম, উভয় হাত নিজ-নিজ স্থানে উপযোগী। এতে কোন শুভ অথবা অশুভ নেই। হ্যাঁ, এতটুকু অবশ্যই যে কাজ আমরা ডান হাত দিয়ে করি তা অভ্যাস না থাকার কারণে বাম হাত দিয়ে ঠিকভাবে করা কঠিন। এভাবে যে কাজ আমরা বাম হাত দিয়ে করি সেই কাজ ডান হাত দিয়ে করতে অসুবিধা হয় ও কঠিন লাগে।

কৃতং মে দক্ষিণে হস্তে জয়ো মে সব্য আহিতঃ [অথর্ববেদ ৭।৫০।৮] এ বলা আছে, "আমার ডানহাতে কর্ম আর বামহাতে বিজয়।" এখানেও তাৎপর্য হাতের দিক দিয়ে নয়, বরং কর্ম ও সফলতার পরস্পর সম্পর্ক নিয়ে। এছাড়া অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তরঃ [ঋগ্বেদ ১০।৬০।১২] বলা হয়েছে- "দুটো হাত দিয়ে কঠোর

পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের ভাগ্যকে গড়ে তোলো।" যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণও গীতায় কর্মের ওপর জোর দিয়েছেন। ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করতে বলেছেন।

যজ্ঞ-কর্মে ডান হাত দিয়ে আহুতি প্রদান করা হয় এবং ডান হাত দিয়েই আমরা যাজ্ঞিক অন্ন ভোজন করি। মূলতঃ আচরণ ও বিধানে যেন ঐক্য থাকে তাই এই বিশেষ বিশেষ স্থানে সবার জন্য একই বিধান। এইজন্য এ সম্ভব যে, অনেক লোক ডান হাতকে শুভ মনে করে। কারণ বাম হাত দিয়ে আমরা শৌচাদি শুদ্ধির কার্য করি, এইজন্য হতে পারে যে, লোক বাম হাতকে অশুভ মনে করে। কিন্তু উভয় হাতই আমাদের দেহের অঙ্গ; একে শুভ অথবা অশুভ বলা অনুচিত, ভ্রান্তি ও অন্ধবিশ্বাস।

বেশিরভাগ মানুষের মস্তিষ্কের বামদিকের অংশটি কথোপকথন এবং ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে। যার কারণে বেশিরভাগ মানুষ ডানহাতি হয়, যেহেতু মস্তিষ্কের বাম দিকটি ডান হাতকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিছু মানুষ স্বাভাবিকভাবেই একই কারণে বামহাতি হয়। কারণ তাদের মস্তিষ্কের ডানদিকের অংশটি বেশি ব্যবহৃত হয়।

সূত্র: What causes some people to be left-handed, and why are fewer people left-handed than right-handed? [Scientific American], অন্ধবিশ্বাস নির্মূলন-মদন রহেজা

কিছু ব্যক্তি Lefty হয়, অর্থাৎ তারা নিজের সমস্ত প্রধান কাজ বাম হাত দিয়েই করে। তার জন্য তো এই ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী বাম হাত শুভ এবং ডান হাত অশুভ হয়ে যাবে। তারা বাম হাত দিয়েই খাবার খায় এবং তার দ্বারাই লেখার কাজ করে এগুলো তাদের শৈশব থেকেই অভ্যাস হয়ে যায়, সংস্কার হয়ে যায়, একে কী বলবেন? গবেষকরা বাঁ-হাতি হওয়ার কারণ হিসেবে ৪০টির মতো জীন শনাক্ত করেছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্তীয় বিভাগের প্রধান ড. টিম ক্রোর মতে, সম্ভবত মানবদেহের পিসিডিএইচ-১১এক্স জিন হাতের ব্যবহারের এ বিষয়টি নির্ধারণ করে দেয়। অক্সফোর্ডের আরেক বিশেষজ্ঞ ড. ফ্রাঙ্কসের মতে, ক্রোমোজোম-২ এর মধ্যে থাকা এলআরআরটিএম-১ জিনের জন্য মানুষ হাত ব্যবহারে আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। এ ছাড়া মাতৃগর্ভে থাকা ডাই ইথাইল স্টিলবোস্টেরলের সংস্পর্শ বাঁ-হাতি হতে সহায়ক।

সূত্র: Why are some people left-handed? An evolutionary perspective V Llaurens 1, M Raymond 1, C Faurie 1,2

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে ডান-বাম উভয় হাতই শুভ। শুভাশুভ তো কর্ম হয়, না আমাদের দেহের অঙ্গ।

© বাংলাদেশ অগ্নিবীর